অষ্টম খণ্ড

প্রথম সংখ্যা, ১৩৭৪

সম্পাদক : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

ইতিহাস—অ ম খণ্ড

বার্ষিক সূচী

(১৩৬৪-৬৫)

অষ্টম খণ্ড		প্রথম সংখ্যা		১৩৬৪

ইতিহাস

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক ঃ

শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রী নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ

৪৭-এ, একডালিয়া রোড ঃঃ কলিকাতা-১৯

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ

কর্মকর্তামণ্ডলী

সভাপতি

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ সেন

সহ-সভাপতি

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী সুশোভন সরকার

কর্মসচিব

শ্রী শিবপদ সেন

সহ-কর্মসচিব

শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী

শ্রী অসীমকুমার দত্ত

শ্রী শোভন বসু

কোষাধ্যক্ষ

শ্রী তড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ইতিহাস

অষ্টম খণ্ড] ভাদ্র-কার্ত্তিক, ১৩৬৪ [প্রথম সংখ্যা

রাখালদাসের উড়িষ্যার ইতিহাস

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

'ইতিহাস' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় আমরা সুপ্রসিদ্ধ বাঙালী ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুমুখী প্রতিভার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছিলাম। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের গবেষণা সাধারণতঃ ভারতবর্ষের প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক ইতিহাসের যে কোন একটি বিভাগে সীমাবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু রাখালদাসের লেখনী এই তিন যুগের ইতিহাসেই অবাধে বিচরণ করিত। বাংলাদেশের প্রাচীন ও মধ্য-যুগের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়া তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, এই উভয় যুগের ইতিহাস রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার উড়িষ্যার ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হয় যে, কেবল প্রাচীন এবং মধ্যযুগ নহে, আধুনিকযুগের ইতিহাস লিখিতেও তাঁহার শক্তির অভাব ছিল না।

রাখালদাস সরকারী পুরাতত্ত্ববিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু কার্য্যদক্ষ ও প্রতিভাশালী হইয়াও অপরিণামদর্শিতা এবং দুরদৃষ্টবশতঃ তিনি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কর্ম্মচ্যুত হন। অমিতব্যয়িতার জন্য ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার বিপুল পৈত্রিক সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল। সরকারী কার্য্য হারাইয়া তিনি অর্থাভাবে নিদারুণ কষ্ট পাইতে লাগিলেন। এ সময়ে তিনি দুরারোগ্য ব্যধিতেও ভুগিতেছিলেন। এই দুর্দ্দিনে স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের পরামর্শে উড়িষ্যার ইতিহাস বিষয়ক বিরাট গ্রন্থখানি লিখিয়া তল্লব্ধ অর্থে রাখালদাসকে কোনরূপে সংসার চালাইতে হইয়াছিল। ময়ূরভঞ্জের পুরাতত্ত্বানুরাগী মহারাজা এই গ্রন্থের ব্যয়ভার বহন করেন এবং প্রবাসী

সম্পাদক স্বনামখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহা প্রকাশ করার দায়িত্ব লন।

উড়িষ্যার এইরূপ বিস্তৃত ইতিহাস ইতিপূর্ব্বে আর লিখিত হয় নাই। রাখালদাসের ন্যায় কৃতবিদ্য ঐতিহাসিক ব্যতীত অপর কেহ এই বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেন কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়। রাখালদাসের উড়িষ্যার ইতিহাস প্রকাশের পর আজ কিঞ্চিদধিকপাদশতাব্দী অতীত হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থখানি অপ্রতিদ্বন্দ্বী রহিয়াছে। ভারতের অপর কোন অঞ্চলের এইরূপ বিরাট্ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এ পর্য্যন্ত কোন একজন লেখক কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই। অবশ্য পুস্তকখানি রাখালদাস ব্যাধি ও দারিদ্র্য পীড়িত অবস্থায় অত্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইহাতে ত্রুটি বিচ্যুতির অভাব নাই। অধিকন্তু হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় গ্রন্থকার উহা ভালরূপে সংশোধন করিবার সুযোগ পান নাই। তৎসত্ত্বেও উড়িষ্যার ইতিহাস যে রাখালদাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাখালদাসের উড়িষ্যার ইতিহাস দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বাইশটি অধ্যায়ে বৃহদাকারের সার্দ্ধ তিনশতাধিক পৃষ্ঠায় প্রাচীনতম কাল হইতে সূর্য্যবংশীয় গজপতিরাজগণের শাসনের অবসান পর্য্যন্ত দীর্ঘকালের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। এই অংশ ছেচল্লিশখানি চিত্র সম্বলিত। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে রাখালদাস ছয়টি অধ্যায়ে উড়িষ্যার মুসলমান, মারাঠা এবং ব্রিটিশ অধিকার কালের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। এই অংশের অপর দুইটি অধ্যায়ে দেশের ভাস্কর্য্য এবং স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। এ-খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচশতাধিক এবং চিত্র সংখ্যা পচানব্বই। গ্রন্থখানিতে সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্রশাসন প্রভৃতি বিষয়ের স্বতন্ত্র আলোচনা স্থান পায় নাই। সেদিক হইতে দেখিলে, ইহাকে অসম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু রাখালদাস উড়িষ্যার রাজনৈতিক এবং শিল্পকলা-বিষয়ক ইতিহাসের যে কাঠামো দাঁড় করাইয়াছেন, উহা তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। স্থানে স্থানে অনবধানতার চিহ্ন মিলিলেও গ্রন্থখানির নিকট উড়িষ্যার ইতিহাসপ্রেমীর ঋণ অপরিমেয়। রাখালদাস উড়িষ্যার ইতিহাস রচনায় নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শকের কার্য্য করিয়াছেন। গত পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরে উড়িষ্যার

ইতিহাসের অনেক নূতন উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং নূতন আলোক সম্পাতে কতিপয় তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়ের ইতিহাস সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাখালদাসের উড়িষ্যার ইতিহাস দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পণ্ডিত-সমাজে সমাদরের সহিত পঠিত হইবে।

যে অবস্থায় রাখালদাস তাঁহার উড়িষ্যার ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, দুরবস্থায় তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যেই উহা লিখিবার ভার তৎপ্রতি অর্পিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ সে সময়ে এই ইতিহাস লিখিবার যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন রাখালদাস। ইতিপূর্ব্বেই তিনি নানাপত্রিকায় উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস ও তাম্রশাসনাদি সম্বন্ধে বহুসংখ্যক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া ঐ অঞ্চলের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সরকারী পুরাতত্ত্ববিভাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা সংজ্ঞক বিখ্যাত পত্রিকায় রাখালদাস উড়িষ্যার নিম্নলিখিত প্রাচীন দলিলগুলির পাঠ এবং ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১। শিবরাজের পটিয়াকেল্লা তাম্রশাসন (নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৫ হইতে)।

২। মধ্যমরাজের পরিকুদ তাম্রশাসন (একাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮১ হইতে)।

৩। কুলস্তম্ভের তালচের তাম্রশাসন (দ্বাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬ হইতে)।

৪। বৌধে প্রাপ্ত রণভঞ্জের তাম্রশাসনদ্বয় (ঐ, পৃষ্ঠা ৩২১ ও ৩২৫ হইতে)।

৫। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গুহালেখাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৯ হইতে)।

৬। শুভাকরের নেউলপুর তাম্রশাসন (পঞ্চদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১ হইতে)।

৭। পাটনা যাদুঘরে রক্ষিত দ্বিতীয় সোমেশ্বরের তাম্রশাসন (ঊনবিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৭ হইতে)।

৮। শান্তিকরের ধৌলি গুহালিপি (ঐ, পৃষ্ঠা ২৬৩ হইতে)।

৯। পাটনা যাদুঘরে রক্ষিত রণভঞ্জের তাম্রশাসন (বিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০০ হইতে)।

এতদ্ব্যতীত রাখালদাস উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস ও লেখাবলী সম্বন্ধে অপর যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে বিহার-উড়িষ্যা গবেষণা সমিতির পত্রিকা এবং বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকাতে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ অত্যন্ত মূল্যবান্।

রাখালদাসের উড়িষ্যার ইতিহাস পাঠ করিয়া একটি কথা আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনে হয়। জনৈক উড়িয়া মহারাজার অর্থসাহায্য লাভ করিয়া তিনি গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও গ্রন্থখানিতে ফরমায়েসী রচনার ছাপ নাই। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যাবাসীরা সাধারণতঃ মাদলাপাঞ্জীসংজ্ঞক বিখ্যাত উড়িয়া গ্রন্থে উল্লিখিত কিংবদন্তী গুলিকে ভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে চান না। কিন্তু রাখালদাসের গ্রন্থে উড়িষ্যার ইতিহাসের উপাদান হিসাবে মাদলাপাঞ্জীকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। মাদলাপাঞ্জীতে কেশরী নামক প্রাচীন রাজবংশের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে এবং আজপর্য্যন্ত অনেক উড়িয়া লেখক এই কাহিনীকে ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই কাহিনীর সমর্থক কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই; বরং তাম্রশাসনাদি হইতে যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কেশরীবংশের কাহিনীটির কিছুমাত্র ঐতিহাসিক মুল্য নাই। রাখালদাসের গ্রন্থে মাদলাপাঞ্জীমূলক কেশরীবংশের ইতিহাস স্থান পায় নাই।

গ্রন্থখানিতে অনেক স্থানে রাখালদাসের ঐতিহাসিক দৃষ্টির সূক্ষ্মতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্থলবিশেষে তিনি অতি ক্ষীণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অন্যান্য পণ্ডিতের মতের বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু উত্তরকালে আবিষ্কৃত প্রমাণ হইতে দেখা গিয়াছে যে, রাখালদাসের মতই সত্য। উদাহরণ স্বরূপ আমরা পটিয়াকেল্লা লিপির তারিখ সম্পর্কিত বিতণ্ডার উল্লেখ করিতে পারি। এই তাম্রশাসন কোন একটি অনির্দ্দিষ্ট অব্দের ২৮৩ সংবৎসরে প্রদত্ত হইয়াছিল। রাখালদাসের মতে উহা ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গণিত গুপ্তসংবতের বর্ষ। কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, উড়িষ্যায় গুপ্ত অধিকার প্রসারিত হইয়াছিল। এই সিদ্ধান্তের সমর্থক কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ রাখালদাসের আমলে পণ্ডিত সমাজের জানা ছিল না। কেবল জানা ছিল, গঞ্জামে প্রাপ্ত শৈলোদ্ভববংশীয় দ্বিতীয় মাধববর্ম্মার একখানি তাম্রশাসনের তারিখ গুপ্তাব্দের ৩০০ সংবৎসর। কিন্তু এই মাধববর্ম্মা গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের সামন্ত ছিলেন। তাই অনেকে মনে করিতেন যে, শশাঙ্কের আমলেই গৌড় অঞ্চল হইতে উড়িষ্যায় গুপ্তসংবতের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। এই সকল পণ্ডিতের মতে মাধববর্ম্মার লিপিতে

গুপ্তাব্দের ব্যবহার হইতে উড়িষ্যায় গুপ্ত সম্রাট্‌গণের অধিকার প্রসারের সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় না। দেবদত্ত ভাণ্ডারকর, ননীগোপাল মজুমদার প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করিতেন যে, পটিয়াকেল্লা লিপিতে ২৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গণিত কলচুরি সংবতের বর্ষ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের একটি বড় ত্রুটি এই যে, কাল্পনিক লিপিতত্ত্বঘটিত তথাকথিত প্রমাণ ব্যতীত ইহার পক্ষে বলিবার মত কিছুই ছিল না। কারণ উড়িষ্যায় কলচুরি অব্দ প্রচারের সম্ভাবনা নিতান্ত কম। যাহা হউক, আজ আর কাহারও সন্দেহ নাই যে, এই বিতর্ক ব্যাপারে রাখালদাসের সিদ্ধান্তই সত্য। সম্প্রতি আবিষ্কৃত যে সকল প্রাচীন লিপি এই প্রশ্নের উপর আলোকপাত করিয়াছে, তন্মধ্যে শশাঙ্কের রাজত্বকালীন মেদিনীপুর তাম্রশাসনদ্বয়, পৃথিবীবিগ্রহের সুমঙ্গল তাম্রশাসন, লোকবিগ্রহের কনাস তাম্রশাসন, এবং শত্রুদমনের পেদ্দদূগম্ তাম্রশাসনের সাক্ষ্য অত্যন্ত মুল্যবান্। শশাঙ্কের মেদিনীপুর শাসনদ্বয়ে গুপ্তাব্দের তারিখ ব্যবহৃত হয় নাই। সুতরাং গৌড় অঞ্চল হইতে উড়িষ্যায় গুপ্তসংবতের প্রচার কল্পনার ভিত্তি আছে বলিয়া মনে করা যায় না। আবার গঞ্জাম অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা পৃথিবী বিগ্রহের লিপি হইতে জানা যায় যে, গুপ্তাব্দের ২৫০ সংবৎসরে উড়িষ্যায় গুপ্তসম্রাট্‌গণের অধিকার স্বীকৃত হইত। কিন্তু কনাস শাসনে দেখা যায়, উহার কয়েক বৎসর পরেই উড়িষ্যার নরপতিগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। পৃথিবী বিগ্রহের কিছুকাল পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীকাকুলম্ অঞ্চলের রাজা শত্রুদমন কোন ভট্টারকের অধীনতা স্বীকার করিতেন। এই ভট্টারক গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। কারণ এই যুগে শত্রুদমনের অধিস্বামী হইবার মত অপর কোন সম্রাটের অস্তিত্ব জানা যায় নাই। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, পঞ্চমশতাব্দীর শেষ ভাগে উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তী ছত্রিশগড় অঞ্চলে গুপ্তবংশীয় পরমভট্টারকের অধিকার স্বীকৃত হইত।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন একটি বিতর্কিত ব্যাপারে রাখালদাসের সিদ্ধান্ত উত্তরকালে ভ্রান্ত প্রমাণিত হইলেও বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামতের মধ্যে উহাই সত্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী। উদাহরণ স্বরূপ আমরা উড়িষ্যার ভৌম বা করবংশীয় রাজগণের লিপিতে উল্লিখিত সংবৎ সম্পর্কিত বিতর্কের উল্লেখ করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, উড়িষ্যার

ইতিহাসে আজ যে ভৌম সম্রাট্‌গণের একটা বিশিষ্ট স্থান হইয়াছে, উহার জন্যও আমরা রাখালদাসের নিকট ঋণী।

বহুকাল পূর্ব্বে সুপণ্ডিত কীলহর্ন্‌ সাহেব ভৌমবংশীয় সম্রাজ্ঞী দণ্ডিমহাদেবীর গঞ্জাম তাম্রশাসন প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই লিপির তারিখ একটি অজ্ঞাত সংবতের ১৮০ অব্দ। কীলহর্নের মতে দণ্ডিমহাদেবী খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুসারে একাদশ শতাব্দীতে ঐ সংবতের গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। এই বিষয়ে অপর যে সকল ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দেবদত্ত ভাণ্ডারকর স্থির করেন যে, দণ্ডিমহাদেবীর গঞ্জাম তাম্রশাসনের তারিখ ২৮০ সংবৎসর এবং উহা ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গণিত হর্ষসংবতের বর্ষ। এই মত অনুসারে দণ্ডিমহাদেবী ৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। রাখালদাস স্থির করিয়াছিলেন যে, গঞ্জাম লিপির ১৮০ সংবৎসর ৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গণিত গঙ্গাব্দের বর্ষ; সুতরাং দণ্ডিমহাদেবী ৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন।

উদ্ধৃত তিনটি সিদ্ধান্তই ভ্রান্ত। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশশতাব্দীর সূচনায় শ্রীকাকুলমের গঙ্গবংশীয় অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ পুরীকটক অঞ্চল অধিকার করেন। তৎকালে ঐ অঞ্চলে সোমবংশীয় রাজগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। চোড়গঙ্গের উত্তরাধিকারীরা কটকে গঙ্গরাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং সম্রাজ্ঞী দণ্ডিমহাদেবীর রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় একাদশশতাব্দীর প্রথম ভাগের পরে হইতে পারে না। ইহাতে কীলহর্নের সিদ্ধান্তের অসারতা প্রমাণিত হয়। ভাণ্ডারকরের সিদ্ধান্তের প্রধান ত্রুটি এই যে, গঞ্জাম লিপির তারিখ প্রকৃত পক্ষে ১৮০; ভাণ্ডারকর পঠিত ২৮০ ভ্রান্ত পাঠ মাত্র। হর্ষসংবতের ১৮০ বর্ষে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে দণ্ডিমহাদেবীর রাজত্ব নিতান্তই অসম্ভব। কারণ তাঁহার লিপির অক্ষর ঐ যুগের অনুরূপ প্রাচীন নহে। রাখালদাসের সিদ্ধান্তের ত্রুটি এই যে, প্রকৃত পক্ষে গঙ্গসংবতের গণনা ৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয় নাই। পণ্ডিতগণের আধুনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে আনুমানিক ৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু উল্লিখিত তিনটি অসার সিদ্ধান্তের মধ্যে রাখালদাসের মতই প্রকৃত তথ্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী। কারণ এখন জানা গিয়াছে যে, ভৌমবংশীয় সম্রাট্‌গণের

লেখাবলীতে যে সংবতের ব্যবহার দেখা যায়, ৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে উহার গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং সম্রাজ্ঞী দণ্ডিমহাদেবী ১০১১ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহাতে দেখা যায়, কীলহর্নের তারিখ প্রকৃত তারিখের দুই শতাব্দী পরবর্ত্তী এবং ভাণ্ডারকরের তারিখ উহার দেড় শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু রাখালদাসের ভুল মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দীর।

রাখালদাসের উড়িষ্যার ইতিহাসের প্রধান ত্রুটি এই যে, তিনি অনেক ক্ষেত্রে নবাবিষ্কৃত লেখাবলীর সাক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি তিনি গঙ্গবংশায় সম্রাট্‌গণের ইতিহাস আলোচনায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রমুখ লেখকের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন; অথচ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই দক্ষিণ ভারতীয় লিপিমালা সংজ্ঞক গ্রন্থাবলীর চতুর্থ (১৯২৪), পঞ্চম (১৯২৫) এবং ষষ্ঠ (১৯২৮) খণ্ডে গঙ্গরাজগণের বহুসংখ্যক শিলালিপি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই লিপিগুলির অধিকাংশ তেলুগু ভাষায় লিখিত। এগুলি পাঠ করিলে গঙ্গরাজবংশের ইতিহাসে রাখালদাস অনেক নূতন তথ্যের সমাবেশ করিতে পারিতেন এবং পূর্ব্বগামীদিগের কতকগুলি ভুলভ্রান্তির হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতেন।

আবার দুই একটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, সুযোগ পাইয়াও রাখালদাস পূর্ব্বগামী লেখকের ত্রুটি সংশোধন করিতে পারেন নাই। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তদীয় উড়িষ্যা ইন্‌ দি মেকিঙ্‌ সংজ্ঞক গ্রন্থে গঙ্গরাজ দ্বিতীয় ভানুদেবের (১৩০৫-২৭ খ্রীঃ) একখানি নূতন তাম্রশাসনের সাক্ষ্যবিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। লিপির মর্ম্ম না বুঝিয়া তিনি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, এই লিপি অনুসারে ভানুদেবের রাজত্বের অব্যবহিত পূর্ব্বে গঙ্গসিংহাসন কয়েক বৎসরের জন্য পুরুষোত্তম নামক জনৈক সম্রাটের করতলগত হইয়াছিল। রাখালদাস ঐ তাম্রশাসন খানি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি মজুমদার মহাশয়ের ভ্রান্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, এই লিপিতে ভানুদের নিজেকে পুরুষোত্তমের সামন্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ আরও কতকগুলি লিপিতে তাঁহার জগন্নাথের সামন্তরূপে উল্লেখ দেখা যায়। আবার একস্থানে এই পুরুষোত্তম জগন্নাথকে দেবাদিদেব বলা হইয়াছে। ইনি যে পুরীর দেবতা জগন্নাথ বা পুরুষোত্তম তাহাতে সন্দেহের অবকাশ

নাই। এইরূপ উল্লেখের কারণ এই যে, দ্বিতীয় ভানুদেবের পূর্ব্বপুরুষ তৃতীয় অনঙ্গভীম (১২১১-৩৯ খ্রীঃ) ইষ্টদেবতা পুরুষোত্তম জগন্নাথের উদ্দেশ্যে গঙ্গরাজ্য সম্প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীরা আপনাদিগকে উক্ত দেবতার সামন্তরূপে পরিচিত করিতেন। গঙ্গবংশের লিপিসমূহ উত্তমরূপে পাঠ করিলে এই সত্য অবশ্যই রাখালদাসের বোধগম্য হইত। কিন্তু অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে উহা সম্ভব হয় নাই। তিনি যদি আর কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিতেন এবং পুস্তকখানি সংশোধনের সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার উড়িষ্যার ইতিহাসে এই ধরণের ত্রুটি বিচ্যুতি অধিক দেখা যাইত না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

ঝাঁসীতে বিদ্রোহ সংক্রান্ত কয়েকটি অপ্রকাশিত নজিরপত্র

(রাণী লক্ষ্মী বাঈএর চিঠি ও সরকারী বিবরণী)

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

১৮৫৭ সালে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ঝাঁসীতে সিপাহীদের যে অভ্যুত্থান হইয়াছিল, এ পর্যন্ত বিদ্রোহের ইতিহাস রচয়িতাগণ সাধারণতঃ মনে করিতেন যে রাণী লক্ষ্মী বাঈ তাহার জন্য দায়ী। ম্যালেসন দেখাইয়াছেন যে ৬ই জুন বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতৃত্ব করেন রাণী স্বয়ং। দুর্গে আবদ্ধ ইংরাজ কর্মচারীগণ ও তাহাদের পরিবারবর্গের জীবন রক্ষা করিবেন, রাণী এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তাহাদের হত্যা করা হইয়াছিল। রাণী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সিপাহীদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেন এবং অর্থ সাহায্য করেন। ম্যালেসন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এই সকল ধারণা পোষণ করিতেন। কিন্তু এগুলি যে কতদূর ভ্রান্ত তাহা এই প্রবন্ধে প্রকাশিত রাণীর চিঠিপত্র ও সরকারী বিবরণী হইতে বুঝা যাইবে। নজিরপত্রগুলির মধ্যে জে. ডবলু. পিন্‌ক্‌নীর বিবরণী আমি লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত 'কে'র "মিউটিনী পেপার্স" হইতে নকল করিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম। অন্যান্য চিঠিপত্র ও বিবরণী স্বর্গত গোবিন্দরাম চিন্তামণি তাম্বে দিল্লীর মহাফেজখানায় সংরক্ষিত নজিরপত্র হইতে সংগ্রহ করেন। স্বর্গত তাম্বে প্রচুর উপাদান ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সম্ভবত ঝাঁসীর ইতিহাস রচনা করিবার বাসনা তাঁহার ছিল, কিন্তু সে ইতিহাস লিখিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সম্প্রতি তাঁহার পুত্র ডঃ ই. জি. তাম্বে

* 'বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট' পত্রিকার জুবিলি সংখ্যায় প্রকাশিত 'Some unpublished documents regarding the Mutiny of 1857' শীর্ষক প্রবন্ধটির মর্মানুবাদ।

এই সকল সংগৃহীত উপাদান আমার হস্তে অর্পণ করেন। সেই নজিরপত্রের কয়েকটি এই প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে।

এ পর্যন্ত ঐতিহাসিকগণ প্রধানতঃ নির্ভর করিয়াছেন পি. জি. স্কট লিখিত বিবরণীর উপর। স্কটের পূর্বে ঝাঁসীর বিদ্রোহ সম্পর্কে ক্যাপ্টেন পিন্‌ক্‌নী একটি বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। পিন্‌ক্‌নীর বিবরণীতে রাণী লছমী বাঈ ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে যে কয়েকটি চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। সেগুলি কোনও ঐতিহাসিকের নজরে পড়িল না, ইহাই আশ্চর্য। ঐতিহাসিক 'কে' জোরগলায় সেগুলির অস্তিত্বও অস্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক এই চিঠিগুলি পড়িলে রাণীর বিদ্রোহকালীন নীতি ও কর্মপন্থা সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণা যে বদলাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্রোহের প্রথম পর্যায় বিদ্রোহীর সাথে যোগ দেওয়া দূরে থাকুক, রাণী যথাসাধ্য ইংরাজদের সাহায্য করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতে যে সময় বিদ্রোহ ঘোরতর আকার ধারণ করিতেছিল রাণী লক্ষ্মী বাঈ সে সময় সদাশিব রাও এবং অর্চ্ছা ও দতিয়ার অধিপতিদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৮৫৭ সালের জানুয়ারী মাস অবধি রাণী ছিলেন ইংরাজদের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন; তিনি তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন। বিদ্রোহের শেষ পর্যায় রাণী যখন দেখিলেন যে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে নিশ্চিতভাবে রাজদ্রোহী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন তখন তিনি শত্রুহস্তে পড়িয়া ফাঁসীতে ঝুলা অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জণ দেওয়া শতগুণে শ্রেয় বলিয়া মনে করিলেন। রাণী লক্ষ্মী বাঈ ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানের প্রথম পর্যায় কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই বা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেন নাই। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়া তিনি যে অপূর্ব বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার জন্য তিনি চিরস্মরণীয়া।

—১—

সি. বিডনের নিকট এরস্কিনের পত্র

জব্বলপুর, ২রা জুলাই, ১৮৫৭

মহাশয়,

গতরাত্রে দুইজন হরকরা ঝাঁসীর রাণীর নিকট হইতে দুইটী পত্র আনিয়াছে। আমি সেগুলির অনুবাদ পাঠাইতেছি। রাণীকে লিখিত আমার পত্রের নকলও ইহার সহিত পাঠাইতেছি।

এইগুলি পড়িলে বুঝা যাইবে যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাণী বিদ্রোহীদের কোনরূপ সাহায্য করেন নাই। অপর পক্ষে তাঁহার ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া রাজ্যের শাসনভার নিজ হস্তে লইতে হইয়াছে। প্রয়োজনীয় অর্থ ও সৈন্যবল না থাকায় রাণী শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে অক্ষম।

এখানে যেরূপ অরাজকতা রহিয়াছে তাহা দমন করিবার মত সৈন্যবাহিনী এবং জিলা শাসন করিবার জন্য যোগ্য কর্মচারী আমার অধীনে নাই। রাণীকে আমি খাজনা আদায় করিতে, পুলিশবাহিনী গঠন করিতে এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে বলিয়াছি। রাণীর আদেশ পালন করিবার জন্য জেলার অধিবাসীদের নিকট একটি ঘোষণাপত্র পাঠাইয়াছি।

... ...

হরকরা দুইজন যে দেশের মধ্য দিয়া আসিয়াছে সেখানে এখন পূর্ণ অরাজকতা বিরাজ করিতেছে। পথে দুর্বৃত্তেরা তাহাদের সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে। আমি তাহাদের প্রত্যেককে ৩০৲ টাকা করিয়া দিয়াছি। চিঠিগুলি ঠিকমত রাণীর নিকট পৌঁছাইয়া দিলে আরও ২০৲ টাকা দিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছি।

—১ ক—

সগর জিলার কমিশনারের নিকট লিখিত রাণীর পত্র

১২ জুন, ১৮৫৭

রাণী জানাইতেছেন যে ঝাঁসীতে সরকার পক্ষের ফৌজ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইওরোপীয় সামরিক অসামরিক কর্মচারীদের নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়াছে। তাহাদের পরিবারবর্গও রেহাই পায় নাই। রাণী দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে তাঁহার অধীনে মাত্র ৫০।১০০ দেহরক্ষী থাকায় তিনি ইওরোপীয়দের কোন সাহায্য করিতে পারেন নাই। বিদ্রোহীরা পরে তাঁহার ও তাঁহার অনুচরদের উপর নানারূপ নির্যাতন করিয়া প্রচুর অর্থ আদায় করে। রাণীকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বলে। সিপাহীদের হস্তে নিহত ইওরোপীয় কর্মচারীরাই ছিলেন তাঁহার একমাত্র সহায়।

বিদ্রোহী সিপাহীরা তাঁহাকে অসহায় জানিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া শাসাইয়াছিল যে তিনি যদি তাহাদের অনুরোধ রক্ষা না করেন তাহা হইলে তাহারা কামান দাগিয়া তাঁহার প্রাসাদ উড়াইয়া দিবে। সব দিক বিবেচনা করিয়া তিনি তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে ও নির্যাতন সহ্য করিতে বাধ্য হন। স্বীয় মান ও প্রাণ রক্ষার জন্য প্রচুর অর্থও তাহাদের দেন।

এই জিলায় কোন ব্রিটিশ কর্মচারী বিদ্রোহীদের অত্যাচার হইতে রেহাই পায় নাই জানিয়া সকল নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নিকট তিনি এই মর্মে পরোয়ানা জারি করিয়াছেন তাহারা যেন নিজ নিজ এলাকায় থাকিয়া যথারীতি কর্তব্য করিয়া যান।

বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই তাঁহার এই বিবরণী পাঠানো উচিত ছিল। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে সে সুযোগ দেয় নাই। এখন তাহারা দিল্লীর পথে যাত্রা করায় তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া উপরোক্ত বিবরণ পাঠাইয়াছেন।

(অনুবাদ)

(স্বাক্ষর) এরস্কিন

(লেঃ গবর্ণরের অধীনে কমিশনার ও এজেণ্ট)

—১ খ—

কমিশনারের নিকট লিখিত রাণীর পত্র

১৪ই জুন, ১৮৫৭

রাণী জানাইতেছেন যে ১২ তারিখের একটি পত্রে তিনি হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনের বিবরণ দিয়াছেন। হতভাগ্য ইওরোপীয়দের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ হত্যাকাণ্ড আর কোথাও হয় নাই বলিয়া তিনি মনে করেন। ক্রমাগত ঝাঁসী রাজ্যের অধীন এলাকাগুলিতে সামন্তরা বিদ্রোহ করিয়াছে ও লুঠতরাজ করিতেছে। রাণীর প্রচুর অর্থও নাই। এই দুর্দিনে মহাজনরাও ঋণদানে অনিচ্ছুক। সুতরাং তাঁহার পক্ষে জিলার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বন্দোবস্ত করা সম্ভব নয়। এ পর্যন্ত নিজের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এবং অশেষ অসুবিধা সহ্য করিয়াও তিনি ঝাঁসীর নগরবাসীদের অত্যাচার ও লুণ্ঠন হইতে রক্ষা করিয়াছেন, কোন রকমে শাসন ব্যবস্থার কাঠামো টুকু বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। সরকারী ফৌজ ও উপযুক্ত অর্থ সাহায্য না পাইলে তাঁহার পক্ষে বেশীদিন রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

(অনুবাদ)

(স্বাক্ষর) এরস্কিন

কমিশনার এণ্ড এজেণ্ট ইত্যাদি

—১ গ—

৫ই জুন বেলা ১টার সময় ঝাঁসীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহার বিবরণ

ঐদিন বেলা একটার সময় প্রায় ৫০।৬০ সিপাহী বিদ্রোহী হইয়া, অস্ত্রাগার ও সরকারী কোষাগার দখল করে। তারপর ক্যাপ্টেন স্কীন্ এর কুটীর লক্ষ্য করিয়া গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় ক্যাপ্টেন স্কীন স্ত্রী ও শিশুদের লইয়া ক্যাপ্টেন গর্ডন এর সাথে শহরে যাইয়া শহর রক্ষার ব্যবস্থা করেন, তারপর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে অন্যান্য ইওরোপীয় কর্মচারীগণ দুর্গে প্রবেশ করেন, এবং দুর্গ রক্ষার জন্য অল্প সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রাখেন। রাণীও তাঁহাদের সাহায্যার্থ নিজ রক্ষীবাহিনীর কয়েকজনকে দুর্গে প্রেরণ করেন। ৬ই জুন বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অবস্থা এইরূপ থাকে—অর্থাৎ যাহারা পূর্বদিন বিদ্রোহ করিয়াছিল তাহারা ব্যতীত অন্যান্য সৈন্যরা তখনও শান্ত ছিল। বেলা ১২ টার পর সকলেই বিদ্রোহ করে, ইওরোপীয় কর্মচারীদের হত্যা করে, তাহাদের কুটীরগুলি পোড়াইয়া ফেলে, সরকারী দপ্তরখানাগুলি লুণ্ঠন করে ও সকল দলিলপত্র নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহার পর বন্দীশালায় যাইয়া বন্দীগণকে মুক্তি দেয়। বন্দীশালার দারোগা তাহাদের সহিত যোগ দেয়। তাহার পর বিদ্রোহীদল নগরে প্রবেশ করে ও দুর্গটি ঘিরিয়া ফেলে; ইওরোপীয়গণ পূর্ব হইতে দুর্গের প্রবেশদ্বারগুলি রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা দুর্গের প্রাকার হইতে অবিরাম গুলি বর্ষণ করিতে থাকায়, বিদ্রোহী সিপাহীরা দুর্গে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

৭ই জুন বিদ্রোহীরা দুর্গ প্রাকারের উপর গোলাবর্ষণ করিতে থাকে। চার পাঁচটি গোলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নগরের মধ্যে আসিয়া পড়ায় নগরবাসীদের মনে বিশেষ ত্রাসের সঞ্চার হয়। ৮ই জুন বিদ্রোহী সেনাদল দুর্গ আক্রমণ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে ও রাণীর ১৫০ জন সিপাহীকে এই কাজে যোগ দিতে বাধ্য করে। বেলা তিনটা পর্যন্ত আক্রমন চলে।

এই কয়দিন ধরিয়াই ইওরোপীয়গণ দুর্গ রক্ষা করেন এবং আক্রমণকারীদের অনেককেই আহত ও নিহত করেন। এই সময় ক্যাপ্টেন গর্ডন গুলির আঘাতে নিহত হন। অবশেষে ক্যাপ্টেন স্কীন তাঁহার স্ত্রী ও শিশুদের লইয়া অপর ইওরোপীয় কর্মচারীদের সহিত দুর্গ হইতে পলায়নের চেষ্টা করিলে নিষ্ঠুর সিপাহীরা তাঁহাদের বাধা দেয় ও হত্যা করে। এই নিষ্ঠুর হত্যার জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাহাদের নিশ্চয়ই শাস্তি দিবেন। বিদ্রোহীরা নগরে প্রবেশ করিয়া নিজেদের খেয়ালমত কয়েকজন নগরবাসীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। রাণী কোন ক্রমে নিজের প্রাণ রক্ষা করেন, বিদ্রোহীরা তাঁহার অর্থ ও সম্পত্তি কাড়িয়া লয়। তাহারা ঘাঁটি আগুলিয়া

থাকায় রাণীর পক্ষে কোন সংবাদ পাঠানো সম্ভব হয় নাই। ১১ই জুন দুর্বৃত্তেরা নগর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের দুষ্কর্মের জন্য তাহারা নরকবাস করিবে।

—২—

মধ্যভারতের এজেন্টের নিকট লিখিত রাণীর পত্র

১লা জানুয়ারী, ১৮৫৮

যখন ঝাঁসাস্থিত সরকারী ফৌজ বিদ্রোহী হইয়া আমার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিল এবং দতিয়া ও ওর্চ্ছার অধিপতিরা আমার রাজ্য আক্রমন করিল তখন আমি কালবিলম্ব না করিয়া সকল ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ইংরাজ কর্মচারীর নিকট পাঠাইয়াছিলাম। পত্রবাহকদের অধিকাংশই গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার পূর্বেই দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সব কিছু খোয়াইয়া ঝাঁসীতে ফিরিয়া আসে। আগ্রায় যাহারা গিয়াছিল তাহারা এক ভিস্তির সাহায্যে দুর্গমধ্যে পত্রগুলি পাঠাইতে সমর্থ হয়, কিন্তু অধিককাল সেইস্থানে থাকিলে জীবন বিপন্ন হইতে পারে ভাবিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ফিরিয়া আসে। মেজর এলিস্ আমাকে জানাইয়াছিলেন যে ক্যাপ্টেন স্কীনের স্থলে যাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাঁহার নিকট আমার চিঠিগুলি পাঠানো হইয়াছে। ইহার পর কমিশনারের নিকট হইতে ২৩শে জুন তারিখের একটি চিঠি পাই। তাহাতে আমাকে জিলার শাসনভার গ্রহণ করার জন্য আদেশ করা হয়। ১০ই জুলাই তারিখের একটি পত্রে আমার তিনটি চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া কমিশনার একটি ঘোষণাপত্রের উল্লেখ করেন—এই ঘোষণাপত্রে আমাকে জিলার শাসনভার গ্রহণ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ২৯শে জুলাই তারিখে আমি তাহাকে জানাইয়াছিলাম যে আমি কোনও ঘোষণাপত্র পাই নাই।

অরাজকতার সুযোগ লইয়া দতিয়া ও ওর্চ্ছার অধিপতিরা পূর্ব-পশ্চিমে তাহাদের রাজ্যের সীমান্তবর্তী ঝাঁসীরাজ্যের অংশগুলি দখল করিয়া লয়।

৩রা সেপ্টেম্বর উভয় রাজ্যের অধিপতিরা এক যোগে ৪০,০০০ সৈন্য ও ২৮টি কামান লইয়া ঝাঁসী আক্রমন করে।······১৯শে অক্টোবর আমি কমিশনারকে এ পরিস্থিতির কথা জানাই, উত্তরে তিনি লেখেন যে জব্বলপুরে ব্রিটিশ ফৌজ গঠিত হইতেছে, তাহা লইয়া তিনি ঝাঁসীতে আসিবেন এবং অবস্থা বুঝিয়া যথাযথ ব্যবস্থা করিবেন। ইতিমধ্যে আমি সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া মহাজনদের নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া রক্ষীবাহিনী গঠন করি এবং নগররক্ষার ব্যবস্থা করি। শত্রু বাহিনী গোলাবর্ষণ করিয়া প্রচুর ক্ষতি সাধন করে এবং প্রায় ১ হাজার লোক নিহত হয়। আমার জনবল হ্রাস পাওয়ায় আমি ২০শে সেপ্টেম্বর ও ১৯শে অক্টোবর সৈন্য পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানাই।

দুইমাস ঝাঁসী অবরোধ করার পর তাহারা পশ্চাদপসরণ করে। ওর্চ্ছার রাজা যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা এখনও তাহার দখলে আছে।······এই অবস্থায় ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য ব্যতীত শত্রুদের হাত হইতে রক্ষা ও ঋণজাল হইতে মুক্তির কোন উপায় দেখি না। কমিশনার ৯ই নভেম্বরের চিঠিতে জানাইয়াছেন যে তিনি এখনও আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন।···আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

(অনুবাদ)

(স্বাক্ষর) এ. আর. ই. হাচিন্‌সন্

এজেণ্ট ইত্যাদি

—৩—

ঝাঁসীর সংবাদ

১৩ই মার্চ, ১৮৫৮

১৭ই মার্চ। লালু বক্সী ও তাঁতিয়া টোপী রাণীকে ইংরাজদের সহিত সন্ধি করিতে বলেন।······এই উপদেশ গ্রহণ করা হয়। এজেণ্টের নিকট চিঠি পাঠানো হইয়াছে এবং বানপুর ও নারোয়ারের রাজাদের উপর ঝাঁসী ত্যাগ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।······হুসেন আলি খাঁ প্রমুখ সেনানায়কগণ রাণীর কর্মচারীদের জানাইয়াছে যে রাণী ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিবেন জানিয়া তাহারা তাঁহার সেনাদলে যোগ দিয়াছিল। রাণী যদি ইংরাজদের সহিত সন্ধি করেন তাহা হইলে তাহাদের বাকী মাহিনা দিয়া বিদায় দিতে পারেন।

১৮ই মার্চ। একটি হরকরা এজেণ্টকে পত্র দিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। রাণী কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। একদিকে বিদ্রোহী সেনাদলের ভয়ে তিনি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ; অপর দিকে নিজের মন্ত্রীদের উপদেশানুসারে সন্ধি করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু যুদ্ধের জন্য আয়োজন চলিতেছে। অধিকাংশ নাগরিক সহর ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, মন্ত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ অস্থাবর সম্পত্তি গোয়ালিয়রে স্থানান্তরিত করিয়াছে।······

—৪—

সার রবার্ট হ্যামিলটনের নিকট লর্ড ক্যানিং এর পত্র,

এলাহাবাদ, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৮

প্রিয় সার রবার্ট,

নর্মদা ফিল্‌ড্‌ ফোর্স ঝাঁসী আক্রমণ করিলে রাণী যদি তাহাদের হস্তে বন্দী হন তাহা হইলে সামরিক প্রথায় তাঁহার বিচার হইবে না। সে জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করা হইবে।

রাণীকে আপনার হস্তে অর্পণ করিবার জন্য সার হিউ রোজকে নির্দেশ দেওয়া হইবে। আপনি আপনার মনোমত ব্যক্তিদের লইয়া একটি কমিশন গঠন করিবেন।

কোন কারণে শীঘ্র তাঁহার বিচার করা সম্ভব না হইলে এবং ঝাঁসীতে বা ঝাঁসীর নিকটবর্তী স্থানে তাঁহাকে রাখা নিরাপদ বলিয়া মনে না হইলে, রাণীকে এখানে পাঠানো চলিতে পারে। রাণীর বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ আছে তাহা পূর্বে স্থির হওয়া উচিত। বিনাদোষে তাঁহার বিচার হইতেছে এইরূপ সন্দেহ যেন রাণীর মনে না জাগে। তাঁহাকে কি শাস্তি দেওয়া হইবে তাহা কমিশন যে রায় দিবেন তার উপর নির্ভর করিবে।

—৫—

জে. ডবলু. পিন্‌কনীর বিবরণী

২০শে নভেম্বর, ১৮৫৮

৬ই জুন—(সিপাহী বিদ্রোহ করিয়া দুর্গ অবরোধ করিবার পর) রাত্রে বিদ্রোহী সিপাহী ও রাণীর কর্মচারীদের লইয়া একটি সভা বসে। ব্রিটিশদের তাড়াইয়া কাহার হস্তে শাসনভার তুলিয়া দেওয়া হইবে তাহাই ছিল আলোচনার বিষয়। রাণী ও বিদ্রোহীরা একমত হইতে না পারায় এ প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। রাণীকে জব্দ করিবার জন্য বিদ্রোহীরা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সদাশিব রাও নারায়ণকে দাঁড় করাইল।

৭ই জুন—রাণীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দুইজন ইওরোপীয় কর্মচারীকে পাঠানো হইল। রাণীর প্রাসাদে পৌঁছিলে তাহাদের রাণীর নিকট লইয়া যাওয়া হইল। রাণীর আদেশে সিপাহীদের নিকট পাঠানো হইল। তাহারা সিপাহীদের হস্তে নিহত হইল। প্রাসাদের নিকটে এণ্ডারসনকে হত্যা করা হইল।[১] রিসালদার ফয়েজ আলী এইমর্মে দুর্গের ইওরোপীদের চিঠি দিলেন যে তাঁহারা যদি দুর্গ ছাড়িয়া চলিয়া যান তাহা হইলে তাঁহাদের উপর কোন অত্যাচার করা হইবে না। রাণী এবং স্কীন ও গর্ডনের মধ্যে অনেক চিঠি আদানপ্রদান হইল,[২] কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি স্থির হইল তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

১। সদর আলা মিঃ এণ্ড্রুজকে ভারতীয়ের ছদ্মবেশে রাণীর নিকট পাঠানো হয়। সিপাহীরা পথিমধ্যে তাঁহাকে চিনিতে পারে ও হত্যা করে।

২। গর্ডনের পত্রের উত্তরে রাণী লেখেন, "আমি কি করিতে পারি? সিপাহীরা আমাকে বন্দী করিয়াছে এবং বলিতেছে যে আমি আপনাদের আশ্রয় দিয়াছি। তাহারা অবিলম্বে দুর্গ দখল করিতে চায়।—আপনারা যদি জীবন রক্ষা করিতে চান তাহা হইলে দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কেহ আপনাদের কোন ক্ষতি করিবে না।"

স্থীন ইঙ্গিতে জানাইলেন যে তাঁহারা সন্ধি করিতে প্রস্তুত, বিদ্রোহীরা তখন দুর্গের প্রবেশপথে সমবেত হইল। তাহারা শপথ করিয়া বলিল যে ইওরোপীয়রা অস্ত্রত্যাগ করিয়া দুর্গ ছাড়িয়া গেলে তাহাদের নিরাপদে যাইতে দেওয়া হইবে। কয়েকটি অশ্বারোহী আসিয়া সংবাদ দিল যে রিসালদারের আদেশ ইওরোপীয়দের মারিয়া ফেলিতে হইবে। ইহার পর সকলকে হত্যা করা হইল।

৯ই জুন কে শাসন ভার পাইবে তাহা লইয়া রাণী ও সদাশিব রাওর মধ্যে বিরোধ বাধিল। অবশেষে রাণী প্রচুর অর্থ এবং ভবিষ্যতে আরও দিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে পর বিদ্রোহীরা তাঁহার হস্তে শাসনভার ছাড়িয়া দেয়। রাণী তাঁহার দত্তক পুত্র অষ্টমবর্ষীয় বালক দামোদর রাওর নামে রাজকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১১ই জুন সিপাহীরা ঝাঁসী ত্যাগ করিয়া দিল্লীর পথে যাত্রা করে।

সদাশিব রাও ইত্যবসরে ঝাঁসী হইতে ত্রিশ মাইল দূরে একটি দুর্গ অধিকার করিয়া নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করে। রাণীর সৈন্য বাহিনী তাহাকে আক্রমন করিয়া পরাজিত ও বন্দী করে।

কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র ঝাঁসী রাজ্যের অধিবাসীরা রাণীর কর্তৃত্ব মানিয়া লইল। তাহার পর রাণী নানাসাহেবের নিকট দূত প্রেরণ করেন, সৈন্যদল গঠন করেন, ঝাঁসীতে একটি টাঁ্যাকশাল স্থাপন করেন এবং ঝাঁসীর দুর্গ আরও সুরক্ষিত করেন। তিনি জব্বলপুরস্থ ব্রিটিশ কমিশনারের নিকট পত্র লেখেন: ইউরোপীয়দের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন, সে ব্যাপারে তাঁহার কোন হাত ছিল না। যাহা হউক যতদিন না পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ঝাঁসী পুনর্দখল করিতেছেন ততদিন রাণী সরকারের পক্ষ হইতে রাজ্যশাসন করিবেন।

—৬—

দামোদর রাও-এর নিকট টি. এ. মার্টিনের পত্র

আগ্রা, ২০শে আগষ্ট, ১৮৮৯।

প্রিয় রাও সাহেব,

গতকাল আপনার ১৭ তারিখের পত্র পাইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। আপনি যে দলিলপত্র পাঠাইয়াছেন তাহা আমি মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছি। ভারত সরকার এবং সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া উভয়েই স্পষ্টভাবে আপনার দাবী নাকচ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে সুবিচার প্রত্যাশা করিয়া কোন ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। এমন কোন সম্পত্তি আছে কিনা যাহাতে কেবল

আপনারই অধিকার এবং যাহা আপনার মাতা বিদ্রোহ করায় সরকার বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করেন নাই, পররাষ্ট্র দপ্তরে রক্ষিত নজিরপত্র হইতে তাহা খুঁজিয়া বাহির করাই হইতেছে আপনার একমাত্র উপায়। আপনি ইহার নজির আবিষ্কার করিতে পারিলেই সরকার বাহাদুরের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন। তাহা করিতে হইলে পূর্বে মামলা চালাইবার জন্য অর্থ এবং আপনার স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

আপনার ভাগ্যহীনা মাতার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় এবং নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইয়াছে। তাঁহার বিষয় আমি যেরূপ জানি অন্য কেহ সেরূপ জানে না। ১৮৫৭ সালের জুন মাসে ঝাঁসীতে যে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় তাহার সহিত সে ভাগ্যহীনা রমণীর কোনও যোগ ছিল না। বরঞ্চ দুইদিন ধরিয়া তিনি ইউরোপীয়দের খাদ্য সরবরাহ করিয়াছিলেন এবং ১০০ সৈন্য তাহাদের সাহায্যার্থ পাঠাইয়াছিলেন। তিনি তাহার পর মেজর স্কীন ও ক্যাপ্টেন গর্ডনকে অবিলম্বে দতিয়া রাজ্যে পলায়ন করিয়া তথাকার রাজার শরণাপন্ন হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা শুনেন নাই। অবশেষে সরকারী ফৌজই তাঁহাদের হত্যা করে। এক্ষেত্রে রাণী কি করিয়া তাঁহাদের বাঁচাইতেন? তাঁহার অধীনে মাত্র ৩০।৪০ জন সৈন্য ছিল। বিদ্রোহীরা ঝাঁসী ত্যাগ করিয়া গেলে তিনি তাঁহার রাজ্যের ভার স্বহস্তে তুলিয়া লইয়াছিলেন। দতিয়া ও ওর্চ্ছার রাজারা ইউরোপীয়দের রক্ষা করিতে পারিত—যে প্রান্তরে তাহাদের হত্যা করা হয় সেখান হইতে ওর্চ্ছা রাজ্যের সীমানার দূরত্ব মাত্র ১½ মাইল, দতিয়া রাজ্য মাত্র ৬ মাইল। আমাদের দেশবাসীদের সাহায্যার্থে আগাইয়া আসা দূরে থাকুক, আপন আপন সীমানার মধ্যে থাকিয়া তাহারা সরকারী ফৌজের কার্যকলাপ কেবল লক্ষ্য করিয়াছে। রাণীকে অসহায় জানিয়া তাহারা একযোগে তাঁহার উপর আক্রমণ চালায়; সেই বীর রমণীর প্রচেষ্টার ফলে মধ্যে মধ্যে বাধা পাইয়া পশ্চাদপসরণ করে।

যখন সার হিউ রোজ সার রবার্ট হ্যামিল্টনের সহিত ঝাঁসীর নিকটে আসিলেন তখন রাণী তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পূর্বেই দুই রাজ্যের রাজারা তাঁহাদের বুঝাইল যে তাহারা সরকার পক্ষে যুদ্ধ করিতেছে। ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন অবশ্য প্রশ্ন করেন যে যখন ইংরাজদের হত্যা করা হইতেছিল তখন তাহাদের অধীনে বিরাট সৈন্যবাহিনী থাকা সত্ত্বেও তাহারা কেন হতভাগ্যদের প্রাণ রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করে নাই এবং সার হিউ রোজ লক্ষ্মীবাঈ-এর উপর মর্দন সিংকে ব্রিটিশ হস্তে সমর্পণ করিবার আদেশ দিলে তাহারা কেন রাণীকে সে আদেশ অগ্রাহ্য করিবার মন্ত্রণা দিয়াছিল।

যতই আমি রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর প্রতি অবিচারের কথা চিন্তা করি ততই আমার

শরীরের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠে। রাণী সকল ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ কর্ণেল এরস্কিনকে পাঠাইয়াছিলেন। কর্ণেল ফ্রেজারকে অনুরূপ পত্র দেন। আমি স্বহস্তে তাঁহাকে সে চিঠি দিয়াছিলাম। কিন্তু হায় তখন ঝাঁসীর কথা লোকমুখে এমন আকার ধারণ করিয়াছে যে তাঁহার পক্ষে যাহা বলিবার আছে তাহা না শুনিয়াই তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হইল।

আপনি যে আবেদন করিয়াছিলেন সরকার পক্ষ হইতে তাহার জবাব পড়িয়া মনে হয় যে ভারত সরকার ও লণ্ডনস্থ কর্মসচিব আপনার প্রতি একেবারেই সহানুভূতিশীল নহেন। অথচ ঝাঁসী, নাগপুর ও অযোধ্যা রাজ্যের প্রতি ডালহৌসীর কঠোর নীতির ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে সে বিষয়ে তাঁহারা কিছুমাত্র চিন্তা করেন না। ইতি—

ভবদীয়

টি. এ. মার্টিন।

(T. A. Martin)

আচার্য্য শান্তিপাদ

শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী

পাল যুগে বাঙ্গালীর মনীষা দিকে দিকে ব্যপ্ত হ'য়ে প'ড়েছিল, ধর্ম্মকর্ম্ম, ধ্যান, ধারণা, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি আশ্রয় করে। বৌদ্ধ পাল-সম্রাটদের আনুকূল্যে বাংলা ও মগধের বিহার ও মঠগুলো গ'ড়ে উঠেছিল তখনকার কালের বিশিষ্ট শিক্ষায়তনরূপে। এইসব শিক্ষায়তনের খ্যাতি দেশের গণ্ডী পেরিয়ে ছড়িয়ে প'ড়েছিল দূর বিদেশে, আর নানাদেশ থেকে শিক্ষার্থীরা আসতেন এইসব বিহারালয়ের দিকপাল মহাপণ্ডিতদের নিকট বিদ্যালাভের আগ্রহে। পূর্ব ভারতের মহাবিহারগুলির এইসব খ্যাতিমান ও দ্যুতিমান পণ্ডিতাচার্য্যদের একজন ছিলেন শান্তিপাদ।

দুঃখের বিষয় ভারতীয় ঐতিহ্যে এই সব ভাস্বর মহাপণ্ডিতদের স্মৃতি ম্লান হয়ে গেছে নানা কারণে। কিন্তু বিদেশী শিক্ষার্থীরা বহু আয়াসে আচার্য্যদের রচিত নানা গ্রন্থের নকল সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন নিজেদের দেশে আর প্রয়োজনমত তাঁদের ভাষায় অনুবাদ করে গেছেন। এইভাবে বিদেশে তাঁদের অনেক কীর্ত্তিই সংরক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশ ও পূর্বভারতের সঙ্গে নেপাল ও তিব্বতের তখন ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই দুই দেশ থেকে যেমন অনেক শিক্ষার্থীরা এসেছিলেন এদেশে, তেমনি অনেক আচার্য্যরা এই দুই দেশে গিয়েছিলেন সেখানকার সাদর আমন্ত্রণে। এই দুই দেশ তাই এইসব মহাধ্যাপক পণ্ডিতদের স্মরণ করে রেখেছেন নানা ভাবে—নেপাল বিখ্যাত কীর্তি এই সব পণ্ডিতদের গ্রন্থের প্রতিলিপি সংরক্ষণ ক'রে, আর তিব্বত তার সুসম্বদ্ধ অনুবাদ সংগ্রহের অবলম্বনে। আমাদের কীর্ত্তি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে এই দুটী দেশ যে আগ্রহ দেখিয়েছে তার জন্য এদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে অনেক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছেন। একখানি "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়" নামে তান্ত্রিক সহজ সাধনা সম্বন্ধীয় কয়েকটী গান বা পদের সমষ্টি। এই গানগুলো আমাদের নিকট এখন দুর্ব্বোধ্য মনে হতে পারে; কিন্তু এর বাক্‌ভঙ্গী, ব্যাকরণরীতি

আর অন্ত্যমিলে বাঁধা ছন্দ একান্তই বাংলাভাষার রীতি ও বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। এগুলো বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলেই পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন।

এই পদসমষ্টিতে বাংলাভাষার বাইশজন প্রাচীন কবির নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে শান্তিপাদ অন্যতম। তাঁর ভনিতাযুক্ত সহজসাধন সম্বন্ধীয় তুইটী গান এই সংগ্রহে আছে। এইপদ তুটীতে তাঁর পরিচয় কিন্তু ধরা পড়ে না। এই সব পদকর্ত্তারা সিদ্ধাচার্য্য নামে অভিহিত ছিলেন, আর তাঁদের অনেকের পরিচয় মেলে তিব্বতীয় অনুবাদ সংগ্রহের তেঙ্গুর শাখায়। তেঙ্গুরের গ্রন্থ-তালিকা থেকে জানা যায় শান্তিপাদের আর এক নাম ছিল রত্নাকরশান্তি, আর তিনি ছিলেন এক দিগ্‌গজ বৌদ্ধ পণ্ডিত। তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ এখনও তেঙ্গুর তালিকায় বর্তমান। তার মধ্যে অনেকগুলিতে গ্রন্থকার রত্নাকরশান্তি ও শান্তিপাদ বা শান্তিপ এই তুই নামেই অভিহিত হয়েছেন। এই পণ্ডিতের রচিত "সহজ-যোগক্রম" ও "সহজ-রতিসংযোগ" নামে সহজ মত সম্বন্ধে তুখানি গ্রন্থও তেঙ্গুর তালিকায় স্থান পেয়েছে। তিব্বতীয় ঐতিহ্যের রত্নাকরশান্তি বা শান্তিপাদ আর প্রাচীন চর্য্যাগীতির শান্তিপাদ যে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।

তিব্বতীয় ঐতিহ্য মতে জানা যায় যে শান্তিপাদ বা রত্নাকরশান্তি প্রথম বয়সে ওদন্তপুরী বা উদ্দণ্ডপুর মহাবিহারে সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে বিক্রমশীলা মহাবিহারে আচার্য্য জেতারি ও রত্নকীর্ত্তি প্রমুখ অধ্যাপকের নিকট সূত্র ও তন্ত্র অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়নশেষে মগধের রাজা তাঁকে নিযুক্ত করেন বিক্রমশীলা মহাবিহারের পূর্বদ্বারের অধ্যক্ষের পদে। বহু তীর্থিককে তিনি তর্ক যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁদের স্বমতে দীক্ষা দেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। শোনা যায় সিংহল রাজের আহ্বানে তিনি একবার সিংহল দ্বীপে যান, আর সেখানে তাঁর মতের বহুল প্রচার করেন। মগধের অন্তর্গত বিক্রমশীলা মহাবিহারের আচার্য্যরূপে তিনি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন; এ কারণে হয়তো কেউ কেউ মনে করতে পারেন তিনি ছিলেম মগধের অধিবাসী কিন্তু প্রাচীন বাংলা ভাষায় সহজ-পদ রচনায় তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেম এ সিদ্ধান্তই সঙ্গত বলে মনে হয়।

তেঙ্গুর গ্রন্থ তালিকা আলোচনা করলে শান্তিপাদ বা রত্নাকরশান্তির মনীষা বা পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। তেঙ্গুর সংগ্রহে তার রচিত আটাশখানি গ্রন্থের অনুবাদ আছে। এই মহাপণ্ডিত একাধিক নামে পরিচিত ছিলেন সে প্রমাণও সুস্পষ্ট। লোকাকরশান্তি ছিল তাঁর তৃতীয় নাম এ তথ্য আমরা জানিতে পারি তাঁর রচিত "প্রজ্ঞাপারমিতাভাবনোপদেশ" নামক গ্রন্থ থেকে। সিদ্ধাচার্য্য বা মহাসিদ্ধযোগীশ্বর শান্তিগুপ্ত বা শান্তিগুপ্তপাদ ও আচার্য্য শান্তিগর্ভ, শান্তিপাদ বা রত্নাকরশান্তি থেকে অভিন্ন এ ইঙ্গিত ও তিব্বতীয় ঐতিহ্যে বিদ্যমান। শান্তিপাদ নামে একাধিক পণ্ডিতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় এই সব গ্রন্থকারদের এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে ধরে নেওয়াই সঙ্গত। এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে তিনি প্রায় চল্লিশখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। এক অতীশ দীপঙ্কর ছাড়া আর কোন বাঙ্গালী পণ্ডিতের রচনা এত সমৃদ্ধ ছিল বলে জানা নাই। প্রাচীন বাংলা ভাষায় দুইটী চর্য্যাপদ আর সংস্কৃতে দুই একটী সাধন ছাড়া তাঁর রচিত মূল গ্রন্থগুলি এখন লুপ্ত। এই দিক্‌পাল বাঙ্গালী পণ্ডিতের জীবন ও কীর্তির ঠিক পরিচয় দিতে হলে গ্রন্থগুলির তিব্বতীয় অনুবাদগুলির অনুশীলন বাঙ্গালীর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

তেঙ্গুর গ্রন্থ-সংগ্রহ শান্তিপাদ বা রত্নাকর শান্তি "আচার্য্য", "মহাচার্য্য", "রাজাচার্য্য", "মহাপণ্ডিত", "পণ্ডিতচক্রবর্ত্তী", "আর্য্যমঞ্জুশ্রীসিদ্ধিজ্ঞান-সম্পন্ন" ও "কলিকাল-সর্ব্বজ্ঞ" এই সব উচ্চ উপাধিতে বিভূষিত। তাঁর গ্রন্থ তালিকা অনুশীলন করলে জানা যায় এসব উপাধি মোটেই নিরর্থক নয়। তাঁর মনীষা ও পাণ্ডিত্যের পরিমাপ সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমস্ত যান ও মতে তাঁর ছিল অসাধারণ অধিকার। বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান, প্রজ্ঞাপরিমিতাশাস্ত্র, গুহ্যসাধন-প্রণালী প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে তিনি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। বৌদ্ধ ন্যায় শাস্ত্রে তার অসীম ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত "অন্তর্ব্যাপ্তি" নামক গ্রন্থে। ছন্দঃশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পারদর্শিতার প্রকাশ তাঁর রচিত "ছন্দোরত্নাকরে"। প্রাচীন বাংলা ভাষার অন্যতম আদি কবিরূপে তিনি বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির সূত্রপাত করে গেছেন। মঞ্জুশ্রী ছিলেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জ্ঞানের দেবতা। সকল-শাস্ত্র-পারঙ্গম এই পণ্ডিতচক্রবর্ত্তী জ্ঞানের দেবতার নিকট হতে সিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন, হয়তো

এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায় তাঁর "আর্য্যমঞ্জুশ্রীসিদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন" এই উপাধিতে। "রাজাচার্য্য" উপাধি থেকে মনে হয় তিনি রাজগুরু ছিলেন—কেউ কেউ মনে করেন পাল সম্রাট প্রথম মহীপালদেবের তিনি গুরু ছিলেন। বাংলা দেশের আর এক মহামনীষি আচার্য্য অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন এই মহাপণ্ডিতের অন্যতম প্রিয়শিষ্য। গুরু আর শিষ্যের অনন্য-সাধারণ প্রতিভা ও কীর্ত্তিতে বাংলাদেশ চিরভাস্বর হ'য়ে থাকবে।

শান্তিপাদ বা রত্নাকরশান্তি বৌদ্ধবিহারে ভিক্ষু জীবন যাপন করলেও সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনে যে ঘনঘটা আসন্ন তা' তিনি উপলব্ধি করে ছিলেন। প্রিয় শিষ্য অতীশ দীপঙ্কর যখন তিব্বত-রাজের আমন্ত্রণে সেই তুষারধবল দেশে যাবার ব্যবস্থা করছিলেন আচার্য্য অনুমতি দিয়েছিলেন খুব অনিচ্ছার সঙ্গে। ঘোরতর বিপদের আশঙ্কায় তাঁর মন ছিল ভারাক্রান্ত। শুধু বৌদ্ধসংঘের নয়, সমস্ত দেশের অকল্যাণের আশঙ্কায় তিনি যে চিন্তিত হ'য়ে উঠেছিলেন তা' জানা যায় তাঁর তখনকার একটী উক্তি থেকে। তিনি ব'লেছিলেন—"চারদিকের অবস্থা দেখে মনে হয় ভারতবর্ষের দুর্দ্দিন ঘনিয়ে আসছে, অসংখ্য তুরুস্ক সৈন্য ভারতবর্ষে অভিযান ক'রছে।" সংসারত্যাগী ভিক্ষুর মানসে যে অমঙ্গলের আশঙ্কা প্রতিফলিত হ'য়ে তাঁকে কাতর ক'রে তুলেছিল দুঃখের বিষয় রাজা বা রাষ্ট্রকর্ণধারগণ সে বিপদ সম্বন্ধে ঠিকমত অবহিত হতে পারেননি। কিঞ্চিদধিক দেড়শো বছর পরে ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করল এই বিপদ। "কলিকালসর্ব্বজ্ঞ" এই পণ্ডিত-চক্রবর্ত্তীর রাজনৈতিক দিব্যদৃষ্টি তখনকার রাষ্ট্রকর্ণধারগণের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে ইতিহাসের গতি অন্যরকম হওয়া হয়তো অসম্ভব ছিলনা।

চন্দ্রকেতুগড়ে মৌর্য-গুপ্ত যুগের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার

কলিকাতা হইতে মাত্র ২৩ মাইল দূরে চব্বিশ পরগণা জেলা বেড়াচাপার নিকট চন্দ্রকেতুগড়ে খননের ফলে যে ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা মৌর্য ও গুপ্ত যুগের মাঝামাঝি কালের।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মের উদ্যোগে প্রধানতঃ চব্বিশপরগণা, মেদীনীপুর ও হাওড়া জেলায় সম্প্রতি যে ব্যাপক খনন কার্য চালান হইয়াছে তাহাতে জানা গিয়াছে যে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে গাঙ্গেয় নিম্ন বঙ্গে সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলে বহু সহর ও বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সত্য উদ্‌ঘাটনের ফলে প্রচলিত জনমত ও ইতিহাস যে অভ্রান্ত তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

গত দুই বৎসরে ছয়টি স্থানে খননকার্য পরিচালিত হয়। বর্তমান বৎসরে খননের ফলে চারিটি প্রাচীন স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থানগুলি কলিকাতার চারিধারে মালার আকারে অবস্থিত এবং কলিকাতা হইতে ৫০ মাইলের মধ্যে।

আশুতোষ মিউজিয়মের পক্ষ হইতে চন্দ্রকেতুগড় ১৯৪৮ সালে প্রথম এবং পরে ১৯৫০ সালে পরিদর্শন করা হয়। স্থানটিতে প্রায় দুই বর্গ মাইল ব্যাপিয়া প্রাচীন ভগ্নাবশেষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানা যায়। চারিদিকে উঁচু নীচু ঢিবির মধ্যে গড়ের চিহ্ন পাওয়া যায়—এখনও কোথাও কোথাও গড়ের দেয়াল প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু।

চন্দ্রকেতুগড়ে খননের ফলে যে সমস্ত দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে ভারতে সর্বপ্রথম প্রচলিত একশতটি রৌপ্য মুদ্রা, খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রচলিত ব্রাহ্মী লিপিতে ক্ষোদাই করা কয়েকটি পোড়ামাটির মোহর, কাল পালিশ করা মৃতপাত্রের

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, কলিকাতা।

টুক্‌রা, গ্রীক ভাস্কর্য্যের প্রভাবে গড়া পোড়ামাটির মূর্তি, কুশান যুগের ছাপমারা বা ক্ষোদাইকরা মৃতপাত্র, মৌর্য যুগের কয়েকটি এবং সুঙ্গ ও কুশান যুগের পোড়ামাটির অসংখ্য সুন্দর মূর্তি, হাতী, টানা রথ, ভেড়া, ঘোড়া প্রভৃতি খেলনা, সুঙ্গ যুগের নানা ধরণের মিথুন মূর্তি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া গুপ্তযুগের একটি দুষ্প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা বাংলাদেশে এই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুদ্রাটিতে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সহিত কুমার দেবীর বিবাহ দৃশ্য খোদিত হইয়াছে। এই মুদ্রা সমুদ্রগুপ্ত চালু করেন। পোড়ামাটির অপূর্ব সূর্য্য-রথটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা পশ্চিম ভারতের ভোজ গুহার ক্ষোদাইয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

সম্প্রতি একটি অদ্ভুত বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। লাল বালুপাথরে খোদাই করা ছোট্ট মূর্তিটি। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মথুরার শিল্পীগণ যে আসীন বুদ্ধমূর্তি তৈরি করিতেন এই মূর্তিটি হুবহু সেই রকম—কাজেই সেই যুগেরই হইবে।

তারপর ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পাটনা, হস্তিনাপুর ও তমলুকে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মৌর্য যুগে তৈরি যে নরনারীর মূর্তি আবিষ্কার করিয়াছেন ঠিক সেই রকম একটি পোড়ামাটিতে তৈরি নারীমূর্তির মস্তক পাওয়া গিয়াছে। মস্তকের চারিধারে অদ্ভুত কতগুলি বস্তু আছে—এগুলি প্যারির অতি আধুনিকা বিলাসিনীর মনে ঈর্ষা জাগাইতে পারে। এই দ্রব্যগুলির অপূর্ব কলা সৌন্দর্য্য ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রাচীন লিপি ও চিত্র সমন্বিত অসংখ্য মোহরগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। ইহাদের পঠোদ্ধার করা যাইলে খৃষ্ট যুগ সুরু হইবার পূর্ব্বে ও পরে গঙ্গার শাখানদী বিদ্যাধরীর ধারে ধারে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল সে সম্বন্ধে কিছু হদিস পাওয়া যাইবে।

গত মার্চ মাসে (১৯৫৭) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল চব্বিশ পরগণায় চন্দ্রকেতুগড়ে দুই সপ্তাহ ধরিয়া পরীক্ষামূলক খনন কার্য চালায়। এই খননের ফলে মৌর্য-সুঙ্গ যুগ হইতে গুপ্তোত্তর যুগ পর্যন্ত জনবসতির বিভিন্ন পর্যায়ের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বিশেষ ধরণের লাল মৃতপাত্রের অস্তিত্ব এমন কি মৌর্যপূর্ব যুগেরও সূচনা করে।

প্রথম যুগের জনবসতির নিদর্শন স্বরূপ কাদার ভিতের উপর কাঠ, বাঁশ, টালি ও কাদার দেওয়াল বিশিষ্ট কাঁচা বাড়ী পাওয়া গিয়াছে।

অতীতে আগুণ লাগিয়া এই বাড়ীগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।

বেশ কিছু পরে ইটের বাড়ী তৈরি হইয়াছিল এবং দুই সারি ইটের তৈরি শানের মেঝের ভগ্নাংশ খননের সময় পাওয়া গিয়াছে।

অতীতে যে মাটির নল ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। নলগুলি লম্বায় ২ফুট ৭ ইঞ্চি এবং চওড়া দিকের ব্যাস ৮ ইঞ্চি ও সরু দিকের ব্যাস ৫ ইঞ্চি। মাটি থেকে ১৩ ফুট নীচে এই নলগুলি খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। এই নলগুলি নিঃসন্দেহে মৌর্য যুগের। কারণ মৌর্য পূর্ব যুগে উত্তর ভারতে ব্যবহৃত কাল পালিস করা ধাতব শব্দ বিশিষ্ট চকচকে খোলামকুচিও এখানে পাওয়া গিয়াছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য দ্রব্য হইল পূর্ব হইতে পশ্চিমে ঢালু একটি কংক্রীটের দেওয়াল। মাটির ৮-৯ ফুট নীচে ইহা পাওয়া গিয়াছে। যোয়ারের সময় জলোচ্ছ্বাস বা বন্যা রোধের জন্য প্রাচীন অধিবাসিগণ সম্ভবতঃ ইহা তৈরি করিয়াছিলেন। পরে মানুষ ও প্রকৃতির হাত হইতে সহর রক্ষার জন্য কাদার বিরাট প্রাচীর গড়া হইয়াছিল।

ছোটখাট জিনিষের মধ্যে কতকগুলি জীর্ণ তাম্রমুদ্রা, নানা আকারের পোড়ামাটির দ্রব্য, মকরমূর্তি, চাকা, তারকা, সূর্য্য ও পদ্ম-খচিত কাল পালিস করা খোলামকুচি, গৃহস্থালীর নানা বাসনপত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাধরী নদীর তীরে অবস্থিত চন্দ্রকেতুগড়ে আবিস্কৃত ভগ্নাবশেষ এক সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক বন্দরের অস্তিত্বের নিদর্শন। একদিন এই বন্দর তাম্রলিপ্তের সহিত পাল্লা দিত।

মিউজিয়মের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত খনন কার্যের ফলে বিদ্যাধরী যে এককালে একটি বিশিষ্ট বাণিজ্যপথ ছিল এবং ইহার ধারে ধারে সমৃদ্ধ নগর ও বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এক সিপাহীর আত্মকথা

শোভন বসু

(পূর্বানুবৃত্তি)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জেনারেল অক্টারলোনি সাহেব তখন দিল্লীর গভর্ণর। তিনি সৈন্য সমাবেশ করতে হুকুম দিলেন। আমাদের রেজিমেণ্টের আগ্রা যাওয়ার আদেশ হল। চার পাঁচবার কুচ করে যাওয়ার পরেই মীরাটে আবার আমাদের ডেকে পাঠান হয়। এতে অফিসাররা খুব নিরাশ হয়েছিলেন। নতুন রেজিমেণ্টের কাজ দেখিয়ে প্রশংসা লাভ করার বাসনা ছিল তাঁদের।

এক মাস পরে আবার হুকুম জারি হল এবং আমরা আগ্রায় কুচ করে গেলাম। সেখানে তখন একটি বড় পল্টন ছাউনি করে ছিল। এখানে আমরা কিছুদিন ছিলাম। কেউ কেউ ভেবেছিল যে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজ আসছে শুনে দুর্জন সিং বিনা যুদ্ধে কেল্লা ছেড়ে দেবেন। একদিন তিনি এমন অভিপ্রায় জানিয়ে দূত পাঠালেন; কিন্তু আবার পরের দিনই বলে পাঠালেন যে তিনি যুদ্ধ করবেন। এ সবই আসলে কালহরণ ও আরও সৈন্য ও অস্ত্র সংগ্রহ করার ফন্দি। এর আগে লর্ড লেকের সময় ইংরাজরা একবার ভরতপুর অবরোধ করেছিল। সে সময় তাদের প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য মারা যায়। কেল্লাটি জয় করা হয়েছিল বটে কিন্তু অধিকার করা হয়নি। সিপাহীরা এ সবই জানত। এখন কেল্লাটি আরও সুরক্ষিত। শোনা গেল যে শত্রুপক্ষের অনেকগুলি বড় কামান আছে—তা থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে গোলা ছোঁড়া যায়। এই কামানের উপরেই ভরতপুরের লোকের যত ভরসা। কেল্লাটি দুর্ভেদ্য বলেই তাদের ধারণা ছিল।

এই সব বৃথা আলোচনায় বিরক্ত হয়ে ইংরাজ লাটসাহেব আগ্রা থেকে সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং অনেকগুলি বড় কামান নিয়ে কেল্লাটি অবরোধ করলেন। শত্রুপক্ষের সওয়াররা আমাদের ভীষণ বিব্রত করে তুলল। আমাদের তাঁবুর চারপাশে তারা ঘুরে বেড়াত এবং আমাদের অনেক লোককে তারা হত্যা করেছিল। সরকারের সওয়াররা তাদের পিছু নিলে তারা বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে কেল্লার ভিতর ঢুকে পড়ত কিম্বা অন্য কোন পথে যে পালিয়ে যেত সে কেবল তারাই জানে। আমাদের কামানের গোলায় কেল্লার কোন ক্ষতি হল না; কেল্লার প্রাচীর ছিল খুব চওড়া—একটি 'কোম্পানী' সিপাহী তার উপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত।

শত্রুরা রাত্রে বহুবার আমাদের তাঁবুর উপর আক্রমণ করে। প্রতিবেশী রাজ্যগুলি সব সরকারের অবস্থা কি দাঁড়ায় আগ্রহে লক্ষ্য করছিল। প্রতিকূল কিছু ঘটলেই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। তাঁবুর কাছেই গভীর জঙ্গল; সেখানে পাহারা দেওয়া খুব কষ্টসাধ্য।

'স্যাপার' (sapper) এবং 'মাইনার'রা (miner) প্রাচীরের নীচে মাইন বসাতে লাগল। একটি মাইনের মুখে একরাত্রে পাহারা দিচ্ছি; প্রায় মাঝরাত্রে শাস্ত্রী এসে জানাল যে মাঠে জল আসছে; বড় খাত থেকে শত্রুরা জল ছেড়ে দিয়েছে। আমি যদি ঠিক সময়ে সাবধান করে না দিতাম তাহলে মাইনাররা সব দমবন্ধ হয়ে মারা পড়ত—বর্ষাকালে ইঁদুর যেমনভাবে মরে। স্যাপাররা তাড়াতাড়ি ছোট মাটির দেয়াল তুলে মাইনের মুখ থেকে জলের স্রোত ঘুরিয়ে দিল। যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিনে এই সব ঘটেছিল।

এর কয়েক সপ্তাহ পরে মঞ্চটিকে কেল্লার বুরুজের নীচে আনা হয়। এইবার মাইনে আগুন ধরান হবে। কি হয় দেখবার জন্যে সিপাহীরা সব ছুটে এল। তাদের আক্রমণ করা হবে মনে করে শত্রুরা সব প্রাচীরের উপরে এসে দাঁড়াল। যে বুরুজের নীচে মাইন বসান হয়েছে তার উপরে একটি খুব বড় কামান থেকে গোলা ছোঁড়বার জন্যে তারা প্রস্তুত হল। আমাদের তাঁবুতে কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। কিন্তু মাইনটি ফাটল না। স্যাপার অফিসাররা খুব ভেবে পড়লেন। তারা ভেবেছিলেন শত্রুরাও হয়ত একটি মাইন বসিয়েছে। কয়েকজন ছুটে দেখতে গেলেন আগুন ধরেছে কিনা। ঠিক এই সময়ে মাইনটি ফাটল এবং বুরুজ, বড় কামান, সিপাহী সব কেল্লার পাশের খাদে পড়ে গেল। কেল্লার প্রাচীরে একটি বড় গর্ত হয়ে গেল; তার মধ্য দিয়ে একটি 'কোম্পানী' সিপাহী অনায়াসেই ভিতরে যেতে পারে। ভয়ে বিহ্বল হয়ে শত্রুরা কিছুক্ষণ কামান ছোঁড়া বন্ধ রাখল। সারা রাত ঐ ভাঙ্গা প্রাচীর লক্ষ্য করে আমাদের সৈন্যরা গোলা বর্ষণ করে চলল।

আমাদের কোম্পানী ও রেজিমেণ্টের আরও কিছু সিপাহী নিয়ে পরের দিন সকালে কেল্লা আক্রমণ করার জন্যে একটি দল গঠন করা হয়। দুর্জন সিংএর সৈন্যরা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। কিন্তু ইউরোপীয়দের আক্রমণের সামনে কে দাঁড়াবে? সকাল দশটার পর ভরতপুরের প্রসিদ্ধ কেল্লা সরকারের অধিকারে এল। পালিয়ে যাবার সময় দুর্জন সিং নিজেও ধরা পড়লেন।

এরপর কেল্লার মধ্যে ভীষণ লুটপাট সুরু হয়। অনেক সাহেব বহু দামী জিনিসপত্র পেয়েছিলেন। এক নিহত স্ত্রীলোকের গলায় আমি একটি সুন্দর হার লক্ষ্য করেছিলাম। এই হারটি আমি নিয়েছিলাম; ভেবেছিলাম এটি আমার ছেলেকে পরাব। কিন্তু দুজন ইউরোপীয়ান হারটি নেবার সময় আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন। তারা জোর করে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে হারটি দুভাগ করে ফেললেন এবং

প্রত্যেকে একটি অংশ নিলেন। পরে এদের একজনকে মদে চুর অবস্থায় দেখি এবং কোন রকম জোর না করেই তার কাছ থেকে একটি অংশ উদ্ধার করি।

আমাদের কামানের গোলার আঘাতে অনেক শত্রু সৈন্য এবং সহরের অনেক লোক মারা গিয়েছিল। মাইনের বিস্ফোরণেও অনেক লোক ধ্বংস হয়েছিল। সেই জায়গাটি আমি দেখতে গিয়েছিলাম। নীচের খাদে কামানটি পড়ে আছে। তার ভারে অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছে—জগন্নাথের রথের চাপে যেমন মানুষ মারা যায়। নিজেদের কামানের চাপেই এরা মারা গেছে; এর চেয়ে কাম্য মৃত্যু আর কি হতে পারে? এই কামানটির নাম ছিল "Futteh-jung sir-phorunhar"। এটি প্রায় তিনটি বন্দুকের মত লম্বা; গোলার আকার এক একটি ঘড়ার মত। কামানের গায়ে লেখা ছিল যে ৭৫ সের বারুদ দিয়ে এর গোলা তৈরী করতে হবে। সাহেবদের মুখে বিলাতের নতুন বড় বড় কামানের গল্প শুনেছি। ভরতপুরে চার পাঁচটি এমন বড় কামান দেখেছি আমার ত মনে হয় না বিলাতের কামানগুলি তার চেয়ে বড় হবে।

এই কেল্লাটি সম্বন্ধে এত কথা শোনা গিয়েছিল বটে কিন্তু তা জয় করতে আমাদের বেশী লোকক্ষয় হয়নি। পঞ্চাশজনের বেশী সিপাহী মারা যায়নি এবং আমাদের রেজিমেণ্টের সৈন্য নিয়ে যে আক্রমণকারী দলটি তৈরী হয়েছিল তার মধ্যে পাঁচজন নিহত ও পনেরজন আহত হয়েছিল। ইউরোপীয়দের মধ্যেও প্রায় সেই রকমই লোক মারা গিয়েছিল। নিজেদের ছোট কামান ও বন্দুক নিয়ে কেল্লার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যেই অনেক সাহেব আঘাত পেয়েছিলেন। এভাবে আক্রমণ করা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল; তারা এ আদেশ মানেননি।

অবরোধের পর রেজিমেণ্টের সিপাহীদের ঐ অঞ্চলে কয়েকটি ছোট দুর্গ রক্ষার জন্য পাঠান হয়। আমাদের কোম্পানীকে Biana Ghuree নামে একটি জায়গায় যাওয়ার হুকুম হল। শীঘ্রই এই সব জায়গার প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা হয়। প্রায় এক বছর বাইরে থাকার পর সিপাহীরা আবার মীরাটে ফিরে এল।

এই সময় ভারতে একজন নতুন লাটসাহেব এলেন। অন্যান্য অফিসাররা তাঁকে একেবারে পছন্দ করতেন না। তিনি তাঁদের মাইনে কমিয়ে দিতে চেয়েছিলেন; সাহেবরা তাতে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। নিজেদের মধ্যে তাঁরা অনেক পরামর্শ করলেন; কারুরই মনে শান্তি নেই। অনেকেই স্থির করলেন যে তারা কোম্পানী বাহাদুরের চাকুরী আর করবেন না। যুদ্ধে বেশী খরচ হওয়ায় কোম্পানী বাহাদুরের অবস্থা নাকি খারাপ হয়ে পড়েছে। খরচ কমানর জন্যেই কোম্পানী এই লাটসাহেবকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এ কথায় কে বিশ্বাস করবে?

সরকারী কোম্পানীর কি কখনও টাকার অভাব হয়েছে? রেজিমেণ্টের অফিসাররা পরস্পর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন লাটসাহেবের কাছে নিজেদের হক

আদায় করার জন্যে যদি তারা সসৈন্যে কলকাতা কুচ করে যান তাহলে একে অপরকে সাহায্য করবেন কিনা। আরও শুনলাম গোরা সিপাহীরা নাকি বলেছে যে যতক্ষণ উভয়ের লক্ষ্য এক থাকবে তারা দেশী সেনাদলের অফিসারদের বিরুদ্ধাচারণ করবে না। এই সময় সাহেবরা প্রত্যেকেই খুব উত্তেজিত হয়ে সরকারের বিপক্ষে অনেক কথা বলতেন; নতুন লাটসাহেবের উপরেই বেশী দোষারোপ করা হত। তাদের ধারণা লাটসাহেব কোম্পানীর বিনা হুকুমে এই সব অন্যায় কাজ করছেন; তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য কোম্পানীর অনুগ্রহ লাভ করা।

মহারাজা বলবন্ত সিং সরকারের সাহায্যে সিংহাসন লাভ করেছেন। সরকার তাঁকে যুদ্ধের সমস্ত খরচ দিতে বাধ্য করলেন। টাকার পরিমাণ এক কোটিরও বেশী। এতে অনেক রাজা ও নবাব অপমানিত বোধ করেন। তাঁরা সরকারকে এতদিন তাঁদের বন্ধু—অর্থ লোভী মিত্র নয়—বলেই মনে করতেন। কেউ কেউ এখন দম্ভ করে বলতে লাগলেন দরকার হলেই তাঁরা ইংরাজদের ভাড়া করতে পারেন। শুনলাম এক রাজা অপর একজনকে অপমান করেছেন; অপমানিত রাজা সরকারের কাছে লোক পাঠিয়ে জানতে চেয়েছেন কত টাকা পেলে তারা তার শত্রুকে জব্দ করতে পারে। এ সবই গালগল্প; সত্যি নাও হতে পারে।

সত্যি মিথ্যে নানা রকম গল্প বড় বড় ছাউনিতে শোনা যেতে লাগল। সরকারের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কাহিনী লোকে খুব আগ্রহে শুনত। কুঁড়ে লোকেরা—যাদের আর কোন কাজ নেই—আবার নানা রকম খবর নিজেরাই বানাত। মিথ্যের ভাগ যত বেশী থাকবে অর্থাৎ যদি কোন রকমে সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয় তাহলে লোকে তা বেশী বিশ্বাস করত। মনে আছে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের সময়—যখন ভারতের আর কোথাও কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল না—এই রকম মিথ্যে খবর রটান হয় যে সরকারের সেনারা পরাজিত হচ্ছে; রুশেরা সব ইংরাজ সেনাদের ধ্বংস করেছে এবং তাদের সব যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। স্বার্থান্বেষী লোকেরা এই সব খবর জিইয়ে রাখত। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এ দেশের সাধারণ লোকের ধারণা ছিল যে ভারতে যা সৈন্য আছে এ ছাড়া সরকারের বুঝি আর সৈন্য নেই। কিন্তু দলে দলে রেজিমেণ্টের পর রেজিমেণ্ট সৈন্য আসতে দেখে তাদের চমক ভাঙ্গে। তারা হতাশ হয়ে পড়ে; বুঝতে পারে যে তাদের ঠকান হয়েছে এবং অমিত শক্তিশালী ইংরাজ রাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ান নিস্ফল।

ছ বছর মীরাটে থাকার পর আমাদের রেজিমেণ্টকে শাহাজাহানপুরে পাঠান হয়; সেখান থেকে কারনাল এবং পরে লুধিয়ানা। সিপাহীদের উর্দ্দির কিছু অদলবদল ও অনেকগুলি সেনাদলে রাইফেল বাহিনী গঠন ছাড়া এই সময় আর বিশেষ কিছু ঘটেনি। প্রতি বছরই হিন্দুস্থানের কোন না কোন জায়গায় যুদ্ধ লেগেই থাকত; আমাদের রেজিমেণ্টকে কিন্তু তাতে পাঠান হয়নি।

আমি এখন হাবিলদারের পদে নিযুক্ত হয়েছি। এই সঙ্গে পে-হাবিলদারের (Pay-Havildar) কাজও করতে হত। সে সময় এই পদের খুব মর্য্যাদা। কোম্পানীর প্রায় সব সিপাহী আমার কাছে তাদের টাকা গচ্ছিত রাখত। এক ছুটিতে বাড়ী যাওয়ার সময় ছাড়া তাদের টাকার তেমন দরকার হত না। একারণে এই টাকা বেশ চড়া সুদে ধার দিতে লাগলাম। টাকার বিষয়ে কারুর সন্দেহ হলে মাসের শেষে তাকে হিসাব দেখাতাম। মাসের পর মাস এই ভাবে চলল। এভাবে আমার হাতে প্রায় পাঁচশ টাকা জমে।

পে-হাবিলদাররা সাহেবদেরও টাকা ধার দিত। তাদের হাত দিয়েই সাহেবদের মাইনে হত—সেজন্য টাকা মারা যাবার তেমন ভয় ছিল না। অবশ্য কোন সাহেবের মৃত্যু হলে পাওনার কথা জানাবার সাহস আমাদের ছিলনা। এই ভাবে টাকা ধার দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু এর জন্য কেউ শাস্তি পেয়েছে বলে কখনও শুনিনি। অফিসাররা অনেক টাকা মাইনে পেলেও এতে তাদের অভাব মিটত না। অনেকেই টাকা ধার করেছিলেন, আমাদের রেজিমেণ্টের মাত্র দুজন অফিসারের কোন ধার ছিলনা। আয়ের বেশীর ভাগই তারা অপরকে খাওয়ানয় ব্যয় করতেন। কেউ কেউ জুয়া খেলতেন; কেউ বা রেসখেলায় অনেক টাকা ওড়াতেন, প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন রেসের প্রতি আসক্ত, বিবাহিত সাহেবরা সব সময়েই ঋণভার-পীড়িত—তাদের খরচ অনেক বেশী; ভাগ্যদোষে আবার কারুর বা অবস্থা তেমন ভাল ছিলনা।

নৌকাডুবি হয়ে আমাদের কোম্পানীর ক্যাপ্টেনের জিনিসপত্র সব নষ্ট হয়ে যায়। কিছু কেনার মত একটি পয়সাও তাঁর ছিল না। তাঁকে পাঁচশ টাকা ধার দিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে সামনেই সিপাহীদের ছুটি নেবার সময়; এবার তাদের টাকার দরকার। আমার নিজের সঙ্গে তাদেরও কিছু টাকা মিশিয়ে ধার দিয়েছিলাম। কাজেই আমার কাছে যা থাকা উচিত তাতে কম পড়ল। কর্ণেল সাহেবের কাছে আমার নামে নালিশ করা হয়। নিজের জিনিস সব বিক্রি করে দিলাম; ক্যাপ্টেন সাহেবও টাকা সংগ্রহ করতে সাধ্যমত চেষ্টা করলেন, তবুও একশ সাঁইত্রিশ টাকা কম পড়ল। আদেশ অমান্যের অপরাধে সামরিক আদালতের বিচারে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। শাস্তিস্বরূপ পে-হাবিলদারের চাকরিটি হারালাম। আমার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে আগের ভাল রিপোর্ট না থাকলে হয়ত আমাকে আবার সিপাহী হতে হত। এই প্রথম আমি আদালতে হাজির হলাম।

হিন্দুদের প্রতি সরকারের আইনকানুনের অর্থ কিছু বোঝা যায় না। আমার নিজের রেজিমেণ্টের কয়েকজন দেশী অফিসার আমাকে দোষী স্থির করলেন। কেউ একবার ভেবে দেখলেন না আমি যা করেছি তা সত্যিই অন্যায় কিনা। আমার অবস্থায় পড়লে তারা প্রত্যেকেই একাজ করতেন। তবুও তাঁদের মনে হয় কর্ণেল সাহেবের ইচ্ছে আমি যেন শাস্তি পাই; কাজেই তারা আমাকে দোষী সাব্যস্ত

করেন। ইউরোপীয় অফিসাররাও এ সব ভালভাবেই জানতেন; চাকুরির রীতিই নাকি এই রকম।

যুদ্ধের আইনকানুন প্রায়ই সিপাহীদের পড়ে শোনান হত। সবই ফার্সী বা আরবী ভাষায় লেখা; অল্প কয়েকজন তা বুঝতে পারত। কিছু কিছু অবশ্য বেশ সহজ; কিন্তু বেশীর ভাগই—যেমন বড়লাটের হুকুম ইত্যাদি লেখাপড়া জানা মানুষ ছাড়া সাধারণ লোকের বোধগম্য নয়। এই সব শুনে প্রতি কোম্পানীর মাত্র দু তিন জন সিপাহী কি করা উচিত বা অনুচিত বুঝতে পারত। তার উপর দোভাষী সাহেবরা খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যেতেন এবং তাদের উচ্চারণে প্রায়ই ভুল হত।

হুজুর, সিপাহীদের এত আইনকানুন পড়ে শোনার কোন দরকার নেই; এতে তাদের মনে কেবল ভয় ও সন্দেহ জাগে। এমন ভাবে সিপাহীদের শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তারা মনে করবে যে কম্যাণ্ডার সাহেবই যেন তাদের রক্ষাকর্তা বা প্রভু; সব সময় তাঁকেই যেন তারা মেনে চলে। পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া—এই নীতির তাৎপর্য্য আমরা বুঝি না; একচ্ছত্র ক্ষমতাতেই আমাদের বিশ্বাস। ইংরাজদের মধ্যে ক্ষমতা সব ভাগ করে দেওয়া থাকে। কম্যাণ্ডিং অফিসারের কিছু ক্ষমতা আছে; এ্যাডজুটেণ্ট সাহেবেরও হাতে কিছু ক্ষমতা (সময় সময় কম্যাণ্ডারের চেয়েও বেশী); কম্যাণ্ডার-ইন্-চিফের ক্ষমতা অনেক বেশী; আবার গভর্ণর জেনারেল আরও ক্ষমতাশালী। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের চেয়ে আরও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া কোন কাজ করেন না। কোন সিপাহীকে শাস্তি দেবার সময় কম্যাণ্ডিং অফিসারকে আরও ছজন অফিসারের মত নিতে হয়। কাজেই দণ্ডের আদেশ দিতে কয়েক মাস কেটে যায়। যখন সাজা দেওয়া হল তখন লোকে হয়ত অর্দ্ধেক ঘটনা ভুলে গেছে; ফলে সাজা দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। কোন পদস্থ অফিসারকে অবমাননার জন্য একবার সামরিক আদালতের বিচারে এক হাবিলদারের চাকুরি যায়; এর জন্য তাকে অবশ্য চাবুক মারা উচিত ছিল। প্যারেড মাঠে শাস্তি দেওয়ার কথা পড়ে শোনানর সময় সে ঘুরে দাঁড়িয়ে কম্যাণ্ডিং অফিসারকে বলল যে সে সরাসরি কম্যাণ্ডার-ইন্-চিফের কাছে গিয়ে পুনর্বিচারের প্রার্থনা করবে। আর একজন হাবিলদারকে তার জায়গায় বহাল করা হয়। সে সিমলায় গিয়ে লাটসাহেবের স্ত্রীর সামনে লুটিয়ে পড়ে তাঁর দয়া ভিক্ষা করল। তিনমাসের মধ্যেই আবার সে কাজে বহাল হল এবং জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার ও কম্যাণ্ডিং অফিসারের দণ্ডাদেশ উপহাস করে আবার পুরণো রেজিমেণ্টেই ফিরে এল। কোন সিপাহীই তখন কোর্ট-মার্শালকে গ্রাহ্য করত না। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন অবশ্য কম্যাণ্ডার-ইন্-চিফ নিজে সব অভিযোগ শুনতেন। কর্ণেল সাহেব খুব বিরক্ত হলেন। তাঁর হাতে কোন ক্ষমতা নেই; তিনি আর কি করবেন।

কম্যাণ্ডারের হাতেই দণ্ডমুণ্ডের ক্ষমতা থাকা উচিত। তিনশ ক্রোশ দূরে কারুর

হাতে যদি শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে তাহলে তাকে আর কে ভয় করবে? সিপাহীরা যদি দেখে যে কম্যাণ্ডারের আসলে কোন ক্ষমতা নেই তাহলে তারা সবসময় আরও ক্ষমতাশালী কোন মানুষের মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকবে। সিপাহী বিদ্রোহের এটি হল একটি কারণ। সিপাহীরা অফিসারদের আর ভয় করত না; তাদের ক্ষমতা কতটুকু তা তারা বেশ ভালভাবেই জানত। ধীরে ধীরে কেমনভাবে অফিসারদের ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়া হল তা ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে। প্রথম প্রথম সাহেবরা ছড়ি হাতে সিপাহীদের ড্রিল শেখাতেন; পরে তা নিষিদ্ধ হল। দরকার হলে কম্যাণ্ডিং অফিসাররা সিপাহীদের চাবুক মারতেন; পরে তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আগেই বলেছি যে ভারতের লোকেরা ক্ষমতার খুব ভক্ত। তারা জঁাক জমক এবং ঐশ্বর্য্য দেখাতে ভালবাসে। এতে সাধারণ লোকের মনে যে কি ভীষণ প্রভাব বিস্তার করা যায় তা ইংরাজরা ভাবতে পারবেনা। রাজা রাজড়ার ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা আমাদের দেশে সব সময়েই খুব জঁাক জমক করে দেখান হয়—সোনা রূপার কত ঝলমলানি। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের মনে তা গেঁথে দেওয়া হয়। আমাদের দেশে সব গল্পেই এই কথা বলা হয়েছে। কোন গভর্ণর জেনারেল বা লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের কথা যখন ভাবি বা যখন দেখি কোন সাহেব ঘোড়ার গাড়ীতে চলেছেন—অঙ্গে কালো পোযাক, কোন ভূষণ নেই এমন কি সঙ্গে কোন অনুচর নেই তখন আমাদের কি মনে হয়? সরকারী কর্মচারীদের হাতে অনেক ক্ষমতা—এ সবই সত্যি; কিন্তু সাধারণ লোকে ভাবত তা মিথ্যে; রাজা, নবাব এমন কি উজীরের তুলনায় তাদের কাছে এদের ক্ষমতা কিছু নয় বলে মনে হত। তারা এদের সঙ্গে তুলনা করে দেখত; সরকারের লোকেরা অবশ্য তা পছন্দ করতেন না।

অনেকবার সাহেবদের জিজ্ঞাসা করেছি তারা কেন মেমসাহেবদের মত নিজেরাও গহনা পরেন না। কয়েকজন ইংরাজ মহিলাকে সুসজ্জিত অবস্থায় দেখেছি—তারা তখন নাচে যোগ দিতে চলেছেন; ঠিক যেন রাণীর মত দেখতে। শুনেছি সম্মানসূচক গহনা ছাড়া অন্য গহনা পরা নাকি সাহেবদের কাছে লজ্জার বিষয়। যেগুলি পরেন তাও অতি সাধারণ। একজন সাহেব বলেছিলেন তাঁর স্ত্রী গহনার জন্য এত খরচ করেন যে ইচ্ছে থাকলেও তাঁর নিজের কিছু পরবার উপায় নেই।

মানুষের চরিত্র বল বা মনীষার সামনে আমরা কখন কখনও শ্রদ্ধায় মাথা নত করি বটে কিন্তু বাইরের জঁাক জমক ও জৌলুসকেই আমরা বেশী সম্মান করি। জেনারেল নিকলসন সাহেবকে অনেকে অবতার মনে করত; আজও অনেকে তাঁর মৃত্যুর জন্যে শোক প্রকাশ করে থাকে। পাহাড়ী লোকের কাছে জেনারেল জেকব সাহেব ছিলেন মহম্মদের পরেই সম্মানের পাত্র; শুনলাম তিনিও নাকি মারা গেছেন।

সরকারের মনে রাখা উচিত যে কম্যাণ্ডিং অফিসারের উপরেই রেজিমেণ্টের

গুণাগুণ সব নির্ভর করে। যদি সিপাহীরা তাঁকে ভালবাসে এবং যদি তিনি তাদের মনোভাব ভালভাবে বুঝতে পারেন, তাদের সুখদুঃখের সাথী হন, তাদের আস্থাভাজন হন—একদিন বা এক বছরে তা অবশ্য সম্ভব নয়—এবং সবচেয়ে বড় কথা যদি তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকে এবং যদি তিনি ন্যায় বিচার করেন তাহলে সিপাহীরা তাঁর জন্য সব কিছু করতে পারে। যেখানে যেতে বলা হবে সেখানেই যাবে; তাঁর ইচ্ছাই তখন তাদের কাছে আইন। কিন্তু যদি তিনি তাদের কাছে পরদেশীর মত থাকেন তাদের ইচ্ছা উপেক্ষা করে কেবল হুকুম জারি করেন তাহলে সব সময় অসন্তোষ দেখা দেবে। আমরা সব সময় নতুন কিছু পছন্দ করিনা। একজন সাহেব যা করেন অপরে এসে তা বাতিল করে দেন। আজ যা শিখলাম কাল যদি তা ভুল বলা হয় তাহলে কি করা উচিত বা অনুচিত আমরা বুঝতে পারিনা। একটি রেজিমেণ্টে এক বছরের মধ্যে চারজন কম্যাণ্ডিং অফিসার, তিনজন এ্যাডজুটেণ্ট এবং দুজন কোয়ার্টার মাস্টার বদলি হয়েছিলেন। যুদ্ধে কোন অফিসারের মৃত্যুর জন্য যে এমন হয়েছিল তা নয়। সাহেবদের মতিগতি বুঝতে অনেক সময় লাগে। যখন তাঁর সঙ্গে সিপাহীদের বেশ ভাল পরিচয় হয় সেই সময় তাকে বদলি করা ভাল নয়। বিদ্রোহের আগে প্রতি রেজিমেণ্ট থেকেই দক্ষ অফিসারদের অন্যত্র বদলি করা হয়। কয়েক বছর তিনি হয়ত আর ফিরে আসেননি; এবং যখন এলেন রেজিমেণ্টের লোকের কথা অতি অল্পই তাঁর মনে আছে।

এই দেশের লোকেরাই যে কেবল কম্যাণ্ডিং অফিসারদের পছন্দ বা অপছন্দ করত তা নয়; একবার একটি ইউরোপীয় রেজিমেণ্ট শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজী হয়নি। এর কারণ তারা তাদের কর্ণেলকে পছন্দ করত না। কামানের গোলার সামনে বরং দাঁড়াবে; তবুও তারা এক পা নড়বে না। শুনেছি এই অফিসারটি পরে আহত হয়েছিলেন—কেউ বলল নিজের দলের লোকেই তাকে আঘাত করেছিল। এর পর যে অফিসার এলেন তাকে সবাই পছন্দ করত; সিপাহীরা তখন কামান নিয়ে যুদ্ধে চলল এবং অনায়াসেই খালসা সৈন্যদের হটিয়ে দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এবার, হুজুর, আমি মিউটিনির পর সরকার যে নতুন সেনাদল তৈরি করেছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু বলব। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পাঠান, ডোগরা—প্রত্যেকেই এখন আর পল্টনের কাজ পছন্দ করে না। তাদের কাজে কোন ছুটি নেই; কি কাজ করতে হবে তাই তারা জানে না, এক বছর ধরে তাদের এক ধরণের ড্রিল শেখান হল; আবার পরের বছরেই অন্য ধরণের ড্রিল এবং নতুন ড্রিল ভুলে গেলে তাদের

শাস্তি দেওয়া হয়। চাকুরিতে এখন তাদের পরীক্ষা দিতে হয় এবং তার ফলাফলের উপরেই পদোন্নতি নির্ভর করে। অর্থাৎ এখন কম্যাণ্ডিং অফিসার যা করবেন তাই হবে; চাকুরিতে উন্নতির জন্য এমন ব্যবস্থা খুবই বিপজ্জনক। সরকারের চাকুরিতে ঢুকলে লুট করার সুযোগ পাওয়া যাবে—কেবলমাত্র এই কথা মনে করেই পাঞ্জাবী ও শিখেরা পল্টনে যোগ দিয়েছিল; কাজ পেয়ে তারা যে খুব সন্তুষ্ট তা নয়; রুজি রোজগার বা পেনসনের দিকেও তাদের লক্ষ্য ছিল না। কোম্পানী বাহাদুরকে আমরা যেমন শ্রদ্ধা করি তেমন শ্রদ্ধা তাদের মনে ছিল না। এই সময় যদি দিল্লীর পতন না হত তাহলে এত পাঠান এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য লোকেরা সরকারের চাকুরিতে ঢুকত কিনা সন্দেহ। এই সব সিপাহীরা সব সময় পিছনে দাঁড়িয়ে থাকত; লক্ষ্য রাখত কোন দল যুদ্ধে জিতছে। তারা চাইত পাঞ্জাবে যেন সব সময় গোলমাল বেঁধে থাকে; লুটের বাসনায় যে আগ্রহে তারা সরকারের চাকুরি নিয়েছে ঠিক সেই আগ্রহেই তারা আবার সরকারের বিপক্ষে দাঁড়াবে। এই রেজিমেণ্টের অর্দ্ধেকেরও বেশী লোক কাজ ছেড়ে দিতে চাইল। চীন বা অন্য কোথাও লুটপাটের সুযোগ পাওয়া যাবে এই মনে করে বাকী সবাই থেকে গেল। কিন্তু সরকারের পরম সৌভাগ্য এই যে যুদ্ধের আর কোন সম্ভাবনা তখন ছিল না। মনে হল অদূর ভবিষ্যতেও এই শান্তি বজায় থাকবে। কাজেই এদের অনেকে কাজ ছেড়ে দিতে চাইবে এবং বাধা দিলে অনিচ্ছার সঙ্গে কাজ করবে।

সব সময়েই একদল যুবক সেনাদলে নাম লেখাতে আসে; কিন্তু নতুনত্বের মোহ শীঘ্রই কেটে যায়। তারা তখন কাজ ছেড়ে দিতে চায়—এ আর তাদের ভাল লাগে না। তবুও অফিসারদের অকারণ কষ্ট করে তাদের ড্রিল শেখাতে হবে। পাঞ্জাবে শিখেরা যে পল্টনে আসে তার একটি কারণ হল চাকুরিতে ঢুকেও নিজেদের বাড়ীর কাছে থাকা যায়; তারা কিন্তু অন্য দেশে যেতে চায় না, মাইনে সম্বন্ধে তাদের খুব দুশ্চিন্তা। সওয়ারদের মাইনে অনেক বেড়েছে; কিন্তু পদাতিক বাহিনীর অবস্থা একই রকম আছে। সারা হিন্দুস্থানেই এখন জিনিসপত্রের দাম খুব বেড়েছে। বেনিয়ারা যা-খুশী করছে; সরকার তাদের কিছুই বলেন না। সাত টাকা মাস মাইনেয় পাঞ্জাবী, শিখ বা মুসলমান—কারুরই দিন চলে না। মুসলমানেরা সব সময় ভাবত যে তারা ফিরিঙ্গীদের কাছ থেকে হিন্দুস্থান পুনরুদ্ধার করবে এবং সেইদিন শীঘ্রই আসছে। আমি জীবনে যা দেখেছি তা তারা কিছুই দেখেনি; নইলে এমন মূর্খের মত ভাবত না। তারা একদিন যা করেছে বা পরে করবে তার জন্য সব সময় বড়াই করত। একটু ভেবে দেখলেই কিন্তু বুঝতে পারত এই রকম আশা করা কত ভুল। কারণ সরকারের সমস্ত সিপাহী ও কামান যদি তাদের অধীনে থাকত তাহলেও চার পাঁচটি গোরা রেজিমেণ্ট ও কয়েকটি পাঞ্জাবী পল্টনের হাত থেকে দিল্লী জয় করা সম্ভব ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের পর পাঞ্জাবী

সিপাহীদের সঙ্গে কিছুদিন ছিলাম। তারা কি ভাবত সেই কথাই এতক্ষণ বললাম।

আমার ধারণা পাঞ্জাবীরা বিদ্রোহী হয়ে সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাহলে প্রায় এক লক্ষ হিন্দুস্থানী—কেবলমাত্র তাদের বকেয়া মাইনে শোধ করা হলেই—সানন্দে তাদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষে যোগ দেবে।

সরকারের আর একটি নীতি তেমন যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না; তা হল একই ছাউনিতে কয়েক রেজিমেণ্ট দেশী সিপাহীদের একসঙ্গে রেখে দেওয়া। এইভাবে থাকার ফলে জোয়ান সিপাহীরা বেশ অহংকারী হয়ে ওঠে; বাজারে নানারকম মিথ্যের বড়াই করে; যা তারা নিজেরা জানে না তা ফলাও করে বলে বেড়ায়; অন্নদাতা প্রভুর কথা তাদের আর মনে থাকে না।

প্রত্যেক সহরে এবং বিশেষ করে সদর বাজারে সব সময়েই একদল বদমাইস লোক থাকে; তারা মানুষকে সব সময় অসৎ কাজে প্ররোচিত করে। বিদ্রোহের পর এই অভ্যাস খুব বেড়ে গেছে। বিদ্রোহের আগে এসব কথা তেমন শোনাই যেত না; এখন হিন্দুস্থানের সর্বত্রই এই এক বিপদ। সম সময়েই এই মতলববাজ লোকেরা অপরের কানে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। বাজারের এই নিমকহারামদের নিজেদের ক্ষতি হবার মত কিছু নেই; তারা ভাবত দেশে একটা গোলযোগ দেখা দিলেই সেই সুযোগে তারা নিজেরা বেশ কিছু গুছিয়ে নিতে পারবে। বিদ্রোহের সময় ঠিক এই রকমই ঘটেছিল। মীরাট, কানপুর এবং আরও কয়েকটি সহরে এমন লোক অনেক আছে। এই ঘৃণ্য কাজের জন্য তাদের কোন শাস্তি হয় না; তারা বরং এ নিয়ে বড়াই করে থাকে, প্রত্যেক রেজিমেণ্টেই কিছু না কিছু খারাপ লোক থাকবেই; অল্পবয়স্ক সিপাহীরা যাতে তাদের দলে না মেশে তার জন্য ভালরকম ব্যবস্থা করা দরকার।

কয়েক বছর আমাদের রেজিমেণ্টে তেমন বিশেষ কিছু ঘটেনি; আমার ছেলে এখন নওজোয়ান; তাকে সেনাদলে ভর্তি করে দিয়েছি।

১৮৩৭ সালে ভারতের সর্বত্রই শোনা গেল যে সরকার কাবুলের আমীর সুজা-উল-মুলুককে তাঁর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করবেন। সারা দেশে ভীষণ উত্তেজনা; প্রতিদিনই নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়ছে। কেউ কেউ বলল আফগানিস্থানে রুশদের সঙ্গে সরকারের যুদ্ধ হবে; রুশেরা আফগানদের প্রিয় আমীর দোস্ত মুহম্মদ খানকে সাহায্য করতে রাজী হয়েছে। রুশ ও পারস্যের সেনাদের সাহায্যে আফগানরা ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। সিন্ধু নদ পার হয়ে যেতে হবে এই ভেবে সিপাহীদের খুব ভয় হল। অনেকেই বলল সরকারের হার হবে। আবার কেউ কেউ বলল পদচ্যুত আমীরের পক্ষে কাবুলে একটি বড় দল আছে; কাজেই ইংরাজরা কাবুল অধিকার করবে। সিন্ধু নদ পেরিয়ে হিন্দুস্থানের বাইরে যেতেই সিপাহীদের যত ভয়। আমাদের ধর্মে এ কাজ নিষিদ্ধ; এ করলেই

জাত হারাতে হয়। ফলে অনেক সিপাহী চাকরি ছেড়ে দিল; অনেকে আবার দল ছেড়ে পালিয়ে গেল। মুসলমানেরা বলাবলি করতে লাগল একটি বিরাট সেনাদল ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসছে; সাধ্যমত সকল উপায়ে তারা মানুষকে উত্তেজিত করতে লাগল। তারা বলল যে এই আক্রমণকারী সেনার পিছনে একটি বিরাট রুশ সেনাদল আছে। গিরিপথের এপাশে সমতল দেশে আসামাত্রই সমস্ত মুসলমানেরা সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং ভারত থেকে ফিরিঙ্গীদের তাড়িয়ে দেবে। লোকে এই সব কথায় ক্রমেই বিশ্বাস করতে লাগল; এবং দেশী সিপাহীদের সবারই মনে ভয় হল। শোনা গেল রুশদের দলে লক্ষ লক্ষ সৈন্য; প্রচুর সম্পদ; এই সৈন্যদের আকৃতিও বিশাল এবং তারা সিংহের মত সাহসী। কাজেই এইবার নিশ্চয়ই সরকারী রাজত্বের শেষ হবে; বার চোদ্দটি ইউরোপীয় রেজিমেণ্ট নিয়ে কি আর এমন শত্রুর বিপক্ষে দাঁড়ান যায়? ভারতে তখন এর চেয়ে বেশী সৈন্য আর ছিল না।

কেউ কেউ তখনও বিশ্বাস করত যে সরকার ভাগ্যবলে সব বাধা অতিক্রম করবে। কিন্তু এক বিরাট শক্তিশালী বাহিনী ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসছে শুনে তারাও ভয় পেল। যাই হোক এ সত্বেও সৈন্যরা এগিয়ে যেতে লাগল। ফিরোজপুরে সৈন্য সমাবেশ করা হল। ১৮৩৮ সালের অক্টোবর মাসে আমাদের দলটি এখানে ছাউনি করে রইল। এক লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। শাহ সুজার নিজেরও একদল সৈন্য ছিল; তিনি তাদের মাইনে নিতেন; কিন্তু ইংরাজ অফিসাররা তাদের চালনা করতেন। যুদ্ধে ভাগ্যান্বেষী সকল শ্রেণীর ভারতবাসীকে নিয়েই এই দলটি তৈরী হয়েছিল।

এই সেনাদলে আমাকে বেশী মাইনেয় হাবিলদারের পদ দেবার কথা হয়। কোর্ট মার্শালে অভিযুক্ত হওয়ায় নিজের রেজিমেণ্টে আমার উন্নতির কোন আশা নেই; কাজেই এরই এক রেজিমেণ্টে যোগ দিলাম। সে সময় শুনেছিলাম কোম্পানী বাহাদুর এই সেনাদলের মাইনে দিয়ে থাকেন। পরে দেখেছি সিংহাসন লাভের পরেও শাহ তাঁর নিজের রক্ষীদেরই মাইনে দিতে পারেননি। গোলন্দাজ, সওয়ার ও পদাতিক সেনা নিয়ে এই দলটি তৈরী; একে শাহ সুজার দল বলে উল্লেখ করা হত। কোম্পানীর আসল সৈন্য বলতে একটি দুর্বল ইউরোপীয় রেজিমেণ্ট বোঝাত; তারা আমাদের সঙ্গে কাবুল গিয়েছিল। সিপাহীদের রেজিমেণ্টে Burdwan, Castor, Grand এবং আরও দুটি দল ছিল।

কাবুলে যাওয়ার সবচেয়ে সোজা রাস্তা পাঞ্জাবের ভিতর দিয়ে। মহারাজা রণজিৎ সিং তখন সেখানকার রাজা। তিনি সরকারের একজন প্রধান মিত্র। আমার বিশ্বাস তিনি সরকারী সেনাদলকে তাঁর রাজ্যের ভিতর দিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি লাট ফেন সাহেবকে (Fane) বলেন যে

আমাদের দলে সিপাহী খুব কম; পাঞ্জাবের উত্তর অঞ্চলে মহারাজার নিজের সৈন্যদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ বাধতে পারে; ঐ সব সেনারা তাঁর তেমন বশে ছিল না। সেজন্য আমাদের উপর হুকুম হল সরাসরি সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত কুচ করে গিয়ে বোলান গিরিপথ দিয়ে আফগানিস্থানে যেতে হবে।

বড় বড় নদীর ধার দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি; পাশে ঘন জঙ্গল; অতি খারাপ দেশ; লোকজন সব বন্য ধরণের। দুমাস কুচ করার পর সিন্ধুনদের তীরে রুরি নামে একটি জায়গায় পৌঁছলাম; এর মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক লোক জ্বরে ভুগেছে। অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের পর একটি নৌকার পুল তৈরী করা হয়; এই প্রথম হিন্দুস্থানী সিপাহীরা সিন্ধুনদ পার হয়ে অন্যদেশে উপস্থিত হল। নদীর ওপারের অবস্থা এদেশেরই মত। লোকজনও সব একই ধরণের—অত্যন্ত নোংরা। আমাদের কোম্পানীর সঙ্গে নদী পার হচ্ছি, এমন সময় পুলটি ভেঙ্গে গেল। প্রবলবেগে তিনটি নৌকা ভাসতে ভাসতে একেবারে বুক্কুর দুর্গ পার হয়ে চলে গেল। প্রায় ছমাইল ভেসে যাবার পর মাঝিরা সেগুলি থামাতে সমর্থ হয়। চারজন সিপাহী জলে ডুবে যায়। সারারাত আমরা সেই গহন জল-জঙ্গলে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাস্তা কারুরই জানা নেই; পরের দিন সকালে আমাদের ঘাঁটি দেখতে পেলাম।

লাট সাহেব জ্বরে এমন ভুগলেন যে তাঁকে ইউরোপে চলে যেতে হল। 'বোম্বাই আর্মির' সিপাহীরা 'বেঙ্গল আর্মির' সঙ্গে যোগ দিল। আমরা শিকারপুরের দিকে চললাম। দেশের লোকেরা সবাই মুসলমান; তাদের ভাষা আমরা বুঝি না। তাদের সব কিছুই নোংরা। আমাদের সিপাহীদের তারা কোনরূপ বাধা দেয়নি; ডাকাতি বা খুন জখমও কিছু হয়নি। শিকারপুর ছাড়বার পরেই আমাদের আসল বিপদ সুরু হয়; সারা দেশ মরুময়; মাত্র কয়েকটি কূয়ায় জল আছে—তাও বিস্বাদ। সমস্ত জিনিসপত্র—এমনকি কাঠ ও জল পর্য্যন্ত উটের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

এইবার বেলুচিরা রাত্রে আমাদের আক্রমণ করে উত্যক্ত করে তুলল। তারা আমাদের উটগুলিকে নিয়ে পালিয়ে যেত। উট চুরি করার রীতি বড় অদ্ভুত। দল বেঁধে উটগুলিকে কখন চরাতে নিয়ে যাওয়া হবে বা তাদের পিঠ থেকে মালপত্র নামান হবে এসব একজন বেলুচি সওয়ার নজর রাখত। সে তারপর উটের রক্তমাখা একটুকরো কম্বল বর্শায় জড়িয়ে সেটি একটি পুরুষ উটের মুখে ঢুকিয়ে তাকে উত্তেজিত করত; ফলে সেই উটটি তার পিছনে ছুটে যেত এবং দলের অন্য উটগুলিও তাকে লক্ষ্য করে পালিয়ে যেত। এইভাবে একসঙ্গে প্রায় কুড়িটি উট নিয়ে বেলুচি দস্যু পাহাড়ী পথে বহুদূর চলে যেত। মালবাহী উট এমনভাবে প্রায়ই চুরি যাওয়ায় সেনাদলে খুব অসুবিধা দেখা দেয়। আরও অনেকগুলি অবশ্য সংগ্রহ করা হয় বটে কিন্তু সেগুলি মাল বওয়া দূরে থাকুক জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে মরুভূমির মধ্যে দৌড়ে পালিয়ে যেত।

শীতের মাঝামাঝি সময়ে আমরা কুচ করে চলেছি; তবুও কী ভীষণ গরম লাগছে। গরমে অনেক ইউরোপীয় ও সিপাহী মারা গেল। একদিন ত প্রায় পঁয়ত্রিশ জন মারা যায়। এই সময় সিপাহীরা ত একরকম ভারতে ফিরে যাওয়াই স্থির করে ফেলে; সেনাদলের তিনটি শাখাতেই বিদ্রোহ দেখা দিল। কিন্তু শাহ প্রচুর অর্থের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় এবং কিছুটা বেলুচিদের ভয়ে—তাদের সংখ্যা আবার দিন দিন তখন বেড়েই চলেছে—সিপাহীরা কুচ করে চলল। সাহেবরা যথাসাধ্য তাদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। কী ভীষণ কষ্টই না আমাদের ভোগ করতে হয়।

আমরা 'দদুর' (Dadur) উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলেছি; এ যেন নরকদ্বার। অত্যন্ত নীচু জায়গা, চারপাশে পাহাড়, মনে হয় এখানে কখনও বাতাস আসে না—বুন্দেলখণ্ডে যে কবরে ছিলাম তার চেয়েও এ জায়গা খারাপ। এরপর আমরা বোলান গিরিপথে এসে পৌঁছলাম। এখানে বোলানী কাকুর লোকের হাতে অনেকের মৃত্যু হয়। সুযোগ পেলেই এরা মানুষ খুন করে থাকে। পাহাড়ের উপর থেকে বড় বড় পাথরের টুকরো গড়িয়ে ফেলে দিত; জলের রাস্তা সব বন্ধ করে দিত এবং পীলু[১] কাঠ দিয়ে কূয়া ভর্তি করত। জল দুর্গন্ধে ভরে উঠত; এমন কি কাছে গেলেই শরীর খারাপ হত। এর পর কোয়েটায় এলাম। সেখানে তখন ভীষণ শীত; হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে অনেকে জ্বরে ভুগল। সামনেই কান্দাহার। এতদিন বেলুচি ও গিরিপথের কাছে পাহাড়ী লোকেরাই আমাদের বাধা দিয়েছে; কান্দাহারের লোকেরা কিছু করেনি। শোনা গেল আফগানরা নাকি জানত না যে সরকারের সেনাদল এমন ঘুরপথে আসবে। তারা ভেবেছিল পেশোয়ারের কাছে খাইবার গিরিপথ বা উত্তরাঞ্চলে অন্য কোন গিরিপথ দিয়ে সিপাহীরা আসবে এবং সেই মত সেই সব জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করে তা রক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। আমার ধারণা বড় সাহেব এসব জানতেন এবং তিনি লোক মারফৎ গোপনে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে খাইবার গিরিপথ দিয়েই ইংরাজ বাহিনী আসবে। তবুও আমাদের দলের সাহেবরা সবাই শত্রুর দেখা না পেয়ে বা কাবুলের দিক থেকে কোনরূপ প্রতিরোধ করা হল না দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

পাহাড়ী লোকেরা সমতলভূমিতে বেশীদূর আসতে চাইত না; কয়েক ক্রোশ দূরে কোন গ্রাম চড়াও হওয়া বা 'কাফিলা' আক্রমণ করা ছাড়া তারা সাধারণতঃ বাড়ী থেকে দূরে যেত না। পাহাড়ের আড়ালে তারা দুর্জয়। সেখানে পুরনো ধরণের বন্দুক থেকে তারা গুলি ছুঁড়ত; সাধারণ বন্দুকের টোটার চেয়ে এর টোটা

১। এই গাছের ল্যাটিন নাম Salva dora persica. মরুভূমিতে জন্মায়। কাঠের ধোঁয়ায় এমন দুর্গন্ধ যে গা-বমি বমি করে; এই কাঠে রান্না করা খাবার পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়।

ছিল প্রায় তিনগুণ বড় এবং চারশ গজ দুর পর্য্যন্ত গুলি যেত। কিন্তু তারা কখনও আমাদের গুলির সামনে দাঁড়াতে পারেনি। তাদের যুদ্ধ করার ধরণ হল প্রত্যেকে পৃথক ভাবে যুদ্ধ করবে—সরকারের সিপাহীদের মত সবাই একসঙ্গে কিছু করত না। শত্রু মিত্র যে কেউ এই পাহাড়ী পথ দিয়ে যেত তাদের এরা আক্রমণ করত এবং জিনিসপত্র লুট করত। এদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাবার জন্য কাফিলারা প্রচুর টাকা ঘুষ দিত। দেশ থেকে শুকনো ফল ও চামড়া প্রভৃতি নিয়ে কাফিলারা ভারতে আসত এবং হিন্দুস্থানের নানা শিল্প-সামগ্রী নিয়ে ফিরে যেত। এই রকম অত্যাচার থেকে পরিত্রাণের আশায় প্রায়ই তাদের অনেক টাকা দিতে হত। কিন্তু কোন কোন পাহাড়ী উপজাতির লোকেরা সবসময়েই বলে বেড়াত যে এমনভাবে কোন টাকা তারা পায়নি—কাজেই তারা লুট করত। এই সব পাহাড়ী-জাতির লোকেরা কাবুলের প্রজা ; ইংরাজরা যে তাঁর বন্ধু এ খবর শাহ তাদের পাঠাতেন—তারা কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেনি। সরকারের সৈন্যদের যেমন তারা আক্রমণ করত সেই ভাবেই তারা শাহর লোকদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ত। আসলে তারা রক্তপিপাসু ও উচ্ছৃঙ্খল এক বন্যজাতি।

কিছুদিন পরেই আমরা কান্দাহারে পৌঁছলাম। কান্দাহার তখন অনেক নামে পরিচিত ছিল—লোরাসপুর, হুসেনাবাদ ও নাদেরাবাদ। তখন সেখানের আবহাওয়া বেশ গরম ; তবে হিন্দুস্থানের মত নয়। সর্দাররা প্রথমে অল্প সৈন্য নিয়ে বাধা দিতে এলেন। কিন্তু সরকারী সিপাহীদের লালকুর্তা দেখে তারা যেন হঠাৎ ভয় পেয়েছেন মনে হল এবং তারা প্রত্যেকেই পালিয়ে গেলেন। যদি তারা বোলান গিরিপথে আমাদের প্রতিরোধ করতেন—যা পার হতে আমাদের সাত আট দিন সময় লেগেছিল—তাহলে আমাদের প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য মারা পড়ত।

এই রকম অসহ্য কষ্ট ও দুঃখের মধ্যে কুচ করবার সময় চাকরি জীবনে এই প্রথম অফিসারদের মধ্যে মতবিরোধ আমার চোখে পড়ল। বোম্বাইএর লাট ও বাংলার জেনারেল সাহেবের মধ্যে ঝগড়া হল। লাটসাহেবের ধারণা তাঁর সেনারাই সবচেয়ে দক্ষ। বোম্বাইএর অফিসাররা সবাই শাহর সেনাদের ঘৃণার চোখে দেখতেন। 'রেগুলার' সিপাহীরা আমাদের খুব গালিগালাজ করত, তারা আমাদের বলত 'নাজিব'। আমাদের জেনারেলের চেয়ে লাট কেন্ সাহেব আরও উচ্চ পদস্থ, তিনি কিছু সৈন্য সিন্ধু দেশে থাকবার হুকুম দিলেন। সেনাদলে সুবন্দোবস্তের জন্য সরকারের এত খ্যাতি ; দুজন কম্যাণ্ডারই এখন সে সব ভুলে গেছেন মনে হল।

কান্দাহার যাওয়ার পথে আসল সত্যটি বোঝা গেল। শাহ সুজা হিন্দুস্থানে আমাদের যতই আশ্বাস দিন না কেন যে আফগানরা তাঁকে ফিরে পেতে খুব উদগ্রীব আসলে তারা তাঁকে পছন্দ করে না। আবার সিপাহীদের মনে ভয় হল ও তারা হতাশ হয়ে পড়ল। তারা ভাবল শাহ তাদের ঠকিয়েছেন এবং এমন কি সরকার

নিজেও ভুল পথে চলেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র ইংরাজ অফিসারদের প্রশংসনীয় আচরণের জন্যেই সিপাহীরা আবার এগিয়ে চলল—একটু দুঃখ বা বিরক্ত প্রকাশ করা ছাড়া তারা আর কিছু করেনি। আমরা যদি প্রাণে বেঁচে থাকি এবং যদি শাহ তাঁর নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করেন তাহলেও সরকার আমাদের পুরস্কার দেবেন এই ভেবে সবার মনে আনন্দ হল। কান্দাহারের চারপাশে উর্বর জমিতে নানা রকমে ফুল ও ফলের বাগান দেখে আমরা স্বস্তি বোধ করলাম। একটি গাছের ছায়ায় আমি খাবার রান্না করলাম, পাশ দিয়ে ছোট নদী বয়ে চলেছে। শিকারপুর ছাড়ার পর আমাদের ভাগ্যে চিঁড়ে, ছাতু বা ছাতা-পড়া আটা ছাড়া কোন ভাল খাওয়া জোটেনি।

আমরা যেন নরক রাজ্য পেরিয়ে এলাম। এ দেশের চারিদিকে শুধু পাথর। উটের খাদ্য একরকম কাঁটা ঘাস ছাড়া সবুজের কোন চিহ্ন নেই, পাখী বলতে কেবল শকুন। আমাদের মালবাহী জন্তুর মধ্যে যেগুলি মারা পড়ত বা যে সব মৃত সহকর্মীদের আমরা কবর দিতে পারতাম না তাদের মাংস এরা খেত।

আমাদের যাওয়ার আগে এই জঘন্য দেশে আর কোনও জন্তু ছিলনা, কি খেয়েই বা তারা বাঁচবে? মরুভূমির মধ্যে শেয়ালের দল আমাদের পিছু পিছু আসত; তারাও কিছু মাংস খেতে পেত। কোন হিন্দু সিপাহী মারা গেলে তাকে দাহ করার কাঠ পাওয়া যেত না; কাশী বা গঙ্গা সেখান থেকে বহু দূরে। তার কি দুর্ভাগ্য; ক্ষুধার্থ শৃগালের উদরে তার দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ত। সিন্ধুনদ পার হওয়া যে কেন নিষিদ্ধ তা এখন বুঝতে পারলাম, যারাই ওপারে গিয়েছে তারাই কষ্ট পেয়েছে। এমন ধর্ম-নিষিদ্ধ কাজ করেছি এই ভেবে আমাদের দুশ্চিন্তা যেন আরও বাড়ল।

সিপাহীরা কান্দাহারে প্রবেশ করল। শাহ-সুজা-উল-মুলক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন; তাঁর লোকজন উৎসবে মেতে উঠল। শাহর সৈন্যরা প্রথমে চলল; তার পিছনে সরকারের সিপাহী। নানা রকমের তামাসা সুরু হল। শাহ ফিরে আসায় লোকেরা প্রথম প্রথম বেশ সন্তুষ্ট মনে হল। পরে শোনা যায় তারা মনে মনে তাঁকে ঘৃণা করত; সরকারের সেনাদলের ভয়েই তারা এমন শান্ত ছিল। সাধারণ লোকে তাদের রাজা কে হবে না হবে এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় বলে মনে হয়না। কিন্তু ফিরিঙ্গী সৈন্যদের নিয়ে শাহ দেশে ফিরে এসেছেন এই দেখে সর্দার বা অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিরা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তারা বলতে লাগলেন নিজের দেশে আসবার রাস্তা শাহ ইংরাজদের দেখিয়েছেন এবং শীঘ্রই ইংরাজরা এ দেশ জয় করবে। হিন্দুস্থানে যা হচ্ছে এখানেও তাই হবে—তারা তাদের আইনকানুন চালু করবে—এই কথা ভেবেই তারা রুষ্ট হয়েছিল। তাদের ধারণা শাহ যদি কেবলমাত্র নিজের সেনাদের নিয়ে আসতেন তাহলে কিছু বলবার ছিলনা। আমীর কান্দাহারে রইলেন;

দেখলাম কিছুদিন পরেই আমীরকে লোকে আর তেমন গ্রাহ্য করে না। যখন তারা দেখল যে ইংরাজরা হিন্দুস্থানে না ফিরে সেই দেশেই ছাউনি করে আছে তখন তারা ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল।

কান্দাহারে অনেক হিন্দু ও বেনিয়াদের আমরা দেখেছিলাম। এদের পূর্বপুরুষরা যে কবে এদেশে এসেছিল তা তাদের মনে নেই। তাদের দেখে আমরা অবাক হয়েছিলাম। লোক ঠকানর সুবিধা যেখানেই মিলবে সেখানেই বেনিয়ারা ছুটে যাবে। পরে গজনী এবং কাবুলে তাদের দেখা পেয়েছিলাম; শুনেছি এদের কেউ কেউ নাকি এমন কি রুশ দেশেও গিয়েছে।

কিছুকাল আমরা কান্দাহারে রইলাম; কোন কাজ নেই, সামনেই ফসলের সময়। ফসল না পাকা পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কান্দাহার এমন গরীব জায়গা যে এখানে দরকার মত শস্যও পাওয়া যায় না। হয় দোকানদাররা মালপত্র সব লুকিয়ে রাখে। নয়ত যা দরকার সত্যি সত্যিই তাদের কাছে তা থাকেনা। সৈন্যদের প্রয়োজনমত খাদ্য সংগ্রহ করতে অনেক সময় লাগল।

ক্রমশঃ

১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ*

হরিদাস মুখোপাধ্যায়
ও
কালিদাস মুখোপাধ্যায়

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আজও বাদানুবাদের অন্ত নেই। আর এই বাদানুবাদে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি নিয়ে কম-বেশী অংশ নিয়েছেন নানা বর্ণের, নানা শ্রেণীর লোকই। পণ্ডিত, পণ্ডিতমন্য ও অপণ্ডিত, রাষ্ট্রিক ও অ-রাষ্ট্রিক নানা বর্ণের লোকই এই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। অজস্র রচনা আর প্রবন্ধও এই উপলক্ষ্যে পত্রিকাগুলিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। গবেষণামূলক গ্রন্থাবলীও কয়েকখানা রচিত হয়েছে। বাংলার সাম্প্রতিক সাহিত্যেও এই বাদানুবাদ এক উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখে গেলো।

১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি যে বিপুল সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তাকে মোটামুটিভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক সাহিত্য ও মনগড়া প্রচার সাহিত্য। জাতির ক্রমোন্নতির ইতিহাসে হয়তো দুয়েরই আপেক্ষিক মূল্য আছে। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-চর্চা আর ঐতিহাসিক প্রচার সাহিত্য যে এক বস্তু নয়, সেকথাও সেই সংগে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-চর্চার অর্থ নিছক ঘটনাপঞ্জীর প্রাণহীন সমাবেশ নয়। এখানেও বিশ্লেষণ শক্তি ও সুনিয়ন্ত্রিত কল্পনাশক্তির স্থান আছে যথেষ্ট এবং তা প্রায় অপরিহার্য। ইতিহাস যখন প্রত্নতত্ত্ব নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক মালমশলাগুলিকে জীবন-দর্শন বা জীবন-ব্যাখ্যার দ্বারা আলোকিত করেই যখন রচিত হয়, ইতিহাস তখন একেবারে ষোল-আনা বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস কারো কাছ থেকে আশা করা দুরাশা মাত্র। বহুদিন পূর্বে বিনয় সরকার লিখেছিলেন: "It must never be forgotten that history is a science altogether different from archaeology. In order to be lifted up to history archaeology must have to be impregnated with a bias, an interpretation, a standpoint, a philosophy, a 'criticism of life'," (**The Futurism of Young Asia**, Leipzig, 1922, pp., 328-329)। প্রত্নতত্ত্বের বিবরণে যে ধরণের বস্তুনিষ্ঠা সম্ভব, ইতিহাস পর্যালোচনায় ততটা বস্তুনিষ্ঠা সম্ভব নয়। দৃষ্টিভংগীর পার্থক্য বশতঃ ঐতিহাসিকেরা

* ডাঃ মজুমদার, ডাঃ সেন ও বিরুদ্ধপন্থীদের আলোচনার পর্যালোচনা

একই ঘটনা সম্বন্ধে রকমারি মতামত ব্যক্ত করে থাকেন, আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-চর্চা বলে গবেষণার এক বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত হয়ে থাকে। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-চর্চার মানে হলো প্রত্নতত্ত্বের মালমশলা সংগ্রহের সময় পূর্ব-স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অগ্রসর না হয়ে উদার মনোভাবে ও খোলা চোখে (অর্থাৎ মানবীয় অর্থে, দার্শনিক অর্থে নয়) অগ্রসর হওয়া, সংগৃহীত তথ্যগুলিকে সমগ্রভাবে বিচার করা ও তার উপর যথাসম্ভব যুক্তি-নিষ্ঠ ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং পরিশেষে নিজ সিদ্ধান্ত বা মতামত ব্যক্ত করা, প্রয়োজন হলে সে-অবস্থায় নিজের পূর্বেকার মত সংস্কার বশে বা অহমিকা বশত আঁকড়ে ধরে না থেকে আংশিক বা সম্পূর্ণ বর্জন করা। সাময়িক ও সাংসারিক সুবিধা-অসুবিধার হিসাব থেকে নয়, পদের মোহে, পদবীর সম্মোহনে নয়, সত্য আবিষ্কারের এক সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়েই অগ্রসর হওয়া ইতিহাস-গবেষকের স্বধর্ম—বাস্তব ঘটনাগুলিকে বিকৃত করে বা একতরফা ভাবে সাজিয়ে কোন নির্দিষ্ট মত-পথের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে ওকালতি করা তাঁর সাজে না। স্বভাবতই এ ধরণের জ্ঞানযোগের সাধক কোনো দেশেই কোনো কালে শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে মেলে না।

(২)

মহাবিদ্রোহ নিয়ে মূল উৎসের সাহায্যে সম্প্রতি যে সকল পণ্ডিত গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ডাঃ মজুমদারের The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 (April 15, 1957) ও ডাঃ সেনের Eighteen Fifty-Seven (May, 1957) গ্রন্থদ্বয়। প্রায় একই সময় বই দুখানি আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গ্রন্থে মতামত ব্যক্ত করেন নি। সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মৌলিকভাবেই ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বিদ্রোহ বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন। একথা বলার অর্থ এই যে, দুই রীতিতে দুই ভিন্ন পরিবেশে দুই ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হলেও শেষ পর্যন্ত উভয়েরই মূল সিদ্ধান্ত প্রায় অনুরূপ। ডাঃ মজুমদারের বই ব্যক্তিগত চেষ্টার পরিণতি, ডাঃ সেনের বই ভারত সরকারের আগ্রহে ও অর্থে রচিত এবং প্রকাশিত। ডাঃ মজুমদার গ্রন্থের "পরিচিতি"-তে লিখেছেন যে মূলত তাঁরই উৎসাহে ১৯৫২ সনের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে এক বোর্ড গঠন করেন ও কিছুদিন পর তাঁকেই ঐ বোর্ডের অধ্যক্ষ বা পরিচালকের (Director) পদে নিযুক্ত করা হয়। ঐ বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে আধা-আধি ছিলেন ঐতিহাসিক গবেষক, আর বাকী লোকেরা ছিলেন কংগ্রেস-পন্থী রাজনীতিক। দুইজন বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতা ছিলেন ঐ বোর্ডের সভাপতি (Chairman) ও

সম্পাদক (Secretary)। শ্রীযুত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বলেন যে, ডাঃ মজুমদার কর্তৃক উল্লিখিত দুই ব্যক্তি যথাক্রমে হলেন ডাঃ সৈয়দ মামুদ ও শ্রীসুরেন্দ্র মোহন ঘোষ। এই ঐতিহাসিক বোর্ডের তথ্য সংগ্রহের কাজ অনেকখানি অগ্রসর হবার পর সংবাদপত্র মারফৎ জানা গেল যে, কোনো অজ্ঞাত কারণে সরকার পক্ষ ঐ বোর্ড ভেঙে দিয়েছেন। ডাঃ মজুমদার তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় এই অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ১৯৫৩ সনের মে মাসে তিনি অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করার অল্পদিন পর থেকেই লক্ষ্য করলেন যে উক্ত বোর্ডের সম্পাদক ১৮৫৭-র বিদ্রোহ সম্বন্ধে সকল তথ্যাবলী সংগৃহীত হবার পূর্বেই মনে মনে ঐ ঘটনা সম্বন্ধে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ধারণা স্থির করে ফেলেছেন আর প্রস্তাবিত স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে সেই মতগুলি অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য তিনি ব্রতবদ্ধ। উক্ত সম্পাদকের মতে নাকি: "In 1857 an organised attempt was made by the natural leaders of India to combine themselves into a single command with the sole object of driving out the British power from India in order that a single, unified, politically free and sovereign State may be established. The attempt was conscious and deliberate" (p. vi) অর্থাৎ ১৮৫৭ সনে ভারতের স্বাভাবিক নেতৃবৃন্দ ইংরেজকে বিতাড়িত করে এক ঐক্যগ্রথিত, স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য এক সজ্ঞান ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা করেছিল। অর্থাৎ এই দৃষ্টিতে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ হলো ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্ব।

ডাঃ মজুমদার দুঃখ করে আরও লিখেছেন যে পূর্বোক্ত মত সম্পাদকের ব্যক্তিগত অভিমতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না। ঐ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্রোহসংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগৃহীত করবার জন্য জনৈক ঐতিহাসিক পণ্ডিতও শীঘ্রই নিযুক্ত হলেন বোর্ডের অধ্যক্ষের অজ্ঞাতসারেই অর্থাৎ ডাঃ মজুমদারকে না জানিয়েই। ঐ ঐতিহাসিক পণ্ডিত তারপর প্রায় দুবছর ধরে ভারতের "ন্যাশান্যাল আর্কাইভ্‌সে" মালমশলা সংগ্রহ করে ১৮৫৭র বিদ্রোহের উপর একটি অধ্যায় রচনা করেন। ঐ রচনা পড়ে ডাঃ মজুমদার বিস্মিত হন, লক্ষ্য করেন যে ঐ রচনায় বিদ্রোহসংক্রান্ত বহু অত্যাবশ্যক দলিলপত্রাদি অগ্রাহ্য হয়েছে, আর এটাও লক্ষ্য করেন যে উক্ত রচনায় বোর্ডের সম্পাদকের পূর্ব-স্থিরীকৃত মতামতই ঘোষিত হয়েছে এবং ঐতিহাসিক গবেষণার প্রকৃত আদর্শ লঙ্ঘিত ও খণ্ডিত হয়েছে। ডাঃ মজুমদারের ভাষায়, "On going through it I found that while it faithfully echoed the sentiments of the Secretary, it was hopelessly at variance with what I conceive to be the true principles of historical writing"

(pp. vi-vii). ফলে স্বাধীনতা-আন্দোলনের পরিকল্পিত ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের খসড়া তৈরী করে বোর্ডের সম্পাদককে দেবার সময় ডাঃ মজুমদার ঐ বিশিষ্ট রচনাটি নিতান্ত ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনা করায় বাতিল করে দেন। এর পরবর্তী ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। ১৯৫৫ সনের ডিসেম্বর মাসে সরকারী নির্দেশানুসারে স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে গঠিত ঐতিহাসিক বোর্ডের ঐতিহাসিক অপমৃত্যু ঘটলো। গোটা ভারতবর্ষের কাহিনী অবলম্বন করে প্রস্তাবিত স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস এ পর্যন্তও আর প্রকাশিত হলো না। সরকারী আবহাওয়ায় থেকে এবিষয়ে যথার্থ ইতিহাস রচনা প্রায় দুঃসাধ্য মনে করাতেই ডাঃ মজুমদার স্বাধীনভাবে স্বকীয় মতামত, বিশেষ করে ঐ বিদ্রোহ সম্বন্ধে মতামত, ব্যক্ত করতে এগিয়ে এলেন। "১৮৫৭-র মিউটিনি ও বিদ্রোহ" গ্রন্থ এই তিক্ত আবহাওয়ায় রচিত। গ্রন্থখানি ডাঃ মজুমদারের সুচিন্তিত ও পরিপক্ক গবেষণার পরিণতি। সরকার পক্ষের উপর আর প্রায় সার্বজনিকভাবে বর্তমানে স্বীকৃত ও দীর্ঘকাল ধরে মানসলোকে পুষ্ট জনপ্রিয় মতবাদের উপর তীব্র কষাঘাত ঐ গ্রন্থে আছে সত্য, কিন্তু তথ্য, চিন্তা ও যুক্তির এমন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর ঐ গ্রন্থ যে, ঐ বইকে উষ্মাজড়িত সুরে লেখা মনে করে কম মূল্য দিলে তা হাস্যকর ছেলেমানুষি হবে। সরকার পক্ষের সংগে ডাঃ মজুমদারের বিদ্রোহ বিষয় নিয়ে যত বিরোধই থাকুক্ আর সরকারের উপর তাঁর যত ব্যক্তিগত অভিযোগই থাকুক না কেন, গ্রন্থকার বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার মানদণ্ড থেকে প্রায় কোথাও বিচ্যুত হন নি। বিরুদ্ধপন্থী বিদ্রোহ-বিষয়ক গবেষণাকারী ইতিহাসলেখক ডাঃ শশিভূষণ চৌধুরীও ডাঃ মজুমদারের বইকে "monumental work" ও তাঁর বিশ্লেষণী শক্তিকে "very penetrating" বলে সম্বর্দ্ধনা না করে পারেন নি (ডাঃ চৌধুরীর নবপ্রকাশিত Civil Rebellion in the Indian Mutinies, pp. xx and 288 দ্রষ্টব্য)।

(৩)

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের বই কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন আবহাওয়ায় লেখা—সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থানুকূল্যে। ভারত সরকারই তাঁর বিদ্রোহ বিষয়ক গ্রন্থের প্রকাশক। ডাঃ সেন ভূমিকায় বলেছেন যে পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিভংগী নিয়ে বস্তুনিষ্ঠভাবে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের উপর একখানা প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে তাঁর কাছে অনুরোধ আসে ১৯৫৫ সনের গোড়ার দিকে। সেই অনুরোধেই রচিত হয় তাঁর Eighteen Fifty-Seven গ্রন্থ। ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে, গ্রন্থে যে-সকল অভিমত তিনি ব্যক্ত করেছেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব—একে সরকারী ভাষ্য ("authorised version") বিবেচনা করা ভুল হবে। তিনি

আরও বলেছেন যে সরকার পক্ষ থেকে নিজ মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা ("complete liberty to state his conclusions fully and freely without any fear of official interference," p. xxiii) তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গ্রন্থের 'মুখবন্ধে'-ও স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন: "The only directive I issued was that he should write the book from the standpoint of a true historian. Beyond this general instruction, there was no attempt to interfere with his work or influence his conclusions...I am glad to find that Dr. Sen has treated the subject objectively and dispassionately" (pp. xx-xxi). অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভারতের দুই প্রধান ঐতিহাসিকের লেখা গ্রন্থদ্বয়ের মতামতের মধ্যে শেষ পর্যন্ত গভীর সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে, তাঁদের মূল বক্তব্যের মধ্যে গরমিলের বদলে মিলই বেশী করে লক্ষনীয় হয়েছে। অনেকেরই আশংকা ছিল ডাঃ সেন বুঝি সরকারের উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে রচিত গ্রন্থে ১৮৫৭র বিদ্রোহ সম্বন্ধে সরকারী মতেই সায় দেবেন, আবার অনেকে এও আশা করেছিল যে সরকারী মতের তীব্র সমালোচক ডাঃ মজুমদারের বিদ্রোহ বিষয়ক বইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও পাওয়া যাবে ডাঃ সেনের রচনায়। কিন্তু কোনো পক্ষেরই আশা বা আশংকা শেষ পর্যন্ত সত্য হলো না। বরং দেখা গেল বিদ্রোহ বিষয়ক সরকারী গ্রন্থেও ডাঃ সেন সরকারী মতের বিরুদ্ধেই রায় দিলেন আর সেই সংগে এটাও ক্রমশ বুঝা গেল যে, বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়ে বই লিখলেও ডাঃ মজুমদার তাঁর গ্রন্থে ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠা প্রায় কোথাও বিসর্জন দেন নি। দুই ভিন্ন পরিবেশে দুই বই লেখা হয়েও মতের সাদৃশ্য স্বভাবতই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(৪)

ডাঃ মজুমদারের মতে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে ("assumed different aspects in different areas")। কোথাও এই বিদ্রোহ ছিল খাঁটি সিপাহীদের অভ্যুত্থান ("purely a mutiny of the Sepoys"), কোথাও ছিল সিপাহী বিদ্রোহের পেছন্-পেছন্ স্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর লোক, তালুকদার ও প্রজাদের প্রকাশ্য বিদ্রোহ, আবার কোথাও বা ছিল বিদ্রোহী সিপাহীদের জন্য জনসাধারণের সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি বা সমর্থন, যদিও এই সমর্থন শেষ পর্যন্ত শেষোক্ত এলাকায় প্রকাশ্য জনবিদ্রোহে রূপ নেয় নি। পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশের এক বৃহৎ অংশকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা চলে; দ্বিতীয় শ্রেণীর উপদ্রুত এলাকা হলো ইউ, পি, বা যুক্ত প্রদেশের বেশীর ভাগ অংশ, মধ্যপ্রদেশের অল্প এক

অংশ আর বিহারের পশ্চিমাংশ; আর তৃতীয় শ্রেণীতে ফেলা চলে প্রায় গোটা রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রকে (পৃঃ ২২৩-২২৪)। তবে মোটের উপর ১৮৫৭-র প্রলয়কাণ্ডকে ডাঃ মজুমদার বলেছেন "primarily a mutiny gradually developing into a general revolt in certain areas" (পৃঃ ২২১) অর্থাৎ মূলত সামরিক বিদ্রোহ, যদিও কোনো কোনো এলাকায় ঐ বিদ্রোহ ধীরে ধীরে জনবিদ্রোহে পরিণত হয়। ঐ বিষয়ে সমসাময়িক বিদ্রোহের ইতিহাস-লেখক ইংরেজ পণ্ডিত চার্লস্ রেক্‌সের মতামত ডাঃ মজুমদার সম্পূর্ণ স্বীকার্য বলে গ্রহণ করেছেন।

আবার ভারত সরকার প্রকাশিত ডাঃ সেনের গ্রন্থেও প্রায় অনুরূপ কথাই লেখা দেখতে পাই। ডাঃ সেনের মতে: "The movement began as a military mutiny but it was not everywhere confined to the army... Outside Oudh and Sahabad, there is no evidence of that general sympathy which would invest the Mutiny with the dignity of a national war. At the same time it would be wrong to dismiss it as a mere military rising. The Mutiny became a revolt and assumed a political character when the mutineers of Meerut placed themselves under the King of Delhi and a section of the landed aristocracy and civil population declared in its favour" (পৃঃ ৪১১) অর্থাৎ ১৮৫৭-র আন্দোলন প্রথমে সিপাহীদের বিদ্রোহরূপেই সুরু হয়, কিন্তু সর্বত্রই এই বিদ্রোহ সামরিক বাহিনীতে সীমাবদ্ধ ছিল না।...অযোধ্যা ও সাহাবাদ ছাড়া অন্যত্র বিদ্রোহীদের প্রতি জন সমর্থন এমন কিছু ছিল না যার জোরে ঐ মহাবিদ্রাহকে জাতীয় যুদ্ধের স্তরে তুলে ধরা চলে। কিন্তু তাই বলে আবার এই বিদ্রোহকে নিছক সামরিক বিদ্রোহ মনে করলেও ভুল হবে। মিরাটে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবার পর বিদ্রোহীরা যখন দিল্লীশ্বরের অর্থাৎ নামে-মাত্র সম্রাট বাহাদুর শাহের পতাকাতলে সমবেত হলো আর সেই সঙ্গে যখন অভিজাত শ্রেণীর ও জনসাধারণের একাংশ দিল্লীশ্বরের স্বপক্ষে সমর্থন জানালো, তখন সেই বিদ্রোহ রাষ্ট্রিক লড়াইয়ের রূপ গ্রহণ করে। এর অল্প পরেই আবার ডাঃ সেন নিজ গ্রন্থে লিখেছেন যে, জনতার সমর্থন কোন কোন এলাকায় থাকলেও সেই সব অঞ্চলেও সাধারণ অভ্যুত্থানের স্বরূপ ছিল কিন্তু প্রগতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়া। এমন কি অযোধ্যাতেও অর্থাৎ যেখানে বিদ্রোহ খানিকটা ব্যাপক জনযুদ্ধে বিস্তৃতি লাভ করে সেখানেও আন্দোলনের নেতা বা অংশীদারেরা স্বাধীনতার প্রতিনিধি বা সৈনিক ছিল না। তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার

(" individual liberty-"র) কোন ধারণাই ছিল না। তারা চেয়েছিল প্রাক-ব্রিটিশ আমলের পুরাতন ঐতিহ্য ও ব্যবস্থাকে কায়েম করতে, ইংরেজ শাসনে লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে যে সমাজ-বিপ্লবের পটভূমি গড়ে উঠ্‌ছিল তা ধ্বংস করতে। ইংরেজ সরকার ভারতীয় নারীর অনেক আইনগত ও সামাজিক দুর্ভোগ দূর করেছিল, "আইনের চোখে সকলে সমান" এই নীতি প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিল আর চাষী ও অর্দ্ধদাস জাতীয় লোকদের ভাগ্যোন্নতিতে খেয়াল রেখেছিল। বিদ্রোহীরা চেয়েছিল এই সকল প্রগতিমূলক সমাজ-ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে। তাই ডাঃ সেনের সুস্পষ্ট মত হচ্ছে যে, বিদ্রোহীরা সফল হলে প্রগতিশীল সমাজ বিবর্তনের ধারায় বিঘ্ন ঘট্‌তো, ঘড়ির চাকা পেছনের দিকে ঘুরে যেতো। এই সব কথা লেখার পর ডাঃ সেন তাই মন্তব্য করেছেন: "In short, they wanted a counter-revolution" অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিদ্রোহীরা চেয়েছিল প্রতি-বিপ্লব (পৃঃ ৪১২-১৩)—যে প্রগতি ও বিপ্লবের ধারা একবার দেশে এসে পড়েছে তার গতিকে তরান্বিত বা জয়যুক্ত করা নয়। ডাঃ মজুমদারও নিজ গবেষণা-গ্রন্থে এই একই সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভাষায় ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে "The miseries and bloodshed of 1857-58 were not the birth-pang of a freedom movement in India, but the dying groans of an obsolete aristocracy and centrifugal feudalism of the medieval age" (পৃঃ ২৪১) অর্থাৎ ১৮৫৭-র বিদ্রোহের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম-ব্যথার সন্ধান পান নি, তিনি এর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন মধ্যযুগীয় বিশৃঙ্খল ফিউডাল ব্যবস্থা ও ধ্বংসোন্মুখ সামন্ত শ্রেণীর মৃত্যু-যন্ত্রণা। উভয় ঐতিহাসিকই এই বিদ্রোহকে জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম লড়াই বলতে অস্বীকার করেছেন, দুজনের মতেই এই বিদ্রোহ পূর্ব-পরিকল্পিত প্ল্যান ("pre-concerted plan") অনুসারে ইতিহাসের রংগমঞ্চে দেখা দেয় নি। ডাঃ সেনের মতামত তাঁর গ্রন্থের ৩৯৮-৪১৮ পৃষ্ঠায় ও ডাঃ মজুমদারের অভিমত তাঁর গ্রন্থের ২১৭-২৩৪, ২৭৫-২৭৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। দুজনের মধ্যে যে পার্থক্য নজরে পড়ে তা প্রধানত প্রকাশভংগীর, মতামত সংক্রান্ত নয়।

[৫]

ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেনের ঐতিহাসিক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হবার পর থেকে তাঁদের সিদ্ধান্ত ও মতামত নিয়ে কোনো কোনো মহলে তীব্র সমালোচনা সুরু হয়েছে। "পরিচয়" পত্রে (শ্রাবণ, ১৩৬৪ বা আগষ্ট, ১৯৫৭) ও "New Age"

পত্রে (August, 1957) এই বিরুদ্ধ সমালোচনার সাম্প্রতিক সাক্ষ্য মেলে। কিন্তু ঐ সকল সমালোচনা বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-চর্চার বদলে হয়ে পড়েছে মনগড়া প্রচার সাহিত্য। ঐ দুটি পত্রিকায় অধিকাংশ লেখকই সমালোচনা প্রসংগে ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেনের বিরুদ্ধে যা যা বলেছেন, তাতে তথ্য, চিন্তা ও যুক্তি থেকে অবান্তর কথা স্থান জুড়েছে বেশী।

ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেনের বিদ্রোহ বিষয়ক মতামত নিয়ে এ পর্যন্ত যত আলোচনা ও সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাস-অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ চৌধুরীর Civil Rebellion in the Indian Mutinies, 1857-59 (Sept., 1957) গ্রন্থখানি। পুস্তক প্রকাশের সন তারিখের দিকে খেয়াল রাখলেই দেখা যায় যে, ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেনের গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হলে দেশের মধ্যে যে তীব্র বাদানুবাদ ও সমালোচনার ঝড় ওঠে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-ঘেষা পণ্ডিতদের বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে, সেই আবহাওয়াতেই ডাঃ শশিভূষণ চৌধুরীর পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হয়। কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি যে তারস্বরে প্রচার করে চলেছে ১৮৫৭এর মহাবিদ্রোহ হলো জনপ্রিয় স্বাধীনতার লড়াই, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়, সেই অভিমতই ডাঃ চৌধুরীর গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এই গ্রন্থকে মামুলি প্রচার-সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা চলে না। ডাঃ মজুমদারের অনেকগুলি প্রধান প্রধান বক্তব্যের বিরুদ্ধেই ডাঃ চৌধুরী কলম ধরেছেন। রকমারি সরকারী ও বে-সরকারী সাক্ষ্য ও দলিলের সাহায্যে বইখানি রচিত। ডাঃ মজুমদাদের বইয়েরও প্রচুর তথ্য এতে ব্যবহৃত হয়েছে, আর কিছু পরিমাণে ডাঃ সেনেরও। লেখক পরিশ্রমী ও ঐতিহাসিক গবেষণাক্ষেত্রে পণ্ডিত। তাঁর বই লেখার উদ্দেশ্য হলো ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আকর উৎসের সাহায্যে খতিয়ে দেখা, সিপাহী বিদ্রোহের সময় অ-সামরিক জনসমষ্টি কি পরিমাণ বা কতটা ইংরেজ-বিরোধী অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করেছিল ("to provide a compendious and systematic account of the civil rebellion which accompanied the military insurrection of 1857"—*Vide* Preface)। ১৮৫৭-র আন্দোলনকে তিনি প্রথমেই দুই স্বতন্ত্র অংশে ভাগ করে নিয়েছেন—এর একটা হলো সামরিক বিদ্রোহ (mutiny) আর একটা হলো অ-সামরিক অভ্যুত্থান (rebellion)। তাঁর বিচারে এই দুই অংশের মধ্যে পার্থক্য এত স্পষ্ট যে দ্বিতীয় অংশটা নিজেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেছেন যে, এ-পর্যন্ত বিদ্রোহ-বিষয়ক পণ্ডিতেরা বেশীর ভাগই উল্লিখিত দ্বিতীয় অংশের অর্থাৎ civil rebellion-এর দিকে নজর দিয়েছেন বড় কম, প্রায় দেন নি বললেই হয়তো ঠিক বলা হয়। কাজেই গ্রন্থকার এই সীমাবদ্ধ অংশটির উপরই তাঁর বইয়ে বিস্তৃত

আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করেছেন। বইখানি ডিমাই সাইজের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লেখক মিউটিনি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ ("Theories on the Indian Mutiny," pp. 258-299) আলোচনা করেছেন ও সেখানেই নিজ বক্তব্য পাঠকদের জানিয়েছেন। গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্। ইংরেজীর গুণে স্যার রাধাকৃষ্ণানের ভূমিকা যে কোন পাঠকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে আর তাঁর রচনার ঐ প্রসাদগুণ সর্বজনবিদিত। স্যার রাধাকৃষ্ণান্ লিখেছেন : "Not being a student of history I am not competent to judge the merits or demerits of Dr. Chaudhuri's book···His conclusion that the movement expressed a profound desire for freedom on the part of the people of India and that it was not merely a feudal movement but had within it the germs of progress, seems to be fully sustainable···It may be true to say that the year 1857 marked the beginning of a new era which ended in the transfer of power in 1947" (p. XII) অর্থাৎ আমি ইতিহাসের ছাত্র নই। তাই ডাঃ চৌধুরীর বইয়ের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে বিচার করবার যোগ্যতা আমার নেই। তবে তাঁর যে বক্তব্য—১৮৫৭ সনের আন্দোলনে ভারতীয় জনসাধারণের স্বাধীনতার গভীর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছিল আর সে-আন্দোলন শুধুমাত্র সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহ ছিল না, তার মধ্যে উন্নতির বীজও উপ্ত ছিল এই অভিমত —সম্পূর্ণ স্বীকার্য বলে মনে হয়। হয়তো একথাও সত্য যে, ১৮৫৭ সন এক নতুন যুগের স্চনা করে—যে যুগের পরিণতি হচ্ছে ১৯৪৭ সনের স্বাধীনতায়। গ্রন্থের মূল বক্তব্য হিসাবে স্যার রাধাকৃষ্ণান্ যা বলেছেন, সমগ্র বইখানি পড়ার পর পাঠকদেরও অনুরূপ ধারণাই জন্মায়। ভূমিকা-লেখক গ্রন্থকারের মতকে সঠিক-ভাবেই তাঁর লেখায় রূপ দিয়েছেন। গ্রন্থকারের নিজ বক্তব্য তাঁর বইয়ের ২৫৯-৬০, ২৬৩, ২৭৫ ও ২৯৯ পৃষ্ঠায় যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

[৬]

গ্রন্থকার ও প্রকাশকের মতে Civil Rebellion in the Indian Mutinies বইখানি হলো "a pioneer work on a neglected aspect of the great revolt of 1857···The book demonstrates the untenability of the theory of those who looked upon the event of 1857 as a mere military insurrection." ১৮৫৭র বিদ্রোহধারার মধ্যে অ-সামরিক অভ্যুত্থানও স্পষ্ট অথচ এ বিষয়টা উপেক্ষিত। আর সেই উপেক্ষিত বিষয়েই ডাঃ চৌধুরীর সুবিস্তৃত গবেষণা। কাজেই তাঁর গ্রন্থকে এই বিষয়ে পথিকৃৎ ("pioneer work")

বলে দাবি করা হয়েছে। গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন (pp. XIX-XX) যে Kaye, Malleson প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বহুদিন পূর্বেই তাঁদের রচনায় এই অ-সামরিক বিদ্রোহধারা—যাকে revolt, rebellion বা civil rebellion বলা হয়—তার উল্লেখ করেছেন। ১৮৫৭র প্রলয়কাণ্ডের মধ্যে অ-সামরিক বিদ্রোহের ধারা কত বড় ছিল সে বিষয়ে তো ঘটনার সমসাময়িক কালেই নর্টন তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছিলেন। এমন কি ১৮৫৯ সনে বে-নামীতে প্রকাশিত Native Fidelity গ্রন্থে দেখি গ্রন্থকারের ঐ বইয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে ১৮৫৭-৫৮ এর "Mutinies and Rebellion"-এ জনসাধারণের অংশ খতিয়ে দেখা। হালে ডাঃ মজুমদার এ বিষয়ের উপর অর্থাৎ মিউটিনির দিনে civil revolt এর উপর সুদীর্ঘ তথ্যবহুল আলোচনাও করেছেন তাঁর গ্রন্থে। তাঁর রয়েল সাইজ বইয়ের দুই শতাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে (পৃঃ ৪৩-২৪২ ও ২৫৭-২৭৮) ঐ আলোচনা লিপিবদ্ধ দেখতে পাই। ডাঃ চৌধুরীও নিজ গ্রন্থের ভূমিকায় একথা স্বীকার করেছেন আর বলেছেন যে ডাঃ মজুমদার civil revolt সম্বন্ধে যে সচেতন তা তাঁর The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 বইয়ের নামকরণ থেকেই বুঝা যায়। এই অবস্থায় ডাঃ মজুমদারের বই প্রকাশিত হবার পরও ডাঃ চৌধুরীর পুস্তককে civil rebellion জাতীয় উপেক্ষিত বিষয়ের উপর প্রথম আলোচনা বলে ঘোষণা করা সুবিবেচনার কাজ নয়। একথা অবশ্য সত্য ডাঃ চৌধুরীর সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে ডাঃ মজুমদারের সিদ্ধান্ত থেকে পৃথক্, কিন্তু মতামতের পার্থক্য হেতু কি একথা বলা চলে যে ডাঃ চৌধুরীর আগে ঐ উপেক্ষিত বিষয়ে আর কেউ উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন নি? ডাঃ মজুমদারের রয়েল সাইজ বইয়ের ২২২ পৃষ্ঠা এই আলোচনায় স্থান জুড়েছে, আর ডাঃ চৌধুরীর ডিমাই সাইজ বইয়ের ২৩৯ পৃষ্ঠা (পৃঃ ৬১-২৯৯), অথচ তাঁর বইকে পথিকৃৎ বলে দাবি করা হয়েছে। ঐ উপেক্ষিত বিষয়ের ব্যাপক আলোচনায় পথিকৃতের বা অগ্রণী লেখকের গৌরব যদি একালে কারো প্রাপ্য হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে ডাঃ মজুমদারের। ডাঃ চৌধুরী এ ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বগামীর অনুগামী বা উত্তর-সাধক।

ডাঃ চৌধুরীর বইয়ের গোড়াতেই আবার বলা হয়েছে যে, তাঁর গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো যাঁরা ১৮৫৭ সনের ঘটনাকে "নিছক সামরিক বিদ্রোহ" ("mere military insurrection") বলে জ্ঞান করেন তাঁদের মতের ভুলভ্রান্তি প্রদর্শন করা। হয়তো পূর্বে কেউ কেউ ঐ ঘটনাকে শুধুমাত্র সামরিক বিদ্রোহ মনে করে ভুল করেছিলেন। কিন্তু হালে যে দুইজন প্রধান ঐতিহাসিক ১৮৫৭-র বিদ্রোহের উপর গ্রন্থ লিখেছেন, তাঁরা কিন্তু ঐ ঘটনাকে মোটেই "নিছক সামরিক বিদ্রোহ" বলেন নি, বলেছেন "primarily a mutiny"—প্রধানত এক সামরিক বিদ্রোহ। সিপাহী বিদ্রোহ শুধু সামরিক বিদ্রোহ নয় কেবল এই কথাটুকু বলার জন্য ডাঃ চৌধুরীর নতুন বই লেখার কোন সার্থকতা আছে কি? সে কথা তো তাঁর পূর্বগামীরাই যথেষ্ট জোরের সংগে

বলে রেখেছেন। বস্তুত, ডাঃ চৌধুরীর বইয়ের আসল বক্তব্য কিন্তু অন্যরকম। যাঁরা ১৮৫৭র বিদ্রোহকে জাতীয় স্বাধীনতার লড়াই বলেন না বা যাঁরা ঐ বিদ্রোহকে "primarily a revolt" না বলে "primarily a mutiny" বলেন, তাঁদের মতামতের বিরুদ্ধেই আসলে গ্রন্থকারের লড়াই। অর্থাৎ ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেনের যেটা প্রধান সিদ্ধান্ত তারই ভুল দেখানো ঐ বইয়ের লক্ষ্য। কাজেই ডাঃ চৌধুরীর নতুন বই লিখবার সার্থকতাও আছে যথেষ্ট। তাই তাঁর বইয়ের মূল বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বইয়ের প্রথমেই গ্রন্থকার ও প্রকাশকের এমন বিভ্রান্তিকর উক্তি পাঠকের চোখে একটু দৃষ্টিকটু লাগে। ডাঃ চৌধুরী "mere military insurrection" শব্দের পরিবর্তে শুধু মাত্র যদি "primarily a military insurrection" শব্দ ব্যবহার করতেন, তাহলেও তাঁর মূল বক্তব্য অনেক বেশী সঠিক রূপ পেতো। তা সত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে ভারতের দুই প্রধান ঐতিহাসিকের বিদ্রোহ গ্রন্থদ্বয় পড়ার সময় জিজ্ঞাসু পাঠককে এর পর থেকে ডাঃ চৌধুরীর গ্রন্থখানাকেও পড়ে দেখতে হবে—আর কিছু না হোক, অন্ততঃ বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্যও। শ্রীপ্রমোদ সেনের ১৮৫৭এর বিদ্রোহ-বিষয়ক গ্রন্থখানিও সেইসংগে পঠিতব্য।

(৭)

ডাঃ চৌধুরীর Civil Rebellion পুস্তকে প্রচুর তথ্য ও ঐতিহাসিক মালমশলার সমাবেশ থাকা সত্বেও গ্রন্থের মধ্যে লেখকের বহু অসতর্ক উক্তি ও স্ববিরোধী কথা, বস্তুনিষ্ঠার অভাব ও যুক্তির দারিদ্র্য পাঠকের নজরে পড়ে। এবার কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া মন্দ নয়।

(ক) গ্রন্থের ২৫৯ পৃষ্ঠায় ডাঃ চৌধুরী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকাকে নরমপন্থী মতবাদের ("moderate views"-এর) সমর্থক বলে বিশেষিত করবার পর ঐ পত্রিকার ২১ মে ১৮৫৭ সনে প্রকাশিত নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন: "There is not a single native of India who does not feel the full weight of the grievances imposed upon him by the very existence of the British rule in India—grievances inseparable from subjection to a foreign rule" অর্থাৎ ভারতবাসীদের মধ্যে এমন একজন লোকও এখন নেই যে ভারতে বৈদেশিক বৃটিশ শাসন-জনিত অভিযোগের নিষ্পেষণ সমগ্রভাবে অনুভব করে না। এই উদ্ধৃতি তুলে ডাঃ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন: "If it was so, it was not unlikely that the British had to face a really national and revolutionary situation growing out of the mutinies" (p. 259) অর্থাৎ এই যদি প্রকৃত অবস্থা হয়, তাহলে মনে করা অন্যায় নয় যে বিদ্রোহের দিনে ইংরেজকে এদেশে এক যথার্থ জাতীয়-ও

বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। "হিন্দু পেট্রিয়টের" ঐ উদ্ধৃতি তুলে ডাঃ চৌধুরীর পূর্বেও কোন কোন ইতিহাস-বেত্তা পণ্ডিত অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসার প্রয়াস পেয়েছেন (দিল্লী থেকে প্রকাশিত New Age, August, 1957 পত্রিকা দ্রষ্টব্য)। এই প্রসংগে আমাদের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, "হিন্দু পেট্রিয়ট" তৎকালীন নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাষ্ট্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার দর্পণস্বরূপ। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এই পত্রিকা তৎকালেও প্রয়োজনমত বৃটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা করতে দ্বিধা বোধ করে নি। জি. পি. পিল্লাই তাঁর Representative Indians গ্রন্থে (লণ্ডন, ১৮৯৭, পৃঃ ৪৫) মন্তব্য করেছিলেন যে হরিশচন্দ্র যথেষ্ট যোগ্যতা ও স্বাধীনতার সংগে ("with considerable ability and independence") ঐ পত্রিকা সম্পাদন করতেন। লর্ড ড্যালহাউসির স্বত্ব-বিলোপ নীতি ও রাজ্য জয়ের নীতির তিনি কড়া সমালোচকও ছিলেন। নীলকর আন্দোলনের সময় (১৮৬০) তিনি সর্বতোভাবে শোষিত, নিষ্পেষিত ও বিক্ষুব্ধ রায়তদের স্বপক্ষে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেন—

> "মনে যাদের বেদনা-সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতা
> আকাশের রঙ যাদের আফিঙের মত কালো
> বুকে হেঁটে চলতে চলতে যারা আগ্নেয়গিরির মত
> দাঁড়িয়ে উঠবে শিখায়িত পরাক্রমে"—(বিমল চন্দ্র ঘোষ)—

তাদের মূঢ় ম্লান মুখে তিনি সেদিন জ্বলন্ত ভাষা দিয়েছিলেন। অত্যাচারী, শোষণকারী বিদেশী নীলকর মালিকদের পর্বতপ্রমাণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি সেদিন সর্বস্ব খোয়াতেও কুণ্ঠিত হন নি। এহেন ব্যক্তি পরিচালিত "হিন্দু পেট্রিয়টকে" "নরমপন্থী মতবাদের" প্রচারক বলা নেহাৎ ভুল। নরমপন্থী ব্যক্তির চরমপন্থী উক্তির তাৎপর্য যতখানি, চরমপন্থী ব্যক্তির চরমপন্থী উক্তির মূল্য তুলনায় অনেক কম। কাজেই "হিন্দু পেট্রিয়ট" ১৮৫৭ সনে যে লিখেছিল ভারতবর্ষে একটি লোকও নেই ("not a single native of India") যে ইংরেজ শাসনের নির্মম নিষ্পেষণে অসন্তুষ্ট নয় তা ইতিহাসের কথা নয়, সংবাদপত্রের প্রচার মাত্র। "হিন্দু পেট্রিয়টের" ঐ উক্তি ডাঃ চৌধুরী যতখানি দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করতে চেয়েছেন, সাধারণ পাঠকেরা তা পারবে না। কাজেই "হিন্দু পেট্রিয়টের" একটিমাত্র উদ্ধৃতির ভিত্তিতে তাঁর যে মন্তব্য ("the British had to face a really national and revolutionary situation" ইত্যাদি) তাও অনেকটা অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। সমসাময়িক কোন ঘটনা সম্বন্ধে চরমপন্থী কোন সমালোচকের প্রসংগ-বিচ্যুত একটিমাত্র উক্তি থেকে এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টায় কি যুক্তিরও ফাঁক থেকে যায় নি? একটু ধীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে "হিন্দু পেট্রিয়টের" এরূপ উক্তি কতটা

বিভ্রান্তিকর। "হিন্দু পেট্রিয়টে" ২১শে মে ১৮৫৭ সনে বের হলো যে ভারতে একটি লোকও নেই যে ইংরেজ শাসন ও শোষণে ক্ষুব্ধ নয়, অথচ ঠিক এক দিন পরেই (অর্থাৎ ২২শে মে, ১৮৫৭ সনে) আমরা দেখি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় বিদ্রোহকে "disgraceful and mutinous conduct of the native soldiery" বলে ধিক্কৃত করে এবং ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাবও গ্রহণ করে (Native Fidelity, ১৯০৫ এর সংস্করণ, পৃঃ ২২০-২২২ দ্রষ্টব্য)।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) মারা যান সিপাহী যুদ্ধের ঠিক পরেই। যে-কবি "বিদেশের ঠাকুর" দূরে ফেলেও "দেশের কুকুরকে" স্নেহ করতে স্বদেশবাসীকে বলেছিলেন, সেই স্বদেশপ্রাণ বাঙালী কবি সিপাহী বিদ্রোহকে ধিক্কৃত করেছেন, বিদ্রোহের নেতা নানা সাহেব ও ঝান্সীর রাণীকে মসীবর্ণে চিত্রিত করেছেন এবং "জয় বৃটিশের জয়" বলে আনন্দ প্রকাশ করেছেন (অধ্যাপক ত্রিপুরা শঙ্কর সেনের "উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য," ১৩৬০, পৃঃ ৫১-৫৪ দ্রষ্টব্য)। ১৮৫৮ সনে প্রকাশিত হয় রংগলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মিনীর উপাখ্যান" কাব্য। এই গ্রন্থেও সিপাহী বিদ্রোহের সমর্থন নেই। বিদ্রোহ সম্বন্ধে "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়" স্বাধীনতার এই মন্ত্র-প্রচারক কবি রংগলালের এ বিষয়ে যা সুস্পষ্ট অভিমত ছিল তা তিনি তাঁর "পদ্মিনীর উপাখ্যান" কাব্যেই প্রচার করেছেন। তিনিও এই বিদ্রোহের মধ্যে জাতির কল্যাণ দেখতে পান নি। "পদ্মিনীর উপাখ্যান" কাব্যের শেষ দিকে ইংরেজ শাসনের গুণকীর্তন করে মন্তব্য করেছেন :

"ভারতের ভাগ্য জোর, দুঃখ বিভাবরী ভোর,
ঘুম-ঘোর থাকিবে কি আর ?
ইংরাজের কৃপা বলে মানস উদয়াচলে,
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার ॥
শান্তির সরসী মাঝে সুখ-সরোরুহ বাজে,
মনভৃঙ্গ মজুক হরিষে।
হে বিভো করুণাময় ! বিদ্রোহ-বারিদচয়,
আর যেন বিষ না বরিষে ॥"

এই প্রসংগে বিপিনচন্দ্র পাল, যাঁকে অরবিন্দ ঘোষ "One of the mightiest prophets of Nationalism" বলেছিলেন, তাঁর উক্তিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর "My Life and Times" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন : "The Mutiny did not touch our people at all in Bengal, but the suppression of it and the returning prospect of settled Govern-

ment was hailed with universal delight by them" (p. iv)। বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যে এই বিদ্রোহকে সমর্থন করে নি, এ কথা তো সুবিদিত। ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেনের গ্রন্থেও এর স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাই। এর পরও বলা চলে কি যে "হিন্দু পেট্রিয়টের" উক্তি স্বীকার্য্য? সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে কোন ঘটনা সম্বন্ধে যে মন্তব্য বের হয়, তাকে ডাঃ চৌধুরীর মতো ইতিহাস পণ্ডিতও যে প্রায় বিনা জিজ্ঞাসায় সত্য বলে মেনে নিতে উদ্যত হয়েছেন, তাতে পাঠকের মনে সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয় যে, লেখক নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য এখানে ঘটনাকে কিছুটা বিকৃত করেছেন।

অথচ ডাঃ চৌধুরীর নিজ গ্রন্থেই এমন অনেক তথ্য ও উক্তি দেওয়া আছে যা কিন্তু তাঁর ২৫৯ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত মন্তব্যের ঠিক বিরুদ্ধে যায়। ২৬১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন "That some of the Indians gave shelter to the Europeans or harboured good feelings towards them cannot be urged as conclusive against numerous proofs to the contrary". ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ শেষ পর্য্যায়ে ভারতীয়দের তরফ থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে রীতিমত একটা "war of extermination"-এ পরিণত হয়, এই হলো ডাঃ চৌধুরীর অন্যতম মত। এই মতের বিরুদ্ধপন্থীরা বলবেন যে, তৎকালেও বহু ভারতবাসী ইংরেজের প্রতি বা ইয়োরোপীয়ানদের প্রতি সহৃদয় ভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু ডাঃ চৌধুরীর মতে বিদ্রোহ ভাবাপন্ন লোকই ছিল বেশী। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য সত্য কিনা সেকথা অন্যত্র বিচার্য, কিন্তু তিনিও প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন যে বিদ্রোহের দিনেও অন্ততঃ কিছুসংখ্যক ভারতবাসী ইয়োরোপী-য়ানদের আশ্রয় দিয়েছিল ও তাদের প্রতি সদিচ্ছা পোষণ করতো। এই স্বীকারোক্তির সংগে তাঁর ২৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ঘটনার সংগতি কোথায় আর কতটুকু? ২৬৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখেছেন "the whole country seething with opposition," আবার ২৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "commercial and industrial classes," "bankers and traders," "big native princes and chiefs" অর্থাৎ ব্যবসায়ী শ্রেণীরা, দেশী রাজন্যবর্গ ও স্থানীয় অভিজাতেরা বিদ্রোহে তো যোগ দেয়-ই নি বরং ইংরাজপক্ষকে শান্তিশৃঙ্খলা পুনপ্রতিষ্ঠা করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল, আর যারা সেদিন ইংরেজদের প্রতি সহৃদয় ভাবাপন্ন ছিল তারা প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের আক্রমণের লক্ষ্য হয় ("targets of attack in almost every place", p. 279)। শুধু তাই নয় গ্রন্থকার আবার ২৮৫ পৃষ্ঠায় আরও লিখেছেন যে, এমন কি অনেক স্থলে উপদ্রুত এলাকায়ও বহুলোক ইংরেজের প্রতি অনুগত ছিল। অথচ আবার ২৬১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখেছেন "the universal hatred of the English aliens gave the revolt of 1857 a national

colouring." ২৬১ ও ২৬৪ পৃষ্ঠায় লেখকের উক্তির সংগে ২৭৯ ও ২৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিত তাঁর কথাগুলি কি স্ব-বিরোধী উক্তি নয়? এত কথা, সাক্ষ্য ও নথিপত্রের উপর ভর করে যিনি গবেষণায় অগ্রসর হয়েছেন, কেন তাঁর পদে পদে এই দ্বিধাগ্রস্থ চরণবিক্ষেপ?

(খ) ২৫৮ পৃষ্ঠায় ডাঃ চৌধুরী লিখেছেন যে, মীরাটে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত হবার পরই বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লী অভিমুখে ধাওয়া করে, কারণ দিল্লীতে তখন সমাসীন ছিলেন বাহাদুর শা—"the emperor according to the Indian legitimists, which gave the movement a traditional country-wide base." ১৮৫৭ সনের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ভারতের রাষ্ট্রিক ঐতিহ্যপন্থীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বাহাদুর শাকে বিধিসংগত সম্রাট ("emperor") বলাতে এখানে আপত্তি তুলবেন অনেকেই। আউরংজেব মারা যান ১৭০৭ সনে। তারপর থেকে মোগল সাম্রাজ্য দ্রুতবেগে ধসে পড়তে থাকে। এই পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যের দিকে দিকে,—যেমন বাংলা অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে,—স্থানীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীনতার ঝাণ্ডা খাড়া করেন। ১৭৩৯ সনে নাদির শা'র ভারত আক্রমণ এই পতনের গতিকে তরান্বিত করে তোলে। ইতিমধ্যে গড়ে ওঠে দুর্দ্ধর্ষ মারাঠা জাতির সাম্রাজ্য। সমগ্র মহারাষ্ট্রে, দাক্ষিণাত্যের কতক অঞ্চলে ও উত্তর ভারতের কোন কোন এলাকায় উড়তে থাকে মারাঠা সাম্রাজ্যের বিজয় নিশান। কিছুদিনের জন্য মনে হয়েছিল যে, মারাঠারা বুঝি হবে রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে মোগল সম্রাটদের উত্তর-সাধক, কিন্তু সে আশা শীঘ্রই চিরতরে বিলীন হয়ে গেল। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পর ভারতের রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে দেখা দিল নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ—এককথায় "মাৎস্যন্যায়ের" অবস্থা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় "state of nature"। এই হলো প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের রাষ্ট্রিক ভারতের রূপ। তারপর এই পটভূমিতে শতধা বিচ্ছিন্ন, বিশৃঙ্খল ও অরাজক ভারতে গড়ে উঠলো ইংরেজ-সাম্রাজ্য নানা যুদ্ধ, কূটনীতি, অত্যাচার ও দিগ্বিজয়ের মধ্য দিয়ে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে এসে দেখা গেল ইংরেজ শক্তি এদেশে সর্বেসর্বা, প্রায় গোটা ভারত রাষ্ট্রিকভাবে ইংরেজ-শাসনে ঐক্য-গ্রথিত বা কবলিত। ১৮৫৭ সনে বিদ্রোহ সুরু হবার সময় মোগল রাজবংশের সর্বশেষ প্রতিনিধি, বাবর থেকে হিসাব করলে দ্বা-বিংশতিতম বংশধর, বাহাদুর শা নামে-মাত্র দিল্লীতে সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তার প্রকৃত শাসন ও এলাকা লাল-কেল্লার বাইরে বেশীদূর ছিল না। মীরাটে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলে ওঠার পরই সিপাহীরা দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হয় ও বাহাদুর শাকে দিল্লীশ্বর বলে ঘোষণা করে। কিন্তু বিদ্রোহীদের সকলেই কি বাহাদুর শাকে legitimate emperor of India বা ভারতের বিধিসংগত সম্রাট বলে স্বীকার করেছিল? কানপুরে বিদ্রোহ সুরু হলে

বিদ্রোহীরা যখন দিল্লীর অভিমুখে মীরাট-বিদ্রোহীদের পথ অনুসরণ করে অগ্রসর হতে চাইলো, তখন নানা সাহেব তাদের প্রতিনিবৃত্ত করলেন, বিদ্রোহীদের অগ্রগামী দলকে কানপুরে ফিরিয়ে আনলেন, আর সেখানে নিজেই জাক-জমকের মধ্যে "পেশোয়া" উপাধি গ্রহণ করেন। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেন, কানপুরের বিদ্রোহী দলকে দিল্লী অভিমুখে গমন থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য আজিমুল্লা খানের অংশই বেশী ছিল। প্রথমে হয়তো নানা সাহেবও দিল্লীর দিকে বিদ্রোহীদের পরিচালনা করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আজিমুল্লা খানের প্ররোচনাতেই তিনি প্রতিনিবৃত্ত হন (Eighteen Fifty-Seven, p. 138 দ্রষ্টব্য)। এ যদি সত্য হয়, তবে বুঝা যায় মুসলমান বিদ্রোহীদেরও সকলে ১৮৫৭ সনে বাহাদুর শাকে legitimate emperor of India বলে মনে করতো না—আর হিন্দু বিদ্রোহীদের বেশীর ভাগ লোক তো নয়ই। বিদ্রোহীদের সকলেই যদি বাহাদুর শাকে ১৮৫৭ সনে ভারতের বিধিসংগত সম্রাট বলে স্বীকার করতো, তবে বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান অধিনায়ক এমন আচরণ করলেন কেন? নানা সাহেবের আচরণ থেকে পরিষ্কার-ভাবে এই সত্য প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ দিনে যারা ভারতের রাষ্ট্রিকমঞ্চে "legitimists"-এর বা পুরাণো ঐতিহ্যপন্থীর ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে মতের ও আদর্শের মিল ছিল না, অন্ততঃ বাহাদুর শাকে ভারতের সম্রাট করার বিষয় নিয়ে। বিদ্রোহীদের একদল চেয়েছিল বাহাদুর শাকে কেন্দ্র করে মোগল সাম্রাজ্য পুনপ্রতিষ্ঠা করতে, আর বিদ্রোহীদের অন্যদল চেয়েছিল নানা সাহেবকে কেন্দ্র করে লুপ্ত মারাঠা সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে। কাজেই ডাঃ চৌধুরী বাহাদুর শাকে যে "the emperor according to the Indian legitimists" বলেছেন, তা মোটেই বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের কথা নয়। এই প্রসংগে ডাঃ মজুমদারের গ্রন্থের ১-২, ১২৭, ১৮৭-১৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(গ) ডাঃ চৌধুরী তাঁর গ্রন্থের ২৮৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের জনবিদ্রোহে রূপান্তরের বিষয়ে সমসাময়িককালে এবং পরবর্তীকালে অনেক দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। "The greatest protagonist of the theory that the revolt of 1857 was only a mutiny of the troops was William Muir···His thesis was that it was essentially a military mutiny, a stuggle between the government and its soldiers" (p. 284)। বিদ্রোহের স্বরূপ নিয়ে উইলিয়াম ম্যুরের অভিমত কি ছিল, সে প্রসংগে ডাঃ চৌধুরী একবার বল্লেন যে ম্যুরের মতে ১৮৫৭র বিদ্রোহ হলো নিছক সামরিক বিদ্রোহ ("only a mutiny of the troops"), আবার তার পরেই বল্লেন এ বিষয়ে ম্যুরের মত হলো, মূলত সামরিক বিদ্রোহ ("essentially a military mutiny")। এ দুই বস্তু কিন্তু এক নয়। ডাঃ চৌধুরীর ঐ উদ্ধৃতি

পাঠকদের পক্ষে স্পষ্টত বিভ্রান্তিকর—বিদ্রোহ বিষয়ে ম্যুরের কোন্ মতটি তা হলে সত্য তা কিন্তু বোঝা গেল না।

(ঘ) বিদ্রোহের স্বরূপ নির্ণয়ে ডাঃ মজুমদারের কোনো কোনো মতামত সৈয়দ আমেদ খান ও চার্লস্ রেকসের সমসাময়িক সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমেদের মূল বই লেখা হয় ১৮৫৮ সনে এবং এর ইংরেজী অনুবাদ কলকাতা থেকে বের হয় ১৮৬০ সনে (যদিও ডাঃ চৌধুরী তার গ্রন্থের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় ভুলক্রমে ১৮৭০ সন লিখেছেন)। ইংরেজী অনুবাদকের নাম ক্যাপ্টেন লিজ্ (Captain Lees)। রেক্সের বই বের হয় বিলাত থেকে ১৮৫৮ সনে। উভয় গ্রন্থই স্পষ্টত সিপাহী বিদ্রোহের একেবারে সমসাময়িক রচনা। ডাঃ মজুমদারের কোন কোন মত এই দুই সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রসংগে ডাঃ চৌধুরী নিজ গ্রন্থের ২৮৮ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন যে, বিদ্রোহের প্রকৃতি নির্ণয় ব্যাপারে যদিও ডাঃ মজুমদারের বিশ্লেষণ খুবই তীক্ষ্ণ ("very penetrating"), তথাপি তাঁর মতামত আমেদ খান ও রেকসের দ্বারা রঞ্জিত ("coloured"), অর্থাৎ ডাঃ চৌধুরী ঐ দুই সমসাময়িক ব্যক্তিদের লেখার ঐতিহাসিকতায় সন্দিহান। যেহেতু আমেদ বলেছেন যে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কোন অংশের জনতা বিদ্রোহী নেতাদের সাহায্যার্থে এগোয় নি (ডাঃ চৌধুরী মনে করেন এ ধারণা ঠিক নয়), অতএব ডাঃ চৌধুরীর যুক্তিশাস্ত্র অনুসারে আমেদ খানের বই নির্ভরযোগ নয় ("he cannot be regarded as a reliable authority", p. 288)। যেহেতু কোন লেখকের কোন রচনার বিশেষ একটা উক্তি বা অংশকে সঠিক বলে গ্রহণ করা যায় না, অতএব তার সমগ্র রচনাটাই নির্ভরযোগ্য নয় বলে ঘোষণা রাজনীতিকের সিদ্ধান্ত হলেও ঐতিহাসিকের তা সিদ্ধান্ত হতে পারে না। ঐতিহাসিকের দায়িত্ব বিচারকের দায়িত্বের মত সুমহান। একতরফাভাবে সাজানো আংশিক তথ্যের উপর নির্ভর করে কোনো পক্ষের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে ওকালতি করা তার ধর্ম নয়। রেক্সের বই সম্বন্ধেও ডাঃ চৌধুরীর আপত্তির কারণ হচ্ছে ঐ বই নাকি সুপরিচিত রাজকর্মচারীর (রেক্স্ তৎকালে আগ্রাতে জজিয়তি করতেন) সুরে লেখা। ডাঃ চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহকে দেখাতে চেয়েছেন জনপ্রিয় বা জাতীয় স্বাধীনতার লড়াই বলে, অথচ আমেদ ও রেকসের তথ্য ও সাক্ষ্য অনেকাংশেই বিপরীত। নিজ মত প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাঁদের দেওয়া সমসাময়িক সাক্ষ্য প্রতিকূল মনে হওয়াতেই ডাঃ চৌধুরী তাঁদের তথ্যবহুল ও মূল্যবান গ্রন্থদ্বয়ের ঐতিহাসিকতায় সন্দিগ্ধ হয়েছেন কিনা স্বতই এ প্রশ্ন পাঠকের মনে ওঠা স্বাভাবিক। আর এই আশংকা আরও দৃঢ় হয় যখন দেখি ডাঃ চৌধুরীও নিজ গ্রন্থে মাঝে মাঝে প্রয়োজনমত আমেদ ও রেকসের মতামত সত্য বলে গ্রহণ করতে সঙ্কোচ বোধ করেন নি—যেমন ৪ পৃষ্ঠায়, ১০ পৃষ্ঠায়, ৮২ পৃষ্ঠায়। প্রসংগত বলা প্রয়োজন যে, আমেদ ও রেকসের

বইয়ের সত্যতা সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করলেও, ভারতের দুই প্রধান ঐতিহাসিক ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেন কিন্তু এ ধরণের কোন সন্দেহের যুক্তিযুক্ত কারণ আছে বলে মনে করেন নি।

(ঙ) ডাঃ চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে সিপাহী বিদ্রোহের দিনে "Civil rebellion" বা অ-সামরিক জনগণের বিদ্রোহ সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কিন্তু এত বড় বইয়ে এই ধরণের আলোচনায় তৎকালীন অবস্থার বিপরীত দিকটারও বেশ কিছু আলোচনা থাকা যুক্তিযুক্ত ছিল অর্থাৎ বিদ্রোহের যুগে যে সকল ভারতবাসী ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ করার পরিবর্তে ইংরেজ শাসনের স্বপক্ষে সহায়তা ও শক্তি প্রয়োগ করেছিল তাদের কথা। তাহলেই পাঠকেরা বুঝতে পারতো ভারতীয় জন-সাধারণের তৎকালে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব ও কর্ম-প্রচেষ্টা তুলনায় কিরূপ ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পেছন-পেছন অ-সামরিক লোকেরাও অনেক স্থানে বিদ্রোহ করেছিল। এটা একটা জ্ঞাতব্য তথ্য আর সেই তথ্য তো বহুপূর্বে-লেখা নর্টনের The Rebellion in India (1857) ও Topics for Indian Statesmen (1858) বই থেকেও কম বেশী পেয়েছি, এবং যার আরও বেশী পরিচয় ডাফ (Duff), কায়ে (Kaye), ম্যালিসন (Malleson) প্রভৃতির রচনায়ও পেয়েছি। ডাঃ চৌধুরী সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকেই বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছেন ও সেই আলোচনা থেকে নিজ সিদ্ধান্ত টেনেছেন। কিন্তু ১৮৫৭ সনের ঘটনার প্রকৃতি ও বহরকে সঠিকভাবে বুঝাবার জন্য তাঁর উচিত ছিল উক্ত ঘটনার অনুকূলে যে সকল শক্তি, অবস্থা ও ব্যক্তি ক্রিয়া করে নি বা বিরোধিতা করেছিল, সে-সকল উপাদানেরও তুলনায় সমালোচনা করা। আর তাতেই সত্যে পৌঁছাবার পথও সুগম হতো আর লেখকের মতামতের মধ্যেও নিঃসক্তুতা বা নির্লিপ্ততা প্রকাশ পেতো। ডাঃ মজুমদার তাঁর গ্রন্থে এবিষয়ে যতটুকু খেয়াল রেখেছেন (মর্টন ও রেকসের বিরুদ্ধ মতামত সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা ২১৪-২৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য), ডাঃ চৌধুরী তা পারেন নি। যে সকল সমসাময়িক সাক্ষ্য-দলিল তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারেন নি, সেগুলির সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণের পরই ডাঃ মজুমদার ঐরূপ বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত করেছেন—কিন্তু বিচারের আগে নয়। কিন্তু ডাঃ চৌধুরী এতটা যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় অনেকক্ষেত্রেই দিতে অপারগ হয়েছেন। যে সকল সমসাময়িক সাক্ষ্য তাঁর নিজ বক্তব্যের অনুকূল বলে মনে হয় নি বা প্রতিকূল বলে মনে হয়েছে, সেগুলিকেও তিনি যে যথাযথ যুক্তি ও বিচারের পর বাতিল করেছেন তা কিন্তু মনে হয় না। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ তাঁর সৈয়দ আমেদ ও চার্লস্ রেকস্ সম্বন্ধে তথ্যহীন উক্তি ও "Native Fidelity" বইয়ের প্রতি তাঁর সজ্ঞান উপেক্ষা।

ডাঃ চৌধুরীর বৃহদাকার বইয়ের মধ্যে মাত্র একটি বারের জন্য Native Fidelity বইয়ের নামোল্লেখ পাদটীকায় দেখা যায়, যদিও এ বইয়ের তথ্য তাঁর

গ্রন্থে প্রায় ব্যবহৃত হয় নি বললেই ঠিক বলা হয়। ২৮৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ডাঃ চৌধুরী Native Fidelity during the Mutiny : The Mutinies and the People (1859) গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, যদিও গ্রন্থের প্রকৃত নাম হলো The Mutinies and the People or Statements of Native Fidelity Exhibited during the Outbreak of 1857-58। জনৈক হিন্দু কর্তৃক লিখিত বলে শুধু বইয়ের গোড়ায় উল্লেখ আছে অর্থাৎ বইখানি বেনামীতে প্রকাশিত হয়। এর পুনর্মুদ্রণ বের হয় ১৯০৫ সনের জুলাই মাসে কলকাতা থেকে—"By a Hindu"—এই নামে। ৩৩২ পৃষ্ঠায় বইখানি সমাপ্ত। এই বইয়ের লেখক হিসাবে ডাঃ চৌধুরী ২৮৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায় শম্ভু চরণ মুখোপাধ্যায়ের ("চরণের" বদলে "চন্দ্র" হবে) নামোল্লেখ করেছেন। তথ্য ভুল। ডাঃ সেনের গ্রন্থেও (পৃঃ ৪০৮) অনুরূপ ভুল লক্ষণীয়। মনে হয় ডাঃ সেনের তথ্যের উপর নির্ভর করাতেই এক্ষেত্রে ডাঃ চৌধুরীও ভুল খবর পরিবেশণ করেছেন। প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বলেন "আমি এবিষয়ে একেবারে definite যে ঐ বইয়ের আসল লেখক হলেন কৃষ্ণদাস পাল। যে শম্ভু চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯-৯৪) হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর মাত্র কিছুদিনের জন্য 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদকতা করেন, তিনি এ বইয়ের লেখক নন। হরিশচন্দ্রের সম্পাদনাকালে মিউটিনির সময়েই কৃষ্ণদাস বাবুর বহু লেখা 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশিত হয়। ঐ লেখাগুলিই অনেকটা একত্র করে পরে Native Fidelity বই তৈরী হয়।" এই প্রসংগে ১৮৯৭ সনে বিলাত থেকে প্রকাশিত Representative Indians গ্রন্থে জি. পি. পিল্লাইয়ের মন্তব্যও (পৃঃ ৫০-৫১) প্রণিধানযোগ্য। কৃষ্ণদাস পালের সম্বন্ধে পিল্লাই লিখেছেন যে, "হিন্দু পেট্রিয়টে" প্রকাশিত তাঁর মিউটিনি সংক্রান্ত ধারাবাহিক লেখাগুলি পড়ে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাকি বলেছিলেন যে কৃষ্ণদাস বাবু "would be able to do much for his country, if God spared him" অর্থাৎ ভগবান তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলে তিনি দেশের অনেক কাজে লাগবেন। পিল্লাই আরও লিখেছেন যে, তৎকালেই কৃষ্ণদাস পালের বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকখানা পুস্তকও বের হয়েছিল, তার মধ্যে একখানার নাম ছিল The Mutinies and the People অর্থাৎ ১৮৫৯ সনে বেনামীতে প্রকাশিত বইয়ের আসল নামকরণ যা তাই, যদিও সংক্ষেপে এই বই Native Fidelity বলে পরিচিত। ১৯০৫ সনে এই বইয়ের পুনর্মুদ্রণ কালে প্রকাশক ভূমিকায় লিখেছিলেন যে এই বইয়ের অজ্ঞাতনামা হিন্দু লেখক হলেন একজন ভারতীয় সাংবাদিক ("an Indian Journalist")। শ্রদ্ধেয় হেমেনবাবুর মতে, এই ভারতীয় সাংবাদিক কৃষ্ণদাস পাল ছাড়া আর কেউ নন। সুবল চন্দ্র মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধানে (সপ্তম সংস্করণ, ১৯৩৬, পৃঃ ১১৭৩) শম্ভুচন্দ্রের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া আছে, তাতেও তাঁর নামে Native Fidelity গ্রন্থের কোন উল্লেখ

নেই—উল্লেখ আছে On the causes of the Mutiny (১৮৫৭) নামক গ্রন্থের। উক্ত অভিধানের সপ্তম সংস্করণ যিনি সম্পাদনা করেন, সেই প্রকাশচন্দ্র দত্ত ছিলেন শম্ভুচন্দ্রের দীর্ঘদিনের পুরানো বন্ধু। হেমেনবাবু বলেন, অন্য বিষয়ে ভুল হলেও শম্ভুচন্দ্র সম্বন্ধে প্রকাশবাবুর কোন ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। এই সকল তথ্য থেকে স্পষ্ট সূচিত হয় Native Fidelity গ্রন্থের প্রকৃত লেখক কৃষ্ণদাস পাল। কৃষ্ণদাস পাল হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরই "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন ও দীর্ঘকাল ধরে ঐ পত্রিকা বিশেষ যোগ্যতার সংগে পরিচালনা করেন ও মিঃ ইলবার্টের মতে তিনি ঐ সংবাদপত্রকে দেশী পত্রিকাগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় করে তোলেন ("raised it from a nearly moribund condition to the first place among native Indian journals")। পিল্লাই বলেন যে কৃষ্ণদাস পাল তাঁর "moderation of his views and the sobriety of his criticism"-এর জন্য তৎকালে বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে সরকারের সংগে তাঁর মতের সংঘর্ষ ("conflict") উপস্থিত হতো। এই কৃষ্ণদাস পালই ১৮৭৪ সনে "হিন্দু পেট্রিয়টের" মূল সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "Home Rule for India" বা ভারতবর্ষের জন্য স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি উত্থাপন করে লিখেছিলেন: "Our attention should be directed to Home Rule for India, to the introduction of constitutional government for India in India···If taxation and representation go hand in hand in all British Colonies, why should this principle be ignored in British India?"

এহেন বিশিষ্ট ব্যক্তির লেখা Native Fidelity গ্রন্থ ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের স্বরূপ বিশ্লেষণের পক্ষে যারপরনাই মূল্যবান। এতে আছে বিদ্রোহের দিনেও এদেশবাসীর ইংরেজ-আনুগত্যের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য হলো যে ১৮৫৭ এর বিদ্রোহে সাধারণ লোকেরা বিদ্রোহ ও বৈরীতার ভাবে ও কর্মে অংশ গ্রহণ করে নি ("the feeling of revolt and disloyalty was not shared in by the masses of the people", p. 4)। এই মত লেখক লণ্ডন টাইমস্ এগিনবার্গ রিভিয়ু, ইংলিশম্যান পত্র ও সরকারী গেজেট থেকে ইয়োরোপীয়ানদের ভারতবাসী সম্বন্ধে নানা স্বীকারোক্তি তুলে তুলে প্রচুর তথ্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অর্থাৎ ডাঃ চৌধুরীর বইয়ে যেটা তাঁর প্রধান বক্তব্য তারই বিরুদ্ধে যায় এই বইয়ের সাক্ষ্য আগাগোড়া। অথচ এমন একখানা তথ্যবহুল গ্রন্থের সন্ধান পাবার পরও কেন যে ডাঃ চৌধুরী এমনভাবে এর গুরুত্ব উপেক্ষা করলেন, তা বুঝা গেল না। ১৮৫৮ সনে নর্টনের লেখা Topics for Indian Statesmen গ্রন্থে বিদ্রোহ সম্বন্ধে যে সকল মতামত ব্যক্ত হয়েছিল, তার অনেকগুলির বিরুদ্ধেই কৃষ্ণদাস পালের Native Fidelity গ্রন্থ এক বিরাট সমসাময়িক প্রতিবাদ বিশেষ।

আতঙ্কগ্রস্ত ইউরোপীয়ানদের মনোভাব নিয়ে যে নর্টনের ঐ বই লেখা, তা তৎকালেই কৃষ্ণদাস বাবু উল্লেখ করেছিলেন।

ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেন উভয়েই দেখিয়েছেন যে, ১৮৫৭ এর বিদ্রোহ নিছক সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহ ছিল না, সে-আবহাওয়ায় কোনো কোনো অঞ্চলে অসামরিক অভ্যুত্থানও লক্ষণীয়। কিন্তু তাঁরা বলেন, এই বিদ্রোহের স্বরূপ ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, ধ্বংসোন্মুখ সামন্ততন্ত্রের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের সর্বশেষ ব্যর্থ প্রচেষ্টা— ডাঃ মজুমদারের ভাষায় "the dying groans of an obsolete aristocracy" (p. 241). ডাঃ চৌধুরীর বইয়ে ২৯৫ পৃষ্ঠায় "obsolete aristocracy"-র বদলে "obsolete autocracy" উদ্ধৃত করা হয়েছে। খুব সম্ভব এটা মুদ্রণ-প্রমাদ। ডাঃ চৌধুরীর মত ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেনের ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ তাঁর মতে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ হলো প্রগতিশীল আন্দোলন, অনেকাংশে জাতীয় আন্দোলন, জনগণের স্বাধীনতার লড়াই। ডাঃ চৌধুরী এই আন্দোলনের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন "rising of the people" (p. 260), "national colouring" (p. 261), "the people in general were in sympathy with the rebels" (p. 262), "a vague feeling of patriotism" (p. 263), "co-operation of the general mass of the people, the country people, the villagers of different social status" (p. 275), হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা "to shake off the fetters of British rule" (p. 281)। এই ধরনের নানা কথা লেখার পর তিনি ঐ বিদ্রোহ সম্বন্ধে শেষ মন্তব্য লিখেছেন : "The revolt of that year appears to have been the first combined attempt of many Classes of people to challenge a foreign power. This is a real, if remote, approach to the freedom movement of India of a later age···Who knows that the inception of the nationalist movement was not contained in the rising of 1857 after the fashion of the oak in the acorn ? Because the revolt of 1857 was not merely anti-British but a movement expressing profound desires for freedom" (pp. 297-299)।

এবার বিচার করে দেখা যাক্‌, সত্যই ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ প্রগতিমূলক ছিল, না প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। এই প্রশ্নের সদুত্তর বহুলাংশে নির্ভর করে প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল এই দুই পরিভাষা কি অর্থে ব্যবহার করা হয় তার উপর। অর্থাৎ এ আলোচনা খানিকটা দার্শনিক গবেষণার বিষয়। সমাজ স্থাণু নয়—চিরচঞ্চল তার গতি ও প্রবাহ। প্রগতি বা উন্নতি বললেই সূচিত হয় পরিবর্তন বা অবস্থান্তর, কিন্তু যে কোন পরিবর্তনই প্রগতি বা উন্নতির লক্ষণ নয়। উন্নতির জন্য বা জীবনবিকাশের জন্য

অনেক সময়ই প্রচলিত বিধি ও আইন ভাঙার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যদিও যে-কোন আইন লঙ্ঘনকারীই বা সমাজ-বিদ্রোহীই উন্নতির সহায়ক বা প্রগতির ধারক ও বাহক নয়। স্বভাবতই তা হলে প্রশ্ন উঠবে, প্রগতি বা উন্নতি বলে কাকে? কিসের দ্বারা সূচিত হয় কোন ঐতিহাসিক আন্দোলন প্রগতিমূলক অথবা প্রতিক্রিয়াশীল কিনা? ইতিহাসে কোন আন্দোলনের স্বরূপ ও প্রকৃতি বুঝা যায় ঐ অন্দোলনের উদ্দেশ্য ও আদর্শের বিশ্লেষণ থেকে, নেতৃত্ব কোন উপাদানে গঠিত ছিল তার পরিচয় থেকে, এবং ভবিষ্য ফলাফল থেকে এবং আন্দোলন ব্যর্থ হলে সম্ভাব্য ফলাফল থেকে। ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহের মধ্যে ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রবল ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। নানা কারণে বিভিন্ন শ্রেনীর লোকদের মনে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, ইংরেজ-বিরোধী অসন্তোষ সৃষ্ট হয়। দেশীয় রাজন্যবর্গের অনেকে ইংরেজ-শাসনে অসন্তুষ্ট বা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ডালহাউসির স্বত্ব বিলোপ নীতি ও রাজ্যদখলের নীতি অনুসরণের ফলে। অভিজাতশ্রেণীর লোকেরা ও স্থানীয় প্রধানেরা বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তাদের সম্পত্তি ও জমিদারী হস্তচ্যুত হওয়ার দরুণ। ইংরেজশাসনের নানা উদারনৈতিক সংস্কারমূলক প্রচেষ্টায় রক্ষণশীল, ঐতিহ্যপন্থী জনসাধারণও ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সামরিক বাহিনীতে সিপাহীদের ধূমায়িত অসন্তোষের মধ্যে অর্থ-নৈতিক উপাদান থেকেও ("grievances of the ordinary type regarding pay and conditions of service") ধর্মগত কারণ ছিল প্রবলতর। সিপাহীদের প্রতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের দুর্ব্যবহার, নিম্নপদস্থ অফিসারদের নৈতিক মানদণ্ডের অবনতি, সেনাবাহিনীতে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলার ক্রমবর্দ্ধমান অভাব, ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ, উচ্চ সরকারী পদ থেকে দেশীয় লোকদের অবাঞ্ছিত বর্জননীতি, ব্রিটিশ আইন-কানুনের বা বিচার পদ্ধতির জটিলতা, ভূমি-বিক্রয়ের নতুন নতুন আইন, পল্লী অর্থ-নীতিতে ভাঙন এবং সর্বোপরি ধর্মচ্যুতি ও জাতিচ্যুতির আশংকা—এই সকল রকমারি কারণে ১৮৫৭ সনে আমরা দেখি ভারতবর্ষের নানা শ্রেনীর বহুসংখ্যক লোকই ইংরাজশাসনে অসন্তুষ্ট, বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়ে উঠেছে। তাই ১৮৫৭ সনের অভ্যুত্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকই বিভিন্ন কারণে ইংরেজের বিরুদ্ধে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। এর মধ্যে রাজন্যবর্গ, অভিজাত শ্রেণী, তালুকদার সিপাই ও জনসাধারণ—সকল শ্রেণীর লোকই অংশ গ্রহণ করে, সর্বত্র না হলেও অন্ততঃ কোন কোন অঞ্চলে—যেমন অযোধ্যা ও শাহাবাদ এলাকায়। কিন্তু এই সকল সীমাবদ্ধ অঞ্চলেও বিদ্রোহের অংশীদারীদের চিন্তা ও কর্ম ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা অর্জন ও সংরক্ষণের চেষ্টা থেকে কোন মহত্তর বা বৃহত্তর লক্ষ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নি। এক সাধারণ ইংরেজ-বিদ্বেষ (common anti-British hatred) সকল বিদ্রোহীদের মধ্যে এক ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করলেও, গভীর স্বার্থের অমিল,

আদর্শ ও লক্ষ্যের ভয়ঙ্কর বিভিন্নতা স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠে। যে ধর্মভয় ও জাতিচ্যুতির ভয় সামরিক ও অসামরিক বিদ্রোহীদের সকলের মনেই কমবেশী অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল, যে ধর্মগত ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহী নেতারা ফতোয়ার পর ফতোয়া জারি করেছিলেন হিন্দু-মুসলমানকে একতাবদ্ধ করে বিধর্মী খৃষ্টান, বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য, তাতেও দুর্বলতা দেখা দিল মারাত্মক ভাবে। ডাঃ মজুমদার তাঁর গ্রন্থের ২২৭-২৩৪ পৃষ্ঠায় নানা সমসাময়িক সাক্ষ্য ও প্রমাণযোগে দেখিয়েছেন যে মহাবিদ্রোহের দিনে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরাই ছিল বেশী বিদ্রোহী ভাবাপন্ন ("comparatively more rebellious") এবং বিদ্রোহের অগ্নিযুগেও হিন্দু-মুসলমান শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম চালনা করতে পারে নি। অন্যত্র তো দূরের কথা দিল্লী নগরীতেও—যে দিল্লী ইরেজদের দ্বারা অবরুদ্ধ হতে চলেছে এবং যে দিল্লীর নিরাপত্তার উপর সংগ্রামের ভবিষ্যৎও বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল সেখানেও—দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা মিলিত হতে পারে নি। দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমানের যে বিরুদ্ধ পারস্পরিক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়, বারানসীতেও তাই। যুক্ত প্রদেশের বহুস্থানে—বেরিলি, বিজনোর, মোরাদাবাদ অঞ্চলে—হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে কুৎসিত রূপ গ্রহণ করে। এমন কি অযোধ্যাতেও এই হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়গত বিদ্বেষ প্রবল ছিল। অথচ সকলের স্বাধীনতা হরণকারীই হলো সেদিন বিধর্মী, বিদেশী ইংরেজ শাসক। কিন্তু তবু ঐতিহাসিক নানা কারণে হিন্দু-মুসলমানের জাতিগত বিদ্বেষ তখনও ভয়াবহরূপে বর্তমান ছিল—এমন কি ১৮৫৭ সনেও। তাই রাজপুত শিখ ও মারাঠারা বাহাদুর শাহের নামে মুসলমান বিদ্রোহীদের সংগে মিলিত হতে পারলো না। বরং শিখরাই (গুর্খাদের সংগে মিলিত হয়ে) সেদিন ইংরাজকে সাহায্য করেছিল বিদ্রোহ দমন করতে। ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত বা দলগত স্বার্থের তাগিদ ছাড়া বা তার অতিরিক্ত কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্য বা আদর্শ সেদিন বিদ্রোহীদের উদ্বুদ্ধ করে নি। যে স্বদেশ-বাৎসল্য বা দেশপ্রেমের কথা রামমোহনের পর রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রচার করেন, সেই দেশাত্মবোধ, ভারতবর্ষকে জননী জন্মভূমি জ্ঞানে সেবার যে আদর্শ, তা বিদ্রোহ-দিনে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী বা সমর্থকদের মনে তখনও স্থানলাভ করে নি। বঙ্কিমচন্দ্র মহাবিদ্রোহের বহুদিন পরে লিখেছিলেন: "এ ধর্ম অনেকদিন হইতে বাঙালা দেশে ছিল না, কখনও ছিল কিনা বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি বা আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত। ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় নহে— অনেক নিকৃষ্ট" (হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "কংগ্রেস ও বাঙ্গালা", ১৯৩৬, পৃঃ ৯-১০ ও ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এবার বিবেচ্য মহাবিদ্রোহের নেতৃত্ব ছিল কোন ধরণের? বিদ্রোহ যেখানে —যেমন অযোধ্যা ইত্যাদি অঞ্চলে—উল্লেখযোগ্য ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লাভ করে সেখানে বিদ্রোহে সিপাহীদের ছাড়া অংশ নেয় রাজন্যবর্গ, তালুকদার ও জনসাধারণ। জনসাধারণ তো বিপ্লবের হাতিয়ার। তারা ভাঙে, তারা গড়ে। সিপাহীরা লড়াইয়ে নেমেছিল, সাময়িক কারণে, ব্যক্তিগত বিক্ষোভে, তালুকদারেরাও তাই, রাজন্যবর্গেরাও তাই। জনসাধারণ নানা কারণে, বিশেষ করে ইংরাজ সরকারের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতিবাদে, বিক্ষুব্ধ, বিচলিত হয়ে ছিল। তার উপর ছিল বৃটিশ শাসনের আওতায় এদেশে অর্থনীতির রূপান্তর ও তজ্জনীত তাদের দুর্ভোগ ও দুর্দশা। তাই তারাও ইংরেজ-বিরোধিতায় সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে, কখনো প্ররোচনায়, কখনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কিন্তু এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ হলো বিদ্রোহী সিপাহীরা। আর রাষ্ট্রিকভাবে তাদের নেতৃত্বভার শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছিল রাজন্যবর্গ ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা। একদল বিদ্রোহী চাইলো বাহাদুর শাকে "সম্রাট" করে মোগল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার, আবার আর একদল চাইলো নানা সাহেবকে "পেশোয়া" করে মারাঠা-সাম্রাজ্যের পুনপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু মহৎ লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করার মতো যোগ্যতা না ছিল বাহাদুর শাহের, না ছিল নানা সাহেবের। তারা চেয়েছিল ও সেই সংগে সামন্ত শ্রেণীর লোকেরাও চেয়েছিল অষ্টাদশ শতকের স্বাধীনতা ফিরে পেতে অর্থাৎ বিশৃঙ্খল, অরাজকতাপূর্ণ প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের রাষ্ট্রিক অবস্থার প্রত্যাবর্তন করতে। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার পটভূমিতে ঐক্যবদ্ধ, সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠাকে যদি প্রগতি বলে স্বীকার করি (ইয়োরোপের ইতিহাসে ঐতিহাসিকগণ এই বিবর্তনকে প্রগতিশীল অভিব্যক্তি বলেই স্বীকার করে থাকেন), তাহলে একথা মানতেই হবে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর অরাজকতার বা মাৎস্যন্যায়ের পটভূমিতে ভারতবর্ষে প্রাক্-১৮৫৭র যুগে ইংরেজ শাসন ও সাম্রাজ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ছিল রাষ্ট্রিকক্ষেত্রে প্রগতিশীল অভিব্যক্তি। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের নায়কগণ ভাঙতে চেয়েছিল ইংরেজ শাসনের ঐ কাঠামো। কাজেই রাষ্ট্রিকক্ষেত্রে ঐ প্রচেষ্টাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা ছাড়া উপায় নেই।

মধ্যযুগের অরাজকতার পটভূমিতে দৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠাই প্রগতির বাহন। কিন্তু একবার যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, সেখানে সেই রাজশক্তিকে স্বৈরাচারের পথ থেকে নিয়মতান্ত্রিকতার পথে পরিচালিত করাই আবার প্রগতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের তুলনায় ভারতে রাষ্ট্রিকক্ষেত্রে ইংরেজ নেতৃত্বে উনবিংশ শতকে ১৮৫৭ সন পর্যন্ত যে বিবর্তনের ধারা তা প্রতিক্রিয়াশীল ছিল না, ছিল প্রগতিমূলক। কিন্তু বিদ্রোহোত্তর যুগে (১৮৫৭-১৯০৫) দেশের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়, নিয়মতান্ত্রিক শাসনের আদর্শ বহু

লোকের চেতনায় ধাক্কা দেয়, রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার ও স্বরাজের আকাঙ্ক্ষাও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। একবার এই মনোভাব ও আদর্শ দেশের মধ্যে বিবর্তিত হয়ে গেলে, ঐ পথ ধরে নব আদর্শের সন্ধানে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টাই প্রগতি —অভাব বা বিরোধিতাই প্রতিক্রিয়া। রামমোহন থেকে সুরেন ব্যানার্জী পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় জননায়ক এদেশে ইংরেজ শাসনের প্রতি কমবেশী সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিলেন। জে. কে মজুমদার সম্পাদিত Indian Speeches and Documents on British Rule, 1821-1918 (কলিকাতা, ১৯৩৭) গ্রন্থে এর বহু সাক্ষ্য ধরে রাখা আছে। তারা মোটের উপর ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নৈতিক বৈধতায় বিশ্বাসী ছিলেন, অথচ যুগের মাপকাঠিতে সমাজচেতনা বা রাষ্ট্রিক অধিকারের বোধ তৎকালে এদের মনে কারো থেকে কিছুমাত্র কম ছিল না। ১৯০২ সনের আমেদাবাদ কংগ্রেসেও সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজের বিরুদ্ধে নানা অভাব-অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারতে বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্ব কামনা করেছিলেন। কিন্তু ১৯০৮ সনে অরবিন্দ ঘোষ ভারতে ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "A nation politically disorganised, a nation morally corrupted, intellectually pauperised, physically broken and stunted is the result of a hundred years of British rule, the account which England can give before god of the trust which He placed in her hands." এ হলো ১৯০৫-০৬ সনের বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভংগী—উনবিংশ শতকের ভারতীয় দৃষ্টিভংগী নয়,—আর প্রাক্-১৮৫৭ সনের দৃষ্টিভংগী তো কোনমতেই নয়। অথচ পটভূমি সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকার ফলেই আর একালের চোখ দিয়ে সেকালের ভারতীয় দৃষ্টিভংগী দেখার ফলেই বহু পণ্ডিত ব্যক্তিও আজ গোলে পড়েছেন। প্রাক্-১৮৫৭ সনের ভারতে ইংরেজ শাসন কেবল শোষণ আর যথেচ্ছারিতা, অতএব প্রতিক্রিয়াশীল, এই ভ্রান্ত ধারণার মোহে সমাচ্ছন্ন থাকার দরুণই আজও বহু পণ্ডিত ও গবেষক মনে না করে পারেন না যে ইংরেজ-বিরোধী, ইংরেজ সাম্রাজ্য বিরোধী ভারতীয় বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থানই বুঝি প্রগতির বাহক। ১৮৫৭ সনের ইংরেজ শাসন প্রাক্-ইংরেজ যুগের তুলনায় মোটেই প্রতিক্রিয়াশীল ছিল না, বরং ছিল অনেক বেশী প্রগতির সহায়ক। কাজেই সেদিনের ইংরেজ-বিরোধী মহাবিদ্রোহকে, এমনকি অযোধ্যার অভ্যুত্থানকেও, প্রগতিমূলক আন্দোলন বলতে পারি না। কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে দিয়ে অষ্টাদশ শতকের স্বাধীনতায় অর্থাৎ মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অরাজকতায় প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা ইতিহাসের বিচারে প্রতি-বিপ্লব। যে কারণে সপ্তদশ শতকের ফ্রান্সে Fronde-এর মতো ব্যাপক অভ্যুত্থানও প্রতিক্রিয়াশীল, ঠিক সে-কারণেই উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রিক পরিবেশে ১৮৫৭-র ইংরেজ-বিরোধী অভ্যুত্থানও প্রগতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়া।

আর একটা কথা। ভারতে ইংরেজ শাসনের শোষণটাই একমাত্র সত্য নয়, ইংরাজশাসনে আমরা পেয়েছিলাম পাশ্চাত্য সভ্যতার নতুন আলোক—পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য সাহিত্য, পাশ্চাত্য সমাজ দর্শন, পাশ্চাত্য যন্ত্রশিল্প, এক কথায় বলা যেতে পারে আধুনিকতার ধারা ও প্রবাহ। ইংরেজ শাসনে এদেশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে উদারনৈতিক পরিবর্তন বা বিপ্লব হতে সুরু করে, তার গতিকে তরান্বিত করা নয়, ব্যর্থ করাই ছিল বিদ্রোহীদের তৎকালে প্রধান লক্ষ্য। ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ততটা ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে নয়, যতটা তার আমদানী-করা বা প্রবর্তিত আধুনিক উদারনৈতিক নূতন সমাজ-দর্শন, নূতন শিক্ষা, নূতন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। উনবিংশ শতকে ইংরেজ-প্রবর্তিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারাকে যদি প্রগতিশীল বলে স্বীকার করি—তৎকালের যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, রামগোপাল, হরিশচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই একথা স্বীকার করেছিলেন—তবে সাংস্কৃতিক দিক থেকেও ১৮৫৭র বিদ্রোহকে প্রতিক্রিয়াশীল বলতে হয়। ডাঃ চৌধুরী নিজ গ্রন্থে ২৭৪ পৃষ্ঠায় যে লিখেছেন : "The movement was a challenge to the British system of law, revenue, production and property relations," তা কিন্তু সত্য বলে মনে হয় না। ইংরেজ-বিরোধী তৎকালীন যে অভ্যুত্থান তা আসলে ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর নানারূপ ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ দূর করবার জন্য প্রচেষ্টা, কিন্তু মূলত বৃটিশ সরকার বা সেই সরকার প্রবর্তিত আইন-ব্যবস্থা, রাজস্ব-ব্যবস্থা, উৎপাদন-ব্যবস্থা, সম্পত্তিগত অধিকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়। অর্থাৎ বিদ্রোহীগণ নির্দিষ্ট কতকগুলি অভাব-অভিযোগ দূর করতে চেয়েছিল এক মরীয়া অবস্থায় ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে, কিন্তু গোটা ইংরাজ শাসনকে উৎখাত করে সমাজ-বিপ্লবের পথে পা বের করে নি। অর্থাৎ যে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আজ ১৯৫৭ সনেও আমরা জাতি হিসাবে দাঁড়াতে পারলুম না, সেটা ১৮৫৭ সনেই ঘটে যাবার উপক্রম হয়েছিল মনে করলে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা করা হবে। আর যদি সত্য সত্যই ১৮৫৭-এর বিদ্রোহ "British system of law, revenue, production and property relations"-এর বিরুদ্ধে চালিত হয়ে থাকে, তবে তো তা স্পষ্টত প্রগতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়া। ডাঃ চৌধুরীও এই প্রসংগে যা লিখেছেন তার থেকে এ সিদ্ধান্ত দৃঢ়তর হয়। তাঁর গ্রন্থের ২৭৩-৭৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : "Ideas of a free and independent government meant nothing further than the restoration of the power of the local chiefs and were not conceivalo in the context of the repu diation of the monarchical principle. India in the mid-nineteenth century did not possess the material requisites for advanced

political ideas and the insufficiency of her economic life rendered impossible any real extension of the revolution.”

তৎকালে রাষ্ট্রিক চেতনা-সম্পন্ন ও ভবিষ্য উন্নতি বা প্রগতির দৃষ্টি-সম্পন্ন যে একটিমাত্র বিশিষ্ট শ্রেণী এদেশে দেখতে পাই তা হলো ইংরেজী-শিক্ষিত নবোত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইংরেজ শাসনে এই শ্রেণীর বিবর্তনকে রাজা রামমোহন রায় উনিশ শতকের প্রারম্ভেও সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছিলেন এই মনে করে যে জাতীয় উন্নতির ধারক ও বাহক হবে এই শ্রেণীর লোকেরাই। কাজেই ইংরেজ শাসনে এই শ্রেণীর অভ্যুদয়ে তাঁর খুশী হবার কারণ ছিল যথেষ্ট। রামমোহন ইংরেজ শাসনের গুণকীর্তন করলেও, তিনি চিরদিনের জন্য ভারতে বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্ব কামনা করেন নি। ভবিষ্য ভারতের স্বাধীন মূর্তিও তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠেছিল। বিলাতে থাকাকালীন রামমোহন রায় নাকি তাঁর সেক্রেটারী আর্ণটকে বলেছিলেন যে, আগামী চল্লিশ বৎসরের জন্য ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রয়োজন আছে (Commemoration Volume of the Rammohun Ray Centenary Celebrations, Calcutta, 1935, Part II, pp. 95-96-এ বিপিন পালের প্রবন্ধ পঠিতব্য)। রামমোহনের স্বাধীনতাপ্রীতি শুধু ধর্মক্ষেত্রেই গণ্ডীবদ্ধ ছিল না, রাজনীতি-ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছিল। হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বলেন: “অন্যান্য কথা ত্যাগ করিলে আমরা তাহার প্রবল অভিব্যক্তি দেখিতে পাই—১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সরকার কর্তৃক সংবাদপত্রের অধিকার-সঙ্কোচক ব্যবস্থার প্রতিবাদে” (কংগ্রেস ও বাঙ্গালা, পৃঃ ৩৭)। এদেশে সংবাদপত্র প্রথম ইয়োরোপীয়ানদের দ্বারাই প্রবর্তিত হয় এবং প্রথম যুগের পত্রগুলিতেও অনেক সময় সরকারের উপর এমন তীব্র আক্রমণ থাকতো যে সমালোচনায় অসহিষ্ণু রাজপুরুষেরা সংবাদ-পত্র দলনের চেষ্টায় ব্রতী হন। ১৮২৩ সনের ১৫ই মার্চ সরকারপক্ষ তৎকালীন নিয়মানুসারে এক কঠোর আইনের খসড়া প্রস্তুত করে কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থাপিত করে। ইহারই ঠিক দুই দিন পরে উক্ত আইনের খসড়ার প্রতিবাদে আদালতে এদেশবাসীর পক্ষ থেকে এক দরখাস্ত পেশ করা হয়। দরখাস্তকারীদের মধ্যে চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন। “দেখা যাইতেছে, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসঙ্কোচ চেষ্টার প্রতিবাদে রামমোহন একক ছিলেন না, পরন্তু আরও ৫ জন বাঙ্গালী তাঁহার সহকর্মী হইয়াছিলেন। ইঁহারা যে দরখাস্ত পেশ করেন তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারা স্বাধীনতার কিরূপ অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন” (কংগ্রেস ও বাঙ্গালা, পৃঃ ৩৭-৩৯)। আবার এই ঘটনারও প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সরকার যখন সভা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেছিল তখনও ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে কেহ কেহ—যেমন দ্বারকানাথ

ঠাকুর, তাঁর দুই আত্মীয় ও তাঁর বন্ধু রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তি একযোগে এই সরকারী আদেশের প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করেছিলেন।

১৮২৩ সনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক দেশবাসীর চেষ্টা ব্যর্থ হলেও ১৮৩৫ সনে চার্লস্ মেট্‌কাফ্ বড়লাট হয়ে ভারতে এসে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন। তাঁর এই আচরণে বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারেরা তাঁর উপর বিরক্ত হলে তিনি পদত্যাগ করার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। কিন্তু এদেশের লোকেরা মেটকাফ্‌কে শুধু অভিনন্দিত করেই ক্ষান্ত থাকে নি, অর্থ সংগ্রহ করে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি বৃহৎ সৌধও নির্মাণ করে।

এদিকে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের সংগে সংগে দেশাত্মবোধের উন্মেষও দেশবাসীর মনে জাগ্রত হতে থাকে। "প্রথমে তাহা অধিকার লাভের ও প্রাপ্ত অধিকার রক্ষার চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করে।" ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণ ক্রমশ উপলব্ধি করতে থাকে যে আন্দোলন ব্যতীত অধিকার লাভ বা রক্ষা করা যায় না। তাই তারা দেশের জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রচার সুরু করে। তারা যে সকল সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করলো, তাতেও রাজনৈতিক বিষয় আলোচিত হতে থাকে। ১৮৩৮ সনে তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাজকৃষ্ণ দে প্রমুখ ব্যক্তির প্রচেষ্টায় **Society for the Acquisition of General Knowledge** বা জ্ঞানার্জন সভা স্থাপিত হয়। এই সভায় নানা বিষয়ের সংগে রাজনীতিরও চর্চা হতো। হেমেনবাবু লিখেছেন: "একদিন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে রামগোপাল ঘোষ তাহার আলোচনাপ্রসঙ্গে রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিলে সেই সভায় উপস্থিত ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডশন ইংরাজীভাষী বাঙ্গালী যুবকদিগের এইরূপ মত প্রকাশে এমনই বিচলিত হয়েন যে, ঐ গৃহে সভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিতে চাহেন। তিনি বলেন, তিনি বিদ্যামন্দিরকে কিছুতেই রাজদ্রোহের আড্ডা হইতে দিবেন না। তারাচাঁদ চক্রবর্তী যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় রিচার্ডশনের কথার উত্তর দেন। তদবধি এই রাজনীতিপ্রিয় যুবকদলকে 'তাঁরাচাঁদের দল' (Chakrabarty Faction) বলা হইত" (কংগ্রেস ও বাঙ্গালা", পৃঃ ৪১-৪৩)।

যখন এভাবে বাংলার ইংরেজী শিক্ষিত যুবকগণ রাজনীতি চর্চা করছিল, সেই সময় আবার বিলেতেও জর্জ টমশন নামক এক সহৃদয় ইংরেজ ব্যক্তি ভারতবর্ষের বিষয় নিয়ে বক্তৃতা ও আলোচনায় উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৩৯ সনে তাঁরই চেষ্টায় বিলাতে **British India Society** স্থাপিত হয় ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত-শাসনপদ্ধতি তীব্র সমালোচনার বস্তু হয়। এই সময়ই বিলাতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সংগে টমসনের পরিচয় হয় ও দ্বারকানাথের আমন্ত্রণেই "টমশন ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে দ্বারকানাথের সহিত ভারতে আগমন করেন।"

টমশনের বক্তৃতাবলী কলকাতায় যুবকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। যে সকল যুবক পূর্ব থেকেই রাজনীতিচর্চায় উদ্যোগী ছিল, তারা এখন টমশনের সংগে মিলিত হলো। যারা টমশনের নিকট তৎকালে এ বিষয়ে শিক্ষালাভ করে তাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র ও চন্দ্রশেখর দেব প্রধান (হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়ের নবপ্রকাশিত **The Growth of Nationalism in India, 1857-1905** গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।)

এর পরবর্তী ঘটনা ১৮৪৯ সনের "Black Acts" নামক বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে রামগোপাল ঘোষের নেতৃত্বে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আন্দোলন। টাউনহলে সভা করে রামগোপাল সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন ও এক পুস্তিকা লিখে ১৮৪৯ সনের আইন গুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এই স্বাধীন আচরণ ও মনোভাবের জন্য রামগোপাল শীঘ্রই সরকারী চাকুরী থেকে বিতাড়িত হন। এর পরবর্ত্তী ঘটনা ১৮৫১ সনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠা। এই সমিতির সদস্যরা সকলেই ভারতীয় ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমিতির সেক্রেটারী হিসাবে ভারতের অন্যান্য সহরের জননায়কদেয় নিকট তৎকালে পত্র প্রেরণ করেন ও তাদের অনুরোধ জানান ভারতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য সুসংহত আন্দোলন গড়ে তুলতে। এর পরবর্তী ধাপ হলো ১৮৫৩ সনে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকা প্রতিষ্ঠা। নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খার দর্পনস্বরূপ ছিল এই পত্রিকা। ডালহাউসীর স্বত্ববিলোপ নীতির তীব্র সমালোচনা এই পত্রিকায় হরিশ্চন্দ্র প্রকাশিত করেন। সিপাহী বিদ্রোহ সুরু হলে তিনি লর্ড ক্যানিং-এর নীতি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন এবং সিপাহী ও সরকারের মধ্যে শান্তিস্থাপনের ব্যাপারে বড়লাটকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। বিদ্রোহ দমিত হলে সরকার পক্ষ যাতে বিদ্রোহীদের প্রতি কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, সে জন্য তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে "হিন্দু পেট্রিয়টে" প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন। কিন্তু রামগোপাল বা হরিশ্চন্দ্র কেউই সিপাহীদের পক্ষ সমর্থন করে বিশেষ কিছুই বলেন নি বা লেখেন নি। অথচ ১৮৬০ সনের নীলকর অন্দোলনে হরিশ্চন্দ্র প্রজাদের পক্ষে কিভাবে লড়াই করতে করতে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে ছিলেন তা সকলেই জানেন। হতভাগ্য প্রজাদের প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেনীর লোকেরা পূর্ণ সমর্থন জানাতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করে নি। অথচ এহেন রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করলো না, কারণ এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সেদিন তারা জাতির কল্যাণ বা দেশের কল্যাণ দেখতে পায় নি। সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে প্রগতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়া বলে মনে হওয়াতেই তারা এর সমর্থনের পরিবর্তে বরং বিরোধিতাই

করেছিল। তাদের বিরোধিতার কারণ তাদের রাজনৈতিক চেতনার বা স্বদেশ-বাৎসল্যের অভাব নয়—১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের প্রকৃতিতে প্রগতিবাদের অভাব। বিদ্রোহ দমিত হবার পর পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে (১৮৫৮-১৯০৫) এদেশে ধীরে ধীরে যে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাতে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই নেতৃত্ব করেছিল—যে নেতৃত্বের পরিণতি দেখতে পাই ১৯৪৭ সনের স্বাধীনতায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও আধুনিক কালের সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক বিপ্লবের ধারায় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বই সর্বপ্রধান উপাদান। ইয়োরোপের যে সকল দেশে এই শ্রেনী আগে বিকাশ লাভ করেছে, সেখানেই সামাজিক-রাষ্ট্রিক বিপ্লবের শঙ্খধ্বনি বেজেছে আগে আগে; আর যেখানে এই শ্রেণীর অভ্যুদয় দেরীতে ঘটেছে, সেখানে বিপ্লবের আগমনও বিলম্বিত হয়েছে। পঞ্চদশ শতকে ইতালীর রেণাসাঁস থেকে বর্তমান শতকের বলশেভিক্ বিপ্লব পর্যন্ত ইয়োরোপীয় ইতিহাস এ সত্য বার বার ঘোষণা করেছে। ভারতের আধুনিক কালের ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। গোটা ভারতবর্ষকে জননী জন্মভূমি জ্ঞানে পূজা করার আদর্শ এ দেশে নতুন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ ও বিকাশ ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পরবর্তী ঘটনা—রাষ্ট্রিক-স্বাধিকার ও স্বরাজের আন্দোলন আরও পরবর্তী কালের অভিব্যক্তি। এই বিষয়ের বিশদ বিবরণ পূর্বোল্লিখিত growth of Nationlism of India গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

* [এই প্রসংগে হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়ের সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ সনের Modern Review পত্রিকায় প্রকাশিত মহাবিদ্রোহ বিষয়ক প্রবন্ধ পঠিতব্য। ১৮৫৭-র বিদ্রোহ বিংশ শতকের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর সত্যই বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল কিনা এই বিষয়ে ডক্টর মজুমদারের মতামতের সমালোচনা উক্ত প্রবন্ধে সন্নিবেশিত আছে।]

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ

গত ২৩শে নভেম্বর বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন বসে। পরিষদের সভাপতি শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এই বৎসর অক্টোবর মাসে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে আমেরিকা গেছেন। বার্ষিক অধিবেশনে তাঁর স্থলে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীসুশোভন সরকার।

প্রথমে পূর্ববর্তী বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্য বিবরণী পঠিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর বার্ষিক আয় ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব সভায় পেশ করা হয় ও তাহাও গৃহীত হয়। এই বৎসর আজীবন সভ্যের সংখ্যা ৪, সাধারণ সভ্য ৭৫ এবং গ্রাহক সংখ্যা ১৭০। গত বৎসরের তুলনায় গ্রাহক ও সভ্য সংখ্যা কিছু বেড়েছে বটে কিন্তু তা পরিষদ স্ব-নির্ভর হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সপ্তম বৎসরের প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে ১,৫০০৲ সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। তা না পেলে পত্রিকার চারটি সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হ'তো না। সভ্য ও গ্রাহক সংখ্যা বাড়ানোর জন্য আমাদের চেষ্টিত হতে হবে।

সপ্তম বৎসরে কর্মসমিতির ২টি অধিবেশন বসে এবং তিনটি আলোচনা সভা আহূত হয়। প্রথমদিন (১১ই জানুয়ারি) ফাদার ফালোঁ বলেন ইউরোপের রেণেসঁস্ ও মানবতা সম্বন্ধে। (৬ই এপ্রিল) ফাদার আন্তোয়ান্ ইন্‌কুইজিশন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৃতীয় দিন (২৪শে মে) শ্রীতপন রায় চৌধুরী হলাণ্ডে রক্ষিত ভারতবর্ষ সম্পর্কিত দলিলপত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এছাড়া দুটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ৩রা জানুয়ারি অধ্যাপক আর্নল্ড টয়েনবী ও শ্রীমতী টয়েনবীকে সহ-সম্পাদক শ্রীসোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দীর বাসভবনে চা-ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেনের বাসভবনে ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোভিয়েট রাশিয়ার তরুণ ঐতিহাসিক কুমারভকে পরিষদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

কর্ম-সমিতির দুইজন সদস্য শ্রীপ্রতুল চন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীঅরুণ কুমার দাসগুপ্ত

বিদেশ যাত্রা করায় তাঁদের স্থলে শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশোভন বসু সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। নিম্নলিখিত সভ্যগণ আগামী বৎসরের জন্য কর্মসমিতির সদস্য নির্বাচিত হন।

শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, শ্রীসুশোভন সরকার, শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী, শ্রীশিবপদ সেন, শ্রীসুকুমার রায়, শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীশশীভূষণ চৌধুরী, শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী, শ্রীঅসীম কুমার দত্ত, শ্রীশিশির কুমার মিত্র, শ্রীসোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ (১) শ্রীতড়িৎ কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীশোভন বসু, শ্রীদিলীপ কুমার ঘোষ (২)।

কর্মকর্তামণ্ডলী নির্বাচন ঃ

গত ২৩শে নভেম্বর, শনিবার কর্মসমিতির প্রথম অধিবেশনে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন অষ্টম বৎসরের জন্য বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুশোভন সরকার সহ-সভাপতি, শ্রীশিবপদ সেন কর্মসচিব, এবং শ্রীতড়িৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। সহকারী কর্মসচিবের পদে নির্বাচিত হন শ্রীসোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, শ্রীঅসীমকুমার দত্ত এবং শ্রীশোভন বসু। 'ইতিহাস' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হলেন শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার এবং শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ।

'ইতিহাস' ৭ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যায় 'স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ ও আকাঙ্খা' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল তার বাকি অংশটুকু অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় ছাপা সম্ভব হল না। তাহা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

অষ্টম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৬৪

ইতিহাস

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদকঃ
রমেশচন্দ্র মজুমদার
নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ
৪৭-এ, একডালিয়া রোড :: কলিকাতা-১৯

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ

কর্মকর্তামণ্ডলী

সভাপতি

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ সেন

সহ-সভাপতি

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী সুশোভন সরকার

কর্মসচিব

শ্রী শিবপদ সেন

সহ-কর্মসচিব

শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী
শ্রী অসীমকুমার দত্ত
শ্রী শোভন বসু

কোষাধ্যক্ষ

শ্রী তড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ইতিহাস

অষ্টম খণ্ড] অগ্রহায়ণ-মাঘ, ১৩৬৪ [দ্বিতীয় সংখ্যা

আঠারশ সাতান্ন সনের বিপ্লব

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

আঠারশ সাতান্ন সালে ভারতে যে বিপ্লব হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে গত কয়েক মাস যাবৎ বহু আলোচনা হইয়াছে। এই আলোচনার প্রকৃতি ও ফল সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১

কয়েকখানি ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ গ্রন্থ, উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা, ও স্বতন্ত্র প্রবন্ধ এবং বক্তৃতা—প্রধানতঃ এই তিনটিকে আশ্রয় করিয়াই এই আলোচনা পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহার মধ্যে বক্তৃতার সংখ্যাই বেশি। সংবাদপত্রে এই সমুদয় বক্তৃতার যে সারাংশ বাহির হইয়াছে তাহা মোটামুটিভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে যে ১৮৫৭ সালে যে বিপ্লব ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুল কলেজের ছাত্র পর্যন্ত সকল শ্রেণীর ও সকল বয়সের লোকই বিশেষ অভিজ্ঞ। ইতিহাসের আলোচনাই যাহাদের পেশা অথবা জীবনের ব্রত, মুষ্টিমেয় সেই শ্রেণীর লোকই সাধারণতঃ শতবার্ষিকী উৎসবে বক্তৃতা করে নাই (অন্ততঃ খবরের কাগজে তাঁহাদের নাম চোখে পড়ে নাই)। তাছাড়া রাজনৈতিক, দার্শনিক, ব্যবসায়ী, উকিল, সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী, পার্লামেণ্ট ও প্রাদেশিক বিধান সভার সদস্য সকলেই বক্তৃতা করিয়াছেন এবং এই বিপ্লবের

গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধচিত্তে স্পষ্ট মতামত দৃঢ় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐতিহাসিকদের মনে এ বিষয়ে দ্বিধা থাকিলেও অন্য শ্রেণীর লোকেরা সুনির্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করিতে কোন প্রকার কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

প্রবন্ধ ও গ্রন্থের সমালোচনা সম্বন্ধেও উপরোক্ত মন্তব্য পুরাপুরি না হইলেও অনেকাংশে খাটে। ইহার লেখকদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ঐতিহাসিক আছেন, কিন্তু অধিকাংশ সম্বন্ধেই একথা বলা চলে যে ভারতের ইতিহাস তাঁহারা যে বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন এরূপ কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই। যে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার লেখকদের মধ্যে অর্ধেক অথবা তাহার বেশী সম্বন্ধেও ঠিক এই মন্তব্য করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

১৮৫৭ সনের বিপ্লব সম্বন্ধে সাম্প্রতিক আলোচনার এই দিকটি বিশেষ-ভাবে অনুধাবন করা দরকার। কোনরূপ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ও অর্থনৈতিক কূটতত্ত্বের সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিতে যাঁহারা অগ্রসর হন না, তাঁহারাও অনায়াসে এই বিপ্লব সম্বন্ধে স্পষ্ট মতামত প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে নূতন গণতন্ত্রের পরিবেশে ভারতবাসীর মনে ক্রমশঃ এই ধারণা জন্মিতেছে যে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা, দর্শন প্রভৃতি আলোচনার জন্য যে প্রকার অধ্যয়ন, অনুশীলন, গবেষণা ও অন্যান্য প্রস্তুতির প্রয়োজন, ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে অন্ততঃ ভারতবাসীর পক্ষে তাহা একান্তই বাহুল্যমাত্র। ভারতবাসী মাত্রেরই ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ এবং ইহার জটিল সমস্যা সম্বন্ধেও তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিবার জন্মগত অধিকার আছে। ১৮৫৭ সনের বিপ্লবের গতি ও প্রকৃতি কি তাহা নির্ণয়ের জন্য হয়ত অদূর ভবিষ্যতে জনসাধারণের ভোট (অথবা গ্যালপ পোলিং) প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২

যে কয়েকজন ঐতিহাসিক ১৮৫৭ সনের বিপ্লব সম্বন্ধে সম্প্রতি আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের চেষ্টার ফলে এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধি কিছু বিস্তৃত হইয়াছে কিনা, অথবা তাঁহারা কেবল গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র, কেহ কেহ এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে কয়েকটি বিষয়ে যে পুরাতন ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে

তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এতদিন পর্যন্ত এই বিপ্লবের দুই প্রধান নায়ক বাহাদুর শাহ ও নানাসাহেব সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তাহা তিরোহিত হইয়াছে। শতবার্ষিকীর বহু উচ্ছ্বাসময় বক্তৃতার মধ্যেও ইহাদের নাম কদাচিৎ শোনা গিয়াছে। ইহাদের স্মৃতি রক্ষার জন্য নূতন স্ট্যাম্প প্রচলন ও অন্যান্য যে সকল পরিকল্পনা হইয়াছিল তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিহারে কুমার সিং ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলে ঝাঁসীর রাণীর পূর্ব গৌরবের কতক বিদ্যমান আছে, কিন্তু অন্যত্র যে ইহা অনেকটা ম্লান হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইঁহারা অথবা অন্য কোন নায়ক বা নায়কগণ যে পূর্ব হইতে পরামর্শ করিয়া বিশেষ কোন পরিকল্পনা অনুসারে ১৮৫৭ সনে বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন—সে বিশ্বাসও অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে। আর এই বিপ্লব যে ভারতবর্ষের একটি অংশে সীমাবদ্ধ ছিল এ সম্বন্ধে সর্বসাধারণের মনে একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে। সাম্প্রতিক আলোচনার ফলে যদি এই কয়েকটি সিদ্ধান্ত সর্ববাদীসম্মত এবং শিক্ষিত জনসাধারণের মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা হইলে এই আলোচনার যথেষ্ট সার্থকতা হইয়াছে বলিতে হইবে। ১৮৫৭ সনের বিপ্লব সম্বন্ধে চূড়ান্ত সত্য নির্ণয়ের জন্য ভবিষ্যতে যাঁহারা দুর্গম ঐতিহাসিক পথে অগ্রসর হইবেন ১৯৫৭ সন তাঁহাদের পথের অনেক বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া তাঁহাদিগকে গন্তব্য স্থানের দিকে অনেকদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে—ইহা অস্বীকার করা যায় না।

৩

১৮৫৭ সনের বিপ্লব সম্বন্ধে কেবল একটি প্রধান তথ্য এখনও অমীমাংসিত। ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে জনসাধারণ ইংরেজের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহা স্বাধীনতালাভের জন্য জাতীয় সংগ্রাম কিনা,—কেবলমাত্র এই প্রশ্নটি লইয়াই এখন প্রবল মতবিরোধ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কেবল এই মতবিরোধের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে এই মতবিরোধের মূল কারণ এই যে স্বাধীনতালাভের জন্য জাতীয় সংগ্রাম বলিতে আমরা কি বুঝি অথবা আমাদের কি বোঝা উচিত সে সম্বন্ধে অনেকের মনেই কোন স্পষ্ট ধারণা নাই এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকে এই সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। গোড়ায় এই প্রশ্নের কোন মীমাংসা না

হইলে ১৮৫৭ সনের বিপ্লব জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম কিনা এ বিষয়ে কেবল তর্ক ও বাদানুবাদ চলিতে পারে ; কোন সুমীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং নিরপেক্ষভাবে এই মূল প্রশ্নের আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪

একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। এ যাবৎ যে সমুদয় আলোচনা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ইংরেজকে তাড়াইবার জন্য যুদ্ধ করিলেই তাহা মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া বিবেচিত হইবার উপযুক্ত—অনেকের ইহাই ধারণা। একজন প্রবীণ ঐতিহাসিকও প্রশ্ন করিয়াছেন যে যাঁহারা জনসাধারণের বিপ্লবকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বলিতে অস্বীকার করেন তাঁহারা কি বলিতে চান যে বিপ্লবীরা ইংরেজকে এদেশে রাখিতে চাহিয়াছিল? আপাততঃ এই যুক্তি খুব সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের ঘটনা পরম্পরা পর্যালোচনা করিলে ইহার অসঙ্গতি ধরা পড়ে।

ইংরেজকে ভারত হইতে তাড়াইবার জন্য বিপুল উদ্যমে, বিশিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে, এবং ব্যাপকভাবে যুদ্ধ করিলেই যদি তাহা মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া ধরা যায়, তবে পিণ্ডারী ও ওহাবীরা ভারতের প্রথম মুক্তি সংগ্রামের সম্মান দাবি করিতে পারে। পিণ্ডারীদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধের বিবরণ যাঁহারা জানেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে পিণ্ডারীরা জীবন মরণ পণ করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। সমগ্র মধ্যভারত ব্যাপিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল, এবং ইহার জন্য বম্বে মাদ্রাজ ও উত্তর ভারত হইতে চারি পাঁচটি বিরাট সৈন্যদল ইংরেজ সরকার একযোগে ইহাদের বিরুদ্ধে সমাবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পিণ্ডারীদের উপযুক্ত বীর নায়ক ছিল, এবং ১৮৫৭ সনে যুক্তপ্রদেশে বিপ্লবীদের মধ্যে যে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সুবন্দোবস্ত ছিল তাহার অপেক্ষা পিণ্ডারীদের মধ্যে এ সমুদয় অনেকগুণ বেশী ছিল। দেশীয় প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গ (সিন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতি) তাহাদের সহায়তা করিতেন। জনসাধারণও ভয়ে অথবা অন্য যে কারণেই হউক ইংরেজকে কোন সাহায্য তো করেই নাই বরং পিণ্ডারীদের সহায়তা করিয়াছিল, এবং এই জন্য তাহাদের গোপন গতিবিধির কোন সন্ধান না পাওয়ায় ইংরেজ সৈন্যের অনেক অসুবিধা হইয়াছিল।

"ইতিহাস" পত্রিকায় "এক সিপাহীর আত্মকথা" নামে ধারাবাহিক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে তাহা পাঠ করিলেই এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে। সুতরাং বাহিরের দিক হইতে দেখিলে ১৮৫৭ সনের বিপ্লবের সহিত পিণ্ডারী যুদ্ধের যে অনেক সাদৃশ্য আছে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। (অথচ আমরা সকলেই জানি যে পিণ্ডারীরা যে দস্যুবৃত্তি করিয়া লুঠপাট করিত ইংরেজের সুশাসনে তাহা রহিত হইবার আশঙ্কায়ই তাহারা ইংরেজদিগকে তাড়াইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। দেশের মুক্তি তাহাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।) ১৮৫৭ সনে যুক্ত প্রদেশে ও সন্নিহিত অঞ্চলে যাহারা ইংরেজদিগকে তাড়াইবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারা যে পিণ্ডারী দস্যু নহে তাহা বলাই বাহুল্য—এবং পিণ্ডারীদের সহিত কোন দিক দিয়া তাহাদের সাদৃশ্য কল্পনা করাও হাস্যকর। কিন্তু আমার বক্তব্য এই মাত্র যে পিণ্ডারীদের দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণিত হয় যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য দলবদ্ধভাবে চেষ্টা মাত্রই মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এই চেষ্টার পশ্চাতে কি উদ্দেশ্য ও মনোভাব বর্তমান তাহা না জানিলে ঐরূপ সিদ্ধান্ত করা ভুল হইবে।

ওহাবীরা ভারতে দার-উল-ইসলাম অর্থাৎ মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বঙ্গদেশ হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত যে অদ্ভুত পরিকল্পনা ও সুব্যবস্থা, করিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ১৮৫৭ সনের বিপ্লবীদের অপেক্ষা তাহারা অধিকতর শৌর্য, বীর্য, ঐকান্তিক চেষ্টা ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়াছিল। প্রথমে তাহারা পঞ্জাবে শিখদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, কারণ তাহাদের মতে শিখেরা ছিল ইসলামের পরম শত্রু ও দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়। পরে যখন ইংরেজেরা শিখদের হারাইয়া পঞ্জাব অধিকার করে তখন ঠিক একই কারণে তাহারা ইংরেজদের তাড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। ১৮৫৭ সনের বিপ্লবের সহিত এ বিষয়ে ওহাবী বিদ্রোহের অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ওহাবী বিদ্রোহ কি ভারতের মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য? ইহার উত্তর অতি সহজ। ইংরেজের বিরুদ্ধে ওহাবীদের যুদ্ধ যদি মুক্তি সংগ্রাম হয় তবে শিখদের বিরুদ্ধে তাহাদের যুদ্ধও ঠিক ঐ নামেই অভিহিত হইবার যোগ্য। অর্থাৎ পঞ্জাবে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ভারতের মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ইহা এতই হাস্যকর যে এ বিষয়ে বাদানুবাদ করা বৃথা।

পিণ্ডারী ও ওহাবীদের দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায় যে ঘৃণ্য স্বার্থের খাতিরে অথবা ধর্মের প্রেরণায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক যুদ্ধ হইয়াছে তাহাকে কোনক্রমেই ভারতের মুক্তি সংগ্রাম বলা যায় না। ইংরেজ না হইয়া যদি কোন দেশীয় শক্তি পিণ্ডারীদের দস্যুবৃত্তি দমন করিতে অগ্রসর হইত, তবে পিণ্ডারীরা তাহাদের বিরুদ্ধেও ঠিক ঐরূপই যুদ্ধ করিত। তাহাদের চোখে ইংরেজ বিদেশী শাসক ও প্রভু নহে, পরন্তু তাহাদের স্বার্থ বিরোধী প্রবল শক্তি বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। ওহাবীরাও শিখদের ন্যায় ইংরেজকে মুসলমান রাজশক্তির বিরোধী রূপেই দেখিত; ভারতের মুক্তি তাহারা চাহে নাই; তাহারা চাহিয়াছিল মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা। যে কেহ ইহার বিরোধী, সে ইংরেজই হউক বা অ-মুসলমান ভারতীয়ই হউক, সেই তাহাদের শত্রু। মুক্তি সংগ্রাম বলিলে যদি আমরা ভারতকে বিদেশীর অধীনতাপাশ হইতে উদ্ধার করার চেষ্টা বলিয়া বুঝি, তাহা হইলে পিণ্ডারী বা ওহাবীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে প্রাণপণ যুদ্ধ করিলেও এই যুদ্ধ ভারতের মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া দাবি করিতে পারে না।

যাঁহারা ১৮৫৭ সনের বিপ্লবকে মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করেন তাঁহারা প্রধানতঃ ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে অযোধ্যা ও সন্নিহিত অঞ্চলের লোকেরা ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে আপ্রাণ যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা কি উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে তাহার আলোচনা বিশেষ কিছু করেন নাই। অথচ পিণ্ডারী ও ওহাবীদের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যতক্ষণ পর্যন্ত এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রমাণ সহযোগে স্পষ্ট কোন সিদ্ধান্ত না করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান কালের ধারণার বশবর্তী হইয়া, ভাবোচ্ছ্বাসে অথবা কেবল অনুমানের বলে ইহা মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া প্রচার করা কোন মতেই সমীচীন নহে। সুতরাং ১৮৫৭ সনের বিপ্লবের প্রকৃতি নির্ধারণ করিতে হইলে বিপ্লবীদের প্রেরণা বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ ও আলোচনা করা দরকার। নচেৎ কথায় কথা বাড়িবে, মুল প্রশ্নের কোন সদুত্তর মিলিবে না।

৫

১৮৫৭ সনের বিপ্লবকে মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করিলেও ইহা জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম পদবাচ্য কিনা তাহার বিচার করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রেও

প্রথমে ঠিক করিতে হইবে 'জাতীয়' বলিতে আমরা কি বুঝি। বর্তমান কালে আমরা জাতীয়তা বলিলে আর কিছু না হউক অন্ততঃ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী ও ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন স্বীকার করি, এবং এই একতার উপলব্ধি ব্যতীত জাতীয়তার আর কোন ভিত্তি কল্পনা করা কঠিন। কার্যকালে অনেক সময় যে ইহার ব্যত্যয় ঘটে এবং সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা নানারূপে আত্মপ্রকাশ করে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু মতবাদ হিসাবে ভারতবাসীর ঐক্য যে আমরা মনে প্রাণে মানিয়া লই, এবং প্রত্যেকেই ভারতবাসী বলিয়া গর্ব অনুভব করি এবং আত্মপরিচয় দেই, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ১৮৫৭ সনে যে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এই প্রকার ঐক্যবোধ জন্মে নাই, এমন কি ইহার কল্পনাও জনসাধারণের মনে জাগিয়া উঠে নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং যাঁহারা ১৮৫৭ সনের বিপ্লবকে 'জাতীয়' সংজ্ঞায় অভিহিত করেন, তাঁহারা জাতি বা জাতীয়তা বলিতে কি বোঝেন প্রথমে তাহারই বিশদ ব্যাখ্যা ও আলোচনা হওয়া উচিত।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে বিপ্লব একটি নির্দিষ্ট প্রদেশে সীমাবদ্ধ থাকিলেও যদি উহার অধিবাসীরা—অথবা তাহার একটি বিশিষ্ট অংশ—ইংরেজের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যুদ্ধ করে, তবে তাহা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণের যোগ্য কি না। সম্প্রতি একজন প্রবীণ ঐতিহাসিক এই মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে যদি বাংলায় সীমাবদ্ধ স্বদেশী আন্দোলন 'জাতীয়' আখ্যা পাইতে পারে তবে অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, ও সন্নিহিত অঞ্চলে ১৮৫৭ সনে জনসাধারণের বিপ্লব নিশ্চয়ই জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণের যোগ্য। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন যতদিন বঙ্গভঙ্গ রহিত করিবার জন্য বিলাতী দ্রব্য বর্জনের চেষ্টায় সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন কেহই তাহাকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম আখ্যা দিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না। দিয়া থাকিলে তাহা সমর্থনের যোগ্য নহে। কিন্তু ক্রমে এই আন্দোলন ব্যাপক ভাব ধারণ করিয়া বঙ্গদেশের বাহিরে বিস্তৃত হয়, এবং ইহার সংকীর্ণ উদ্দেশ্য পরিহার করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ (কেবল বঙ্গদেশ নহে) যাহাতে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে তাহাই লক্ষ্যস্থল বলিয়া গ্রহণ করে। স্বদেশী আন্দোলনের এই পরিবর্তনের ফলেই ইহা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সিপাহীরা তাহাদের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপে

বিচলিত হইয়া যে বিপ্লব আরম্ভ করিয়াছিল, এবং ভারতের একাংশের জনসাধারণ (অথবা তাহার একটি বিশিষ্ট অংশ) এই সুযোগে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কারণে ইংরেজের বিরুদ্ধে যে ভাবে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহা যদি কালক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনে পর্যবসিত হইত তবে নিশ্চয়ই তাহা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু ১৮৫৭-৫৮ সনে সিপাহী অথবা বিপ্লবী জনসাধারণের মনে সমগ্র ভারতবর্ষ তো দূরের কথা কোন সীমাবদ্ধ অঞ্চল ইংরেজের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করার কল্পনা জাগিয়াছিল—ইহা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে গ্রহণ করা যায় না। ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ সাপেক্ষ। কেবলমাত্র অনুমানের উপর এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করায় প্রমাণিত হয় যে ব্রিটিশ আধিপত্য উচ্ছেদ করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাই ১৮৫৭ সনের বিপ্লবের সর্বসম্মত উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বাহাদুর শাহকে যাহারা সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল তাহারা যে তাঁহাকে কি চক্ষে দেখিত তাহা এখন সকলেই জানেন। বাহাদুর শাহ যে উত্তর প্রদেশেও সর্বসম্মতিক্রমে দেশের নায়ক বলিয়া স্বীকৃত হন নাই—তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। নানাসাহেব যে কানপুরে পেশোয়া পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাহা সর্বজনবিদিত। সম্প্রতি ডাঃ সেন প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে অযোধ্যার লোকেরা তাহাদের দেশ ও রাজা অর্থাৎ অযোধ্যার নবাবের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। একথা কতদূর সত্য তাহা বলা কঠিন। কিন্তু তাহারা যে বাহাদুর শাহের পতাকাতলে সমবেত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জনে অগ্রসর হয় নাই তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। সুতরাং ব্রিটিশ রাজ্যের উচ্ছেদ করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা যে বিপ্লবীদের সর্বসম্মত লক্ষ্য (common urge) ছিল তাহা কোন মতেই স্বীকার করা যায় না। আর মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যম ভারতের মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়।

সুতরাং ১৮৫৭ সনের জন বিপ্লবের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে প্রথমেই দুইটি গোড়ার কথা আলোচনা করা আবশ্যক—মুক্তি সংগ্রাম ও জাতীয়তার স্বরূপ কি, অথবা কি অর্থে আমরা

ইহার ব্যবহার করি। এই দুটি সমস্যার নিষ্পত্তি না হইলে ১৮৫৭ সনের বিপ্লব জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পর্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্য কিনা এসম্বন্ধে আর অধিকতর বাদানুবাদ পণ্ডশ্রম মাত্র।

৬

মিথ্যার প্রাণশক্তি যে কত প্রবল সাম্প্রতিক আলোচনায় তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৫৭ সনের বিপ্লবের প্রসঙ্গে অনেকেই বলিয়াছেন যে ইংরেজেরাই কুচক্র করিয়া আমাদের মুক্তি সংগ্রামের গুরুত্ব লাঘব করিবার জন্য ইহাকে সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দিয়াছেন। অথচ একাধিক ঐতিহাসিক পুনঃ পুনঃ প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে দেখাইয়াছেন যে বরং কোন কোন ইংরেজ লেখক ইহাকে জাতীয় বিপ্লব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সমসাময়িক কোন বিশিষ্ট ভারতবাসী এই মতে সায় দেন নাই। সে যুগের কৃতী বাঙ্গালী—কৃষ্ণদাস পাল, হরিশ মুখোপাধ্যায়, শম্ভু চরণ মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি—এবং (সার) সৈয়দ আহমদ প্রভৃতি কেহই এই বিপ্লবকে মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করা তো দূরের কথা, ইহার প্রতি কোন প্রকার সহানুভূতি দেখান নাই। কবি ঈশ্বর গুপ্ত ইহার যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়াছেন। যাঁহারা ইহাকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করেন তাঁহারা ইহার সপক্ষে কোন সমসাময়িক বিশিষ্ট ভারতবাসীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। অবশ্য ইহা হইতেই স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না যে ১৮৫৭ সনের বিপ্লব মুক্তি সংগ্রাম নহে, কিন্তু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে ইংরেজের চক্রান্তের ফলেই যে ইহা সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামের উপযুক্ত সম্মান পায় নাই এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

বস্তুতঃ আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে যে প্রকৃত জাতীয়তা ভাবের উন্মেষ হয় তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপেই ১৮৫৭ সনের বিপ্লব মুক্তি সংগ্রামের রূপ ধারণ করে। এই বিপ্লবের সহিত উক্ত জাতীয়তার বিকাশের বিশেষ কোন নিকট সম্বন্ধ আছে কিনা, তাহা সন্দেহের স্থল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সৈনিকেরা ঐতিহাসিক ঘটনার সাহায্যে প্রেরণা লাভের আশায় ১৮৫৭ সনের বিপ্লবকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামরূপে কল্পনা করিয়াছিল। এই কল্পনার কোন ঐতিহাসিক

ভিত্তি আছে কিনা ইহা তাহাদের বিচার্য বিষয় ছিল না। ইহার সাহায্যে জাতীয় উদ্দীপনার প্রসার করাই তাহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল—এবং এই উদ্দেশ্য যে কতক পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবলমাত্র এই দিক হইতেই ১৮৫৭ সনের বিপ্লবের সহিত বিংশ শতাব্দীর মুক্তি সংগ্রামের যোগসূত্র আছে—এবং একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, কিন্তু চিন্তার ধারা ও ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার দিক দিয়া বিচার করিলে এই উভয়ের মধ্যে কোন যোগসূত্র স্থাপনা করা যায় কিনা, এবং বিংশ শতাব্দীর জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ১৮৫৭ সনের বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে কিনা, তাহা স্থির করিতে হইলে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন।

মানবদরদী টমাস পেইন

১৭৩৭—১৮০৯

শ্রীকল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতকের শেষ চতুর্থাংশ পৃথিবীর ইতিহাসে এক প্রচণ্ড আলোড়ন এনেছিল। চিন্তা এবং কর্মজগতে এ যুগের বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব অনস্বীকার্য। চিন্তা এবং কর্মের দ্বিধারা পুষ্ট করেছে এ যুগপ্রবাহকে। আমেরিকান ও ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী কালে এই দুই শক্তির যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল, তার নজীর খুব বেশী নেই। এই কারণেই এই দুই বিপ্লবের প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী। ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতক বিপ্লবোন্মুখ হয়ে উঠেছিল। জীবনের বিভিন্ন স্তরে জেগে উঠেছিল নানা প্রশ্ন। প্রশ্ন জটিল হ'লে রাষ্ট্রনায়কেরা তা এড়িয়ে চলেন। বিপ্লবের পূর্বে ও পরে, আমেরিকা ও ফ্রান্সে শাসককুল বহু জটিল প্রশ্ন এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চিন্তানায়কেরা তাঁদের ভাবধারার মাধ্যমে মহাবিক্ষোভ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকে পথ নির্দ্দেশ এবং আদর্শ স্থাপনেও প্রয়াসী হয়েছিলেন তাঁরা।

টমাস পেইন্ (Thomas Paine) ছিলেন এই সব বিপ্লবী চিন্তাবীরদের অন্যতম। পৃথিবীর ইতিহাসে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যুগে পেইনের প্রতিভা ও সাধনা স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তাঁর রচনাবলীর বিরূপ সমালোচনাও করেছেন সমসাময়িক অনেকেই। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, সমসাময়িক যুগের উপর টমাস পেইনের ধীশক্তি ও মননশীলতা প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। অথচ, পেইনকে প্রকৃত পণ্ডিত বলা চলেনা। পুঁথিপত্র নিয়ে তিনি খুব ঘাঁটাঘাঁটি করেন নি। জনলক্ (John Locke) ছিলেন প্রাক্ পেইন্ যুগের চিন্তাজগতের অন্যতম দিক্‌পাল। যদিচ, অনেকের মতে লকের চিন্তাধারার প্রভাব পেইনের লেখায় সুপরিস্ফুট, পেইন্ বলেছেন যে, তিনি ক‌খনও লকের লেখা পড়েন নি। তাঁর রচনাবলীতে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের চিন্তানায়কদের বিশেষ কোন উল্লেখ নেই।

অথচ, যুগের আশা আকাঙ্খা, এবং যুগধর্মের মূলসূত্র তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আকাশে বাতাসে যে ভাবাদর্শ সঞ্চারিত হয়েছিল, তা' প্রকাশ পেয়েছে পেইনের লেখনীমুখে।[১]

পেইনের যুগ ছিল রাজনৈতিক মতবাদ ও কার্যক্রমের সংঘর্ষের যুগ। আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে তখন সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। পথ ও মতের শেষ নেই। লক্ষ লক্ষ লোকের ভবিষ্যৎ নির্ণীত হতে চলেছে। এই পটভূমিকায় পেইনের আবির্ভাব। এই সন্ধিক্ষণে, বিশেষ ভাবে আমেরিকা ও ফ্রান্সের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা নেন পেইন। শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে এই দুই দেশের জনসাধারণকে প্রেরণা দিতে থাকেন তিনি। পেইনের মন ছিল সংগ্রামী। তাঁর লেখা ও কাজে এই আপোষহীন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে এজন্য তাঁকে বিপদের ঝুঁকিও মাথায় নিতে হয়েছে। সুহৃদ ও শত্রুদের কাছ থেকে প্রশংসা ও নিন্দাও আহরণ করেছেন তিনি প্রচুর।

পেইন্ জাতিতে ছিলেন ইংরেজ। ১৭৩৭ সালে ২৯শে জানুয়ারী নরফোকের অন্তর্ভুক্ত থেট্‌ফোর্ডএ তাঁর জন্ম হয়। তের বছর বয়সেই তাঁকে তাঁর পিতার ব্যবসায়ে সাহায্য করতে হয়। পঁচিশ বছর বয়সে পেইন আবগারী বিভাগে চাকুরী নেন। এখানে তাঁর মেয়াদ মাত্র তিন বছর। কিছুকাল শিক্ষকতার পরে তিনি আবার আবগারী বিভাগে ফিরে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর বিদ্রোহী মন চাড়া দিয়ে উঠে, এবং এই বিভাগে পুনঃ প্রবেশের চার বছরের মধ্যেই ১৭৭২ সালে পেইন প্রকাশ করেন Case of the Officers of Excise. তাঁর সহকর্মীদের অভাব অভিযোগ পার্লামেন্টের গোচরীভূত করবার জন্যই পেইন তাঁর লেখনী ধারণ করেন, এবং এটিই তাঁর প্রথম Pamphlet বা পুস্তিকা। ১৭৭৪ সালে পেইন চাকুরী থেকে বরখাস্ত হ'ন।

১। We shall have to admit that there are times when ideas are "in the air," when they seem common property, and when the attribution to any one man of the paternity of any particular idea is well nigh impossible. The eighteenth century was undoubtedly such a period.

এখানেই পেইনের বিপ্লবী জীবনের সূত্রপাত। তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায় বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের সঙ্গে পরিচয়ে এবং তাঁরই আনুকূল্যে। ইংরেজ পেইন তখন অতি নগণ্য ব্যক্তি। সরকারী চাকুরী থেকে তিনি বিতাড়িত। পাওনাদারের তাগাদায় তিনি অস্থির। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন; প্রথম স্ত্রী ১৭৬০ সালেই গত হয়েছিলেন। মনীষী, বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ফ্র্যাঙ্কলিন অসহায় যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হ'লেন। যুবকের চোখ দেখেই তাঁর মনে হ'ল যে, এঁর মধ্যে অসাধারণ কিছু আছে। ফ্র্যাঙ্কলিনের কাছ থেকে পরিচয় পত্র নিয়ে পেইন এলেন ফিলাডেল্‌ফিয়ায়। অজ্ঞাতকুলশীল এক ইংরেজ ভাগ্যের স্রোতে এসে ভিড়লেন আমেরিকায়। ৩৭ বছর বয়সে এক সম্পূর্ণ অজানা দেশে তাঁকে নূতন উদ্যমে জীবন সুরু করতে হ'ল।

তখন ১৭৭৪ সাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা প্রবল হয়ে উঠেছে আমেরিকায়। নানা ঘাতপ্রতিঘাত ও বাক্‌বিতণ্ডায় সাগরের এপারে ওপারে জনমত বিক্ষুব্ধ। এই পরিবেশেই পেইনের প্রতিভা প্রকাশ পেল। পেইন নিজেই একথা স্বীকার করেছেন। ১৭৮৩ সালে পেইন লিখছেন যে আমেরিকার গতিপ্রবাহের প্রেরণাই তাঁকে লেখাকে রূপায়িত করেছে।[২] রাজনৈতিক সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যল্প কালের মধ্যেই তাঁর মনস্বিতা স্বীকৃতি লাভ করে। রাজতন্ত্রের সমালোচক ও শত্রু, ব্যক্তি ও গণ স্বাধীনতার হোতা এবং সাধারণ ভাবে নির্য্যাতিত সমাজের দরদী বন্ধু হিসাবে নিজের আসন কায়েম করে নিতেও পেইনের বেশী সময় লাগেনি। ১৭৭৫ সালে পেইন আমেরিকায় তাঁর প্রথম পুস্তিকা African Slavery in America প্রকাশ করেন। ন্যায় ও মানবতার নামে আমেরিকার ক্রীত-

২। It was the cause of America that made me an author. The force with which it struck my mind and the dangerous condition the country appeared to me in······made it impossible for me, feeling as I did, to be silent; and if in the course of seven years, I have rendered her any service, I have likewise added something to the reputation of literature by freely and disinterestedly employing it in the great cause of mankind and showing that there may be genius without prostitution.—
The American Crisis; XIII,

দাসপ্রথাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করেন তিনি। এ সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। স্বাধীনতাকামী আমেরিকানদের পক্ষে লক্ষ লক্ষ নিগ্রো ক্রীতদাস নিয়োগের সমালোচনা করেছেন পেইন।[৩] ইতিমধ্যে তিনি Pennsylvania Magazine এর সম্পাদক নিযুক্ত হ'ন। প্রায় দেড়বৎসর কাল এই ম্যাগাজিনের মাধ্যমে তাঁর মতবাদ প্রচারিত হতে থাকে।

আমেরিকার সঙ্কটময় পরিস্থিতি পেইনের বিদ্রোহী মনের বিকাশ ও পরিণতির পক্ষে অনুকূল হয়ে উঠ্‌ল। ১৭৭৫ সালের অক্টোবর মাসে A Serious Thought নামক নিবন্ধে তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা লিপ্সা সমর্থন করেন। ক্রমশঃ আমেরিকার রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত হয়ে পড়লেন তিনি। ১৭৭৫ সালের এপ্রিল মাসে লেক্‌সিংটনের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ঘটল। স্বাধীনতা ঘোষিত হ'ল প্রায় চোদ্দ মাস পরে। লেক্‌সিংটনের পরেও দুই দেশে আপোষকামী লোক একেবারে বিরল ছিল না। অক্‌টোবর মাসে তৃতীয় জর্জ তাঁর বক্তৃতায় (Speech from the Throne) অনমনীয় মনোভাব দেখালেন। তিনি বল্‌লেন যে, দরকার হ'লে অস্ত্রের সাহায্যে উপনিবেশিকদের আনুগত্য আদায় করা হবে। আমেরিকায় জনমত বিক্ষুব্ধ ও দৃঢ় হয়ে উঠ্‌ল। সম্মান জনক ভিত্তিতে আপোষ এবং ইঙ্গ-আমেরিকান প্রশ্নের সমাধানের আশা ক্ষীণতর হ'ল। এই পটভূমিকায় প্রকাশিত হয় Common Sense (১০ই জানুয়ারী, ১৭৭৬)। প্রথম সংস্করণে পেইনের নাম উল্লিখিত হয় নি। ঐ বৎসরই একটি সংশোধিত ও বর্ধিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্রকে নির্মমভাবে কশাঘাত করেছেন পেইন তাঁর Common Senseএ। পেইন বলেছেন, রাজতন্ত্র এমনিতেই গর্হিত ; বংশানুক্রমিকতা নীতি এর দোষ আরও বাড়িয়েছে।[৪] Com-

৩। With what consistency, or decency they complain so loudly of attempts to enslave them, while they hold so many hundred thousands in slavery ; and annually enslave many thousands more, without any pretence of authority, or claim upon them ?

৪। To the evil of monarchy we have added that of hereditary succession ; and as the first is a degradation and lessening of ourselves, so the second, claimed as a matter of right, is an insult and an imposition on posterity.

mon Sense এর বেশীর ভাগেই অবশ্য পেইন আমেরিকার তদানীন্তন পরিস্থিতির কথা আলোচনা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের বহু ইঙ্গিত এবং আমেরিকাবাসীদের প্রতি পথনির্দ্দেশের পরিচয় আমরা এই পুস্তিকায় পাই। তাঁর মতে আপোষের যুগ শেষ হয়েছে এবং ইংরেজ ও আমেরিকানের মধ্যে আর বোঝাপড়া হবেনা। স্বাধীনতা আমেরিকার ইতিহাস ও তৎকালীন পরিস্থিতির স্বাভাবিক পরিণতি। এই পথেই আসবে আমেরিকার সাধারণ শ্রেণীর সুখ ও সমৃদ্ধি। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বন্ধন থাকলে সাধারণ পরিস্থিতি এবং জনসাধারণের অবস্থা জটিল হয়ে উঠবে। মোটের উপর, Commod Sense কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ নয়; রাষ্ট্রদর্শনের ব্যাখ্যাও এটি নয়। চুলচেরা তর্ক এ বইয়ের বৈশিষ্ট্য নয়। নীচের দুটি অনুচ্ছেদ থেকে এর প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়।[৫] সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, আমেরিকার ইতিহাসে ভবিষ্যতের 'পাথেয়' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এমন কয়েকটি উপাদান Common Sense এ রয়েছে। পেইন ঘোষণা

৫। I have heard it asserted by some that, as America has flourished under her former connection with Great Britain, the same connection is necessary toward her future happiness and will always have the same effect. Nothing can be more fallacious than this kind of argument. We may as well assert that because a child has thrived upon milk that it is never to have meat, or that the first twenty years of our life is to become a precedent for the next twenty. But even this is admitting more than is true, for I answer roundly that America would have flourished as much, and probably much more, had no European power had anything to do with her. The commerce by which she has enriched herself are the necessaries of life and will always have a market while eating is the custom of Europe.

But she has protected us, say some. That she has engrossed us is true, and defended the continent at our expense as well as her own is admitted, and she would have defended Turkey from the same motive, viz, for the sake of trade and dominion.

এ জাতীয় যুক্তি ও বহু কথা স্বাধীনতার আগে ও পরে আমাদের দেশেও বহুবার শুনেছি।

করেছেন যে, তেরটি উপনিবেশকে একযোগে শক্তিশালী ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। তাঁর মতে এই সংগ্রামের লক্ষ্য ও আদর্শ হিসাবে সুস্পষ্ট ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করা দরকার। এই স্বাধীনতার পূর্ণ বিশ্লেষণ প্রয়োজন, এবং এই ঘোষণায় থাকা চাই আমেরিকানদের দুঃখদুর্দশার কথা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের আশা আকাঙ্খার প্রকাশ। অর্থাৎ, কেবল মাত্র ইংরেজশাসনকে অস্বীকার করলেই চলবেনা, সুস্পষ্ট ভাবে স্বাধিকার-দাবী জানাতে হবে। এই ঘোষণা হবে একটি অঙ্গীকার পত্র স্বরূপ, একটি document। এই প্রসঙ্গে পেইন্ আরও বলেছেন যে, উপনিবেশগুলির একটি সংস্থা হওয়া দরকার। কংগ্রেস, প্রেসিডেন্ট ও একটি শাসনতন্ত্র—এগুলিকে পেইন তাঁর প্রস্তাবিত সংস্থার বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে Common Sense গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। ওয়াশিংটন বইটিকে সুষ্ঠু মতবাদ এবং অকাট্যযুক্তি বলে বর্ণনা করেছিলেন। Common Sense এর দ্বারাই অনেকটা উদ্বুদ্ধ হয়ে কংগ্রেস (Continental Congress) স্বাধীনতা ঘোষণা পত্র তৈরী করেন। বিপ্লবের প্রতি সাধারণ আমেরিকানের মমত্ববোধও জাগিয়ে দেয় এই পুস্তিকা। এরই মাধ্যমে পেইনের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইংল্যাণ্ডের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন রকমের। তাঁর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ দেখাবার জন্য কেউ কেউ জুতোর তলায় পেরেক দিয়ে T. P. এই দু'টি অক্ষর বসিয়ে নেন!

প্রথম দফায় আমেরিকায় পেইনের স্থিতিকাল হল ১৭৭৪ থেকে ১৭৮৭ সাল পর্য্যন্ত। এই তের বৎসর কাল তিনি মনে প্রাণে আমেরিকাকে গ্রহণ করেছিলেন। নানাভাবে এদেশের সঙ্গে তিনি নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করেন, এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকতা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর কার্য্যধারার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য। ইঙ্গ-আমেরিকান যুদ্ধে সেনাপতি গ্রীনের অধীনে তিনি আমেরিকান্ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। প্রায় দু' বছর কংগ্রেসের বৈদেশিক দপ্তরে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন পেইন্। পেন্সিল্ভ্যানিয়া এ্যাসেম্ব্লীর দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা কালে তিনি টাকা তুলে পেন্সিল্ভ্যানিয়া ব্যাঙ্কের পত্তন করেন। এই ব্যাঙ্কই পরে Bank of North America নামে পরিচিত হয়। এই সময়েই (১৭৮০) পেইন্ পেন্সিল্ভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্, এ ডিগ্রি নেন। পরবৎসর

স্বল্পকালের জন্য Col. Laurens ও পেইন্ আমেরিকার তরফ থেকে সাহায্য ভিক্ষার জন্য ফ্রান্সে যান। কিছুকাল পরে ফ্রান্সই হয়েছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র।

এই গোটা যুগটাতেই পেইন তার মসীযুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছেন। বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁকে লেখনী ধারণ করতে হয়েছে। এর মধ্যে American Crisis Papers সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার মহাসংঙ্কটের উপর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পেইন তখন সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন এবং 'অসিযুদ্ধে' ব্যস্ত। ছয় বৎসর ধরে, সঙ্কট মোচন পর্যন্ত (১৭৮৩) পেইন এই পর্যায়ভুক্ত প্রবন্ধ লিখে চলেন। এই প্রবন্ধগুলির শেষে পেইন সই করতেন Common Sense। প্রথম Crisis paper স্বাধীনতা সময়ের নৈরাশ্যব্যঞ্জক পরিস্থিতির পটভূমিকায় রচিত। জয়ের সম্ভাবনা কম ; আমেরিকার মনোবল ভেঙ্গে পড়ছে। চতুর্দ্দিকে হতাশা। যুদ্ধনীতি পরিহারের কথাও চিন্তা করছেন কেউ কেউ। পেইন বল্‌লেন, হতাশ হয়োনা, আস্থা হারিও না। এখন নতিস্বীকারের অর্থ চরম দাসত্ব। সূচনাতেই প্রবন্ধটি জনচেতনা উদ্দীপক। পেইন বলছেন, এটা অগ্নিপরীক্ষার যুগ। শয়তানের পরাভব কষ্টসাধ্য। যা সহজলভ্য তার মূল্য কি? যা প্রয়াসার্জিত তারই কদর আছে।[৬] পেইনের এই সব উক্তির একটা চিরন্তন সত্যতা রয়েছে। ত্রয়োদশ Crisis paper এ আলোচিত হয়েছে শান্তি এবং যুদ্ধোত্তর সমস্যা সমূহ। এই প্রবন্ধেই পেইন বলেছেন যে লেখক হিসাবে তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন আমেরিকার ঘটনাবলী থেকে। এক আমেরিকান জাতিগঠনের সম্পর্কে পরিস্কার ভাবে বলেছেন পেইন্। স্বাধীন আমেরিকায় সকলে এক যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হউক—এই পেইনের ইচ্ছা : Our great title is Americans. এই প্রবন্ধের প্রকাশকাল ১৭৮৩ সালের এপ্রেল মাস।

৬। These are the times that try men's souls.........Tyranny like hell, is not easily conquered ; yet we have this consolation with us that the harder the conflict, the more glorious the Triumph. What we obtain too cheap, we esteem too lightly ; it is dearness only that gives everything its value.

চার বৎসর পরে একটি লৌহসেতুর নক্সা নিয়ে পেইন্ এলেন ফ্রান্সে। মডেলটি তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত। কিন্তু অতি শীঘ্র লৌহসেতুর নক্সা অপেক্ষা ফ্রান্সের সমাজ ও রাজনীতির আকর্ষণ তাঁকে টেনে নিয়ে গেল রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে। প্যারিসে জেফারসনের সঙ্গে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ১৮৮৭ সালে মনস্বী রাজনীতিবিদ্ রূপে পেইনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ এবং সত্যভাষণের সৎসাহস পুষ্ট হয়েছে গত বার বৎসরের অভিজ্ঞতার দ্বারা। ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিকায় এইবার ফ্রান্স ও কিছু পরিমাণে ইংল্যাণ্ড তাঁর কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠল। আমেরিকার বিপ্লবকে বার্ক সমর্থন ও অভিনন্দিত করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে বার্ক বিরূপ হলেন। ১৭৯০ সালে তিনি প্রকাশ করলেন Reflections on the Revolution in France। এরই উত্তর দিলেন টমাস পেইন তাঁর Rights of Man এ। ১৭৯১—৯২ সালে দুই খণ্ডে Rights of Man প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশিত হয় ইংল্যাণ্ডে, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসীসংস্করণ প্রকাশিত হয় ফ্রান্সে। প্রথম খণ্ড উৎসর্গ করা হয় জর্জ ওয়াশিংটনকে।[৭] Rights এ পেইন বার্ক এর যুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিদ্ধস্ত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। ফরাসী বিপ্লবের Declaration of the Rights of Man and of Citizens (১৭৮৯) এর উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে পেইন বলেছেন যে, ফরাসী বিপ্লবের নিন্দায় আশ্চর্য হ'বার কোন কারণ নেই। এ বিপ্লবের ভিত্তি সাম্য ও স্বাধীনতা; ইউরোপের অন্যান্য দেশের শাসনের প্রতিষ্ঠা অনাচার ও কুশাসনের উপর।[৮] ফরাসী বিপ্লবের যৌক্তিকতা ও সার্থকতা সম্বন্ধে পেইনের কোন সংশয় নেই। আঘাত যত প্রবল হ'বে

৭। Sir, I present you a small treatise in defense of those principles of freedom which your exemplary virtue has so eminently contributed to establish.

৮। What are the present governments of Europe but a scene of iniquity and oppression? What is that of England? Do not its own inhabitants say it is a market where every man has his price, and where corruption is common traffic, at the expense of deluded people? No wonder, then, that the French Revolution is traduced.

এর সত্যতাও তত বেশী প্রতিষ্ঠিত হ'বে।[৯] Rights এ পেইন্ রাজতন্ত্রকে কশাঘাত করেছেন। তিনি আবাহন জানিয়েছেন জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থাকে। এই পথেই হবে ন্যায় ও শান্তির প্রতিষ্ঠা। দরিদ্র ও অধিকার বঞ্চিত সম্প্রদায় সমূহের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন বহুবার। তাঁর মতে একটা জাতি বা 'নেশন্' এরই অধিকারে রয়েছে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার। এটা অবশ্য খুবই পরিস্কার যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারের কথা ভেবে দেখেন নি তিনি। কিন্তু তিনি আশাবাদী। Rights of Man এর ২য় খণ্ড শেষ হয়েছে, ভবিষ্যতের এক আশা নিয়ে—হয়ত গোটা ইউরোপ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হ'বে একটি জনকর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্র এবং মানুষ হবে স্বাধীন।[১০]

এ সময় ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ড—উভয় দেশই পেইনের কর্মক্ষেত্র ছিল। একথা আগেই বলা হয়েছে। অবশ্য ফরাসী বিপ্লব তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল বেশী, এর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বিপ্লবসঞ্জাত মানব ও নাগরিক অধিকার ঘোষণার (Declaration of the Rights of Man) খসড়া তৈরীর সময় তিনি সাহায্য করেছিলেন। বিপ্লবের প্রথম যুগে একটি প্রবন্ধে তিনি রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের দাবী জানান। অপর একটি প্রবন্ধে তিনি আলোচনা করেন সর্বজনীন শান্তি এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে। সভাসমিতি এবং লেখনীর সাহায্যে তিনি লোকায়ত্ত শাসনব্যবস্থার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াস পেতে থাকেন। ১৭৯২ সালের জুন মাসে ইংরেজ সরকার পেইনের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনেন। ইংল্যাণ্ডে গণস্বাধীনতার আদর্শ প্রচারে তিনি খানিকটা সফল হয়েছিলেন বটে, কিন্তু শাসককুলের সমর্থনে জনতা তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক বিক্ষোভের আয়োজন করে। তাঁর কুশপুত্তলিকাও দাহ করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে কবি উইলিয়ম ব্লেক পেইনকে তাঁর আসন্ন গ্রেফতার সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেন। পেইনও ইংল্যাণ্ড থেকে বিদায় নিয়ে ঝটিতি চলে আসেন ফ্রান্সে।

৯। But from such opposition the French Revolution, instead of suffering receives homage......It has nothing to dread from attacks ;truth has given it an establishment, and time will record it with a name as lasting as his own.

১০। For what we can foresee, all Europe may form but one great republic, and man be free of the whole.

ফ্রান্সে এসেই পেইন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়লেন ফরাসী রাজনীতির সঙ্গে। প্রায় সেই সময়েই জাতীয় এ্যাসেম্ব্লী ভেঙ্গে দিয়ে সেই জায়গায় জাতীয় কন্‌ভেন্‌শন্ (Convention নির্বাচিত হচ্ছে। ক্যালে নির্বাচন কেন্দ্র থেকে পেইন এই সভার সভ্য মনোনীত হ'লেন। ফরাসী ভাষা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অতি সামান্য। ফরাসী রাজনীতির অলিগলিও তাঁর অজ্ঞাত। ১৭৯৩ সালে ফরাসী রাজনীতিও ঘোরালো হয়ে আস্‌ছিল। পেইনের পক্ষে নূতন অভিজ্ঞতা প্রীতিপ্রদ হয় নি। Convention এ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সঙ্গে পেইনের মতবিরোধ চরমে উঠে ব্যক্তি হিসাবে ষোড়শ লুইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে। পেইন প্রস্তাব করলেন লুইকে আমেরিকায় নির্বাসিত করা হোক্। অপর দল এটা পছন্দ করলেন না। ১৭৯৩ সালের শেষের দিকে ফরাসী সরকার পেইনকে বন্দী করলেন। প্রায় দশ মাস তাঁকে কারাবাসে কাটাতে হয়। Robespicrre এর পতন হ'লে পেইনকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৭৯৫ সালে তিনি আবার ফিরে এলেন Conventionএ। Convention তখন শাসনতন্ত্র রচনায় ব্যস্ত। Convention, 'প্রত্যেক নাগরিকের সমান ভোটাধিকার এই নীতি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। পেইন Declaration of Rights এর উল্লেখ করে ভোটাধিকার সংস্কোচনের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। কিন্তু একটীও সমর্থক পেলেন না তিনি। Convention এর সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

পুস্তিকা ও প্রবন্ধ রচনায় পেইনের কোন ক্লান্তি ছিলনা। তাঁর লেখনী ছিল নিরলস। কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে প্রস্তুত রচনাবলীর মধ্যে সেই যাদুকরী শক্তি যেন আর ছিলনা। এসব লেখাতেও ভাবের প্রাবল্য এবং ভাষার ওজস্বিতা আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু তাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ। অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে ইউরোপ ও আমেরিকায় নব নব সমস্যা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘকাল ব্যাপী বিক্ষোভের পরে জনমত অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। পেইনের জনপ্রিয়তাও কমে এসেছে। এই প্রবন্ধ শেষ করবার আগে দু'টি রচনার উল্লেখের প্রয়োজন আছে। পেইনের শেষ জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাদের বিশেষ যোগ রয়েছে।

Age of Reason, ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৯৪ সালে;

২য় খণ্ডের প্রকাশকাল ১৭৯৬। পেইন তখনও ফ্রান্সে। পেইন ধর্মকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে রাখবার পক্ষপাতী; ধর্ম ও ভগবৎ ভক্তি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ব্যাপার। বলা বাহুল্য যে, তাঁর এই অভিমত সেযুগের পক্ষে বেশী বিপ্লবাত্মক। প্রচুর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল Age of Reason। কিন্তু আমেরিকাতেও এই কারণে সৃষ্ট হয়েছিল বহু সমালোচক ও শত্রু। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভুলেই গেল দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে পেইনের অবদানের কথা। ১৭৯৬ সালে পেইন রচনা করেছিলেন 'ওয়াশিংটনের প্রতি পত্র।' তাঁর মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল যে আমেরিকান সরকার ও প্রেসিডেণ্ট যথাসময়ে হস্তক্ষেপ করলে ফ্রান্সে তাঁর বন্ধন দশা ঘটতনা। এ বিষয়ে সত্যই হয়ত ওয়াশিংটনের ত্রুটি হয়েছিল। Letter to Washington এ পেইন যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন এবং প্রেসিডেণ্টকে যে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন, তা' ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করেছিল। স্বভাবতঃই আমেরিকাবাসী তাঁর 'পত্র' বরদাস্ত করতে পারেনি।

১৮০২ সালে প্রেসিডেণ্ট জেফারসনের আনুকূল্যে পেইন আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। কিন্তু আমেরিকাবাসীদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অনেকটাই তখন তিনি হারিয়েছেন। উপরন্তু পরিবর্ত্তিত পটভূমিকায় আমেরিকার রাজনৈতিক কোঁদল ও বিতণ্ডার মধ্যে তিনি প্রবেশ করলেন। এই বিতণ্ডাতেও স্বাভাবিক নিয়মে লেখনীই তাঁর সহায়। জীবনের প্রায় শেষ সীমায় নিউইয়র্কের American Citizen এর সম্পাদক James Cheetham এর সঙ্গে পেইন্ এক বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হ'ন। ১৮০৯ সালে Cheetham পেইনের এক জীবনী প্রকাশ করেন। এই জীবনী পেইনের অনুকূল হয়নি। ঐ বৎসরই তাঁর মৃত্যু ঘটে। অল্পকথায়, শেষ জীবনে পেইনকে আমেরিকা ভাল ভাবে গ্রহণ করেনি। ১৮১৯ সালে William Cobbett তাঁর শবাধার নিয়ে আসেন ইংল্যাণ্ডে।

বাংলার ইতিহাসের দলিলপত্র

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে শুধু সরকারী মহাফেজখানার দলিলপত্রের উপর নির্ভর করলে চলে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান হওয়ার ফলে জমিদারি দলিলপত্র খুব সম্ভব ছড়িয়ে পড়েছে এবং নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কয়েকটি জমিদার পরিবার মুল্যবান্ দলিলপত্র খুব যত্ন করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রজার সঙ্গে জমিদারদের সম্পর্ক এবং সাধারণ কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে সরকারী দপ্তরের দলিলপত্র সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে না। এই অসম্পূর্ণতা খানিকটা জমিদারি দলিলপত্র থেকে মেটান যেত। নদীয়ার রাজদপ্তরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের প্রজাদের নামধাম সহ জমা ওয়াসিল বাকির একখানা খুব বড় হিসাবের খাতা আছে কিন্তু সে খাতা এভাবে পোকায় কেটেছে যে তার পাঠোদ্ধার খুবই কঠিন। দিল্লীর সরকারী মহাফেজখানায় এরূপ দলিলপত্র পাঠোদ্ধারের নানারূপ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আছে কিন্তু সেখানেও এই পাঠোদ্ধার সম্পূর্ণ সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। কানুনগোদের কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গিয়ে মোগল আমলের মুল্যবান্ অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহ যেমন অসম্পূর্ণ হয়েছে ভয় হয় জমিদারি দলিলপত্র নষ্ট হয়ে গিয়ে বৃটিশ আমলের তথ্য সংগ্রহও সেইরূপ অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে। আমরা কাল্পনিক ঐতিহাসিক চিত্র দেখতে এতটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে আমাদের হয়ত এই অভাব চোখেই পড়বে না।

কলকাতা হাইকোর্টের শেরিফের কাগজপত্র দেখার একটা চেষ্টা আমরা করেছিলাম। কাজ বেশী এগোয় নি। যে সব ফাইল দেখা হয়েছে তাতে জেল ও House of Correction সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য হয়ত পাওয়া যায় কিন্তু মনে হয় সরকারী মহাফেজখানাতেও এই সব তথ্য পাওয়া যাবে। ১৯০৭—১৯১৮ সাল পর্যন্ত টাউন হলের জন সভার একটা ফর্দ ও

এই সব মিটিংএর আহ্বায়কদের নাম পাওয়া যায়। নিলাম বিক্রয়ের ফর্দ একটা কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার। হরেক রকমের কাগজপত্রের মধ্যে তিনজন ইউরোপীয় বন্দীর একখানা দরখাস্ত পাওয়া যায়। তারা লিখেছিল যে তাদের কলকাতা জেল থেকে আন্দামানে বদলি করা হোক। তারা কিন্তু এই দরখাস্তে বিশেষ সন্তোষজনক কোনও কারণ দেখাতে পারেনি।

কলকাতার সেণ্ট জনস্ চার্চ ১৭৮৭ সালে স্থাপিত হয়। এই চার্চের দলিলপত্র খুব যত্ন করে রাখা হয়েছে। এদের ৫২ খণ্ডে সংরক্ষিত দলিল পত্র থেকে কলকাতার আর কলকাতার আশে পাশের সামাজিক ইতিহাসের এক দিকের খানিকটা বিবরণ পাওয়া যায়। যাঁরা ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে তথ্য খুবই মূল্যবান্। পণ্যমূল্য সম্পর্কেও খানিকটা নির্ভর যোগ্য তথ্য মেলে। সরকারী কাগজপত্রের পণ্যমূল্য সব সময়ে নির্ভর যোগ্য নয়। সরকারী ঠিকাদাররা সাধারণতঃ বেশী দাম নিত। এই চার্চের একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল। তার হিসাবপত্র খুব যত্ন করে রাখা হত। ১৮০২ সালে এই স্কুল নতুন ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। এখানে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার উৎসাহ এত উগ্র ছিল যে শিক্ষার্থী বালকদের তাদের নিজেদের মধ্যেও বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলতে দেওয়া হত না। একটা নির্দেশ ছিল "The boys must be prevented from speaking the country language to each other even in their play"।

বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু মূল্যবান্ দলিলপত্র সরকারী মহাফেজখানায় আছে। ১৮২৩—১৮৪১ সাল পর্যন্ত General Committee of Public Instruction এর পাঁচখণ্ড দলিলপত্র সংগ্রহ পাওয়া যায়। এই কমিটির বাকি কাগজপত্র যেভাবেই হোক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে অনেক লেখাই হয়েছে এই মূল দলিলপত্র না দেখে। সেজন্য অনেক ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে, আর সেই ধারণা মূল্যবান্ তথ্য মনে করে অনেকেই ভুল করেছেন। পুরুষানুক্রমে এই ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করে আমরা ইতিহাস রচনা করে গিয়েছি। মেকলের ব্যক্তিত্ব ও মেকলের ইংরেজী রচনার দাপটের ফলে মেকলেকেই আমরা ভারতের পাশ্চাত্যশিক্ষার যুগের প্রবর্তক বলে জানি। কিন্তু

General Committee of Public Instruction-এর কাগজপত্র পড়লে ও সমসাময়িক অন্য দলিলপত্র দেখলে মনে হয় যে মেকলের Minute সম্পর্কে এ দাবি মেকলের লেখার মতই বাড়াবাড়ি। মেকলে চেয়েছিলেন গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে প্রাচ্য শিক্ষার অবসান—"English alone"। মেকলের মতানুসারে যদি পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেলরা চলতেন তাহলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে প্রাচ্য শিক্ষার নির্যাতনই সুরু হতো। W. H. Macnaughten মেকলের মত সম্পর্কে বলেছিলেন "All must be utterly destroyed by a *Coup de main* and nothing else will suffice"। মেকলে ছিলেন সেই দলের নেতা যাঁরা প্রাচ্য শিল্প, কলা, দর্শনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য যে "English alone" মেকলের এই নির্দেশ শেষ পর্যন্ত মেনে নেওয়া হয়নি।

মেকলে পাশ্চাত্য শিক্ষার উগ্র সমর্থক ছিলেন বলে তাঁর Minute কেই সকলে পাশ্চাত্য শিক্ষার উৎপত্তির মূল বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধ দলের অর্থাৎ Orientalist দের উপর এতে অবিচার করা হয়েছে। Orientalist-রা হিন্দু কলেজের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা শেষ পর্যন্ত চেয়েছিলেন "Proportional encouragement to be given to English and to Oriental institutions"। তাঁদের সবচেয়ে দুর্বলতা ছিল অনুবাদের উপর ঝোঁক। সেটা এতই হাস্যকর হয়েছিল যে ট্রেভেলিয়ান ঠাট্টা করে বলেছিলেন "It will be like bringing the town over the bridge instead of going over the bridge to the town"।

কিন্তু ট্রেভেলিয়ান স্বীকার করেছিলেন যে বাংলা দেশ তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতী ছিল। তিনি একটা Minute এ লিখেছিলেন, "The country desires our improved European education." তাঁর মতে সেজন্য সে শিক্ষার ব্যবস্থা করা General Committee of Public Instruction এর উচিত ছিল। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই অনেক সময় অনেকের চেষ্টার ফলে যে কাজ সুরু হয় একজনকেই তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দেওয়া হয়। রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার এবং বাংলার শীর্ষস্থানীয় অনেকের সমবেত প্রচেষ্টায় হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। General Committee of Public Instruction এর সেক্রেটারী অন্যতম

'Orientalist' সদস্য উইলসন্-এর চেষ্টায় এই হিন্দু কলেজ অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। ১৮৩১ সালের ২৭শে অক্টোবরের রিপোর্টে আমরা দেখতে পাই যে হিন্দু কলেজের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪০২। তার মধ্যে ৩০০জন ছিল "Pay boys"। ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ বিশেষ ভাবে বাঙালী সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ সময় বাঙ্গালীর ইংরেজী শিক্ষার এই উৎসাহ ঠিক অর্থোপার্জনের উৎসাহ মনে করলে ভুল করা হবে। তাঁরা বুঝেছিলেন ইউরোপীয়দের শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ তাদের শিক্ষা। রামমোহনের ভাষায় তাঁরা এই নতুন আলোকের সন্ধান চেয়েছিলেন—"Looked forward with pleasing hope to the dawn of knowledge."

মেকলে পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের "English alone" এই মতের জন্য বোধ হয় অনেকটা দায়ী। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে গভর্ণমেণ্টের ঝোঁকের জন্য কৃতিত্ব তিনি দাবি করতে পারেন না। মেকলের Minute এর তারিখ ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫। গভর্ণমেণ্টের নতুন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল ৭ই মার্চ তারিখে। Medical education সম্পর্কে যে কমিটি বসেছিল তার রিপোর্টের তারিখ ২০শে অক্টোবর, ১৮৩৪। তাতে বলা হয়েছিল—"Knowledge of the English language we regard as the *sine qua non*। সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে আয়ুর্বেদ ও ইউনানী শিক্ষার ব্যবস্থা তারপরই তুলে দেওয়া হয়েছিল। বেণ্টিঙ্ক ১৮৩২ সালেই জানিয়েছিলেন যে তিনি ইংরেজীকে আদালতের ভাষা করতে চান। গভর্ণমেণ্টের ঝোঁক সম্পর্কে বিশেষ কোনও সন্দেহ ছিল না। মেকলের দৃপ্ত রচনা বোধ হয় ৭ই মার্চের সরকারী প্রস্তাবের তীব্র আক্রমণসূচক ভাষার জন্য দায়ী। লর্ড অকল্যাণ্ড কিন্তু এই আক্রমণাত্মক আদর্শ মেনে নেননি। "English alone" এর পরিবর্তে প্রধানতঃ ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করাই গভর্ণমেণ্টের আদর্শ হয়। "All-destroying edict of 7 March" যতটা ক্ষতি করতে পারত তা করতে পারেনি। আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষার পাট গভর্ণমেণ্ট তুলে দেয়নি। মেকলের আদর্শ মেনে নিলে আরবী, ফারসী, সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা গভর্ণমেণ্ট স্কুল ও কলেজে খুব তাড়াতাড়িই বন্ধ হয়ে যেত।

মূল দলিলপত্রগুলো না দেখে একজনের কথা আর একজন পুনরাবৃত্তি করার ফলে এই ধরণের কিছু কিছু ভুল আমাদের ইতিহাসে বদ্ধমূল হয়ে আছে। মেকলের Minute-এর ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণার অনেকটা পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

এক সিপাহীর আত্মকথা

শ্রীশোভন বসু

(পূর্বানুবৃত্তি)

নবম অধ্যায়

কান্দাহার আসলে অতি দরিদ্র সহর; হিন্দুস্থানের নগণ্য স্থানের সঙ্গেও এর তুলনা করা চলে না। পেশোয়ারের চেয়েও এখানে ঘন ঘন প্রবল বেগে ভূমিকম্প হয়। সেজন্য লোকে বড় বাড়ী তৈরি করতে সাহস করে না। বড় বাড়ী বলতে একমাত্র আহমদ শাহ আবদালীর কবর। সাহেবরা লড়াই হবে আশা করেছিলেন; তাদের নিরাশ হতে হল।

সিপাহীদের যা দেবার কথা শাহ বলেছিলেন তা কাজে করার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আসলে কান্দাহার সহরের চারপাশের লোকেরাই তাঁর শাসন মেনে চলত; কোনমতেই তাঁকে সারা আফগানিস্থানের শাসনকর্তা বলা যায় না।

সরকার এবং শাহর সৈন্যরা কেন যে এতদিন থেমে রইল জানিনা। এর ফলে দোস্ত মহম্মদ কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য ভালভাবে তৈরি হলেন; উপজাতিদের ভিতর থেকেও তিনি সৈন্য সংগ্রহ করলেন। নিজেদের দেশে ফিরিঙ্গীদের দেখে আফগানিস্থানের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। তাদের ধারণা এরা অন্যায়ভাবে তাদের দেশে ঢুকেছেন। তাদের অবশ্য বলা হয়েছিল ইংরাজরা সে দেশ জয় করতে বা তাদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিতে আসেনি। তারা কিন্তু হিন্দুস্থানের ইতিহাস জানত এবং শাহ-সুজা-উল-মুলক্‌কে সিংহাসনে বসানই যে ইংরাজদের একমাত্র উদ্দেশ্য এ তারা বিশ্বাস করত না।

কয়েক মাস এখানে থাকার পর সিপাহীরা গজনীর দিকে এগিয়ে চলল। সেখানকার লোকেরা শাহর কর্তৃত্ব স্বীকার করতে রাজী হয়নি। কান্দাহার থেকে গজনী প্রায় একশ চল্লিশ ক্রোশ দূর। মাঝে মাঝে রাস্তা খুব খারাপ; যে রাস্তায় আমরা আফগানিস্থানে এসেছি তার চেয়ে অবশ্য অনেক ভাল। সবাই বলতে লাগল গজনী খুব শক্ত ঘাঁটি। আফগানদের ধারণা ছিল গজনী কিছুতেই শত্রুরা জয় করতে পারবে না।

কান্দাহার আসার সময় গিরিপথে এত কষ্ট ও পরিশ্রম করে ভারী ভারী যে সব বড় কামান আমরা বয়ে এনেছি সেগুলি বাদ দিয়ে কেন সাহেব (Kane) কেবলমাত্র ছোট ছোট কামান সঙ্গে নিয়ে চললেন। এই দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।

হু তিন হাজার সিপাহীর একটি দলও সেখানে রইল। গজনীর কেল্লা দূর থেকে দেখেই মনে হল এ বেশ শক্ত ঘাঁটি এবং বড় কামান ছাড়া তা সহজে জয় করা যাবে না।

সিপাহীদের কাছে এগিয়ে আসতে দেখে শত্রুরা সহরের বাইরে এসে দাঁড়াল। উভয়পক্ষে গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি সুরু হল। কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু শত্রুরা হটে গেল। এদেশে আসার পর এই আমাদের প্রথম যুদ্ধ। হায়দার আলি খান তখন গজনীর শাসনকর্তা। সেখানকার সমস্ত লোক দোস্তের পক্ষে ; শাহর পক্ষে কেউ ছিল না। সে জায়গা যে শত্রু জয় করতে পারবে না এ সম্বন্ধে তারা একরূপ নিশ্চিন্ত ছিল। সহরের প্রাচীর খুব উঁচু ; তার উপরে সহজে ওঠা যায় না। ঘোড়ায়-টানা কামান থেকে গোলা ছুঁড়ে তার বিশেষ কিছু ক্ষতি করা যাবে না।

গজনী জয় না করে সরকার ও শাহর সৈন্যরা সেখান থেকে চলে আসার উদ্যোগ করছে এমন সময় এক রাত্রে শত্রুর দলত্যাগী একজন আমাদের তাঁবুতে এসে একেবারে জেনারেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। জেনারেল সাহেবকে সে একটি ফটকের কথা বলে যার ভিতর দিয়ে সহরে ঢোকা যায়। এই লোকটি আমীরের পুত্র। পিতার সঙ্গে তার বিবাদ হয়েছে ; এখন গোপন ফটকের সংবাদ শত্রুকে জানিয়ে সে পিতার উপর প্রতিশোধ নিতে চায়।

কয়েকদিনের মধ্যেই একটি আক্রমণকারী দল গঠন করা হল। গাজীদের দৃষ্টি এড়াবার জন্য এই ফটক থেকে দূরে কেল্লার একদিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। ফটকটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য আর একদল লোক কয়েক বস্তা বারুদ নিয়ে সেদিকে গেল। সে রাতে আবার বেশ জোরে বাতাস বইছিল ; বাতাসের বেগে চারিদিক ধুলোয় ছেয়ে যায়। ফলে অন্ধকার আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। কামান দাগা আরম্ভ হবার পর দেখা গেল গাজীরা আলো হাতে ছুটোছুটি করছে। সারা স্থানটিতে যেন দেওয়ালী উৎসব।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বড় রকমের আগুনের ঝলক দেখা গেল। কিন্তু কামান দাগার আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা গেল না। সঙ্কেত বাঁশী বেজে ওঠামাত্র আক্রমণকারী দলটি ছুটে গেল। ফটক ভেঙ্গে পড়েছে কিনা কেউ জানে না। শাহর সৈন্যরা প্রথমে একটু পিছিয়ে আসে ; অবশ্য ক্রমাগত বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ ও বিউগিলের শব্দ শুনে তারা আবার এগিয়ে চলে। এদিকে রাতও শেষ হয়ে আসছে। অসুরের মত উন্মত্ত হয়ে গাজীরা যুদ্ধ করেছিল বটে কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। বন্দুকের গুলির সামনে তারা দাঁড়াতেই পারল না।

চারিদিকে ভীষণ হট্টগোল। কেউ বলছে ফটক ভেঙ্গে পড়েছে, কেউ বলছে ভাঙ্গেনি ; আবার কেউ বলছে আমাদের সিপাহীরা ফটকের ভিতর ঢুকে পড়েছে। আমাদের বিগ্রেডিয়ার সাহেব বাকী সিপাহীদের থামিয়ে রেখে একজন অফিসারকে

পাঠালেন। ধীরে ধীরে দিনের আলো ফুটে উঠছে। কেল্লার ভিতরে আমাদের সিপাহীদের লালকুর্তা দেখতে পাওয়া গেল। গাজীরা সব তলোয়ার হাতে নিয়ে ফটকের পথ রক্ষা করছে। কয়েকটি কোম্পানী ইউরোপীয় সৈন্য পরাজিত হয়ে পিছিয়ে এল। সিপাহীদের দুটি কোম্পানী সেখানে ছুটে গিয়ে ফটকের প্রবেশপথ অধিকার করল। ইউরোপীয়রা এই জয়লাভে মুগ্ধ হয়ে সেই রেজিমেণ্টের প্রতিটি সিপাহীর করমর্দ্দন করেছিল। শুনলাম একজন গাজীর আক্রমণে বিগ্রেডিয়ার সাহেব নিজে আহত হয়েছেন। এই স্থানটি আমরা জয় করলাম। চারিদিকে রক্তের স্রোত বয়ে গেল। যে আফগান সর্দাররা যুদ্ধ করেনি তারা এবং স্ত্রীলোকেরা সব বেরিয়ে এসে ইংরাজ জেনারেল সাহেবের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে। অপমান বা ক্ষতির হাত থেকে সব রকমে তাদের রক্ষা করা হয়।

গজনীর শাসনকর্তাকে কিন্তু কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। তার মৃত্যু হয়েছে কিনা তাও সঠিক বোঝা গেল না। চারিদিকে খোঁজার পর একজন অফিসার দেখলেন যে তিনি একটি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আছেন। তিনি তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বেন ঠিক সেই সময় হায়দার আলি খান নিজের পরিচয় দিলেন। তাকে জেনারেল সাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। জেনারেল তার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেন। তিনিও সাহেবের সঙ্গে নির্ভয়ে কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন যে নিজের মাতৃভুমি ও তাঁর প্রভু আমীরের জন্য তিনি যুদ্ধ করেছেন। আফগানরা ফিরিঙ্গীদের উপর কখনও উপদ্রব করেনি ; তবে ফিরিঙ্গীরা কেন যাকে তারা অপছন্দ করে এমন একজনকে তাদের রাজসিংহাসনে বসাতে এসেছেন ? তাদের আক্রমণে কত লোকের যে মৃত্যু হয়েছে এবং কত আফগান পরিবার যে একেবারে ধ্বংস হয়েছে তার ঠিক নেই। সব শেষে তিনি বললেন, "যদি ইচ্ছা হয় আমাকে হত্যা করুন। কিন্তু যদি আমাকে মুক্তি দেন তাহলে আমি চিরদিনই আপনাদের শত্রুতা করব। আমার দ্বারা যেভাবে সম্ভব আপনাদের বিরুদ্ধে লোককে উত্তেজিত করে কাবুল থেকে আপনাদের বিতাড়িত করব।" জেনারেল সাহেব এ শুনে কিন্তু রাগ করলেন না। তিনি হায়দার আলির সাহসের প্রশংসা করলেন। কিন্তু তিনিও তাঁর সরকারের কর্মচারী ; সরকারের হুকুমমত তাঁকে কাজ করতে হয়। এই সময় আবার ইংরাজদের যুদ্ধের অদ্ভুত নিয়ম কানুন লক্ষ্য করলাম। কোন নবাব বা রাজার সামনে হায়দার আলি খান যদি এর অর্দ্ধেক কথাও বলতেন তাহলে তৎক্ষণাৎ সেইখানেই তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হত। কিন্তু এখানে এই প্রকাশ্য দরবারে যে সাহেবরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তারাই 'সাবাস! সাবাস!' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার। তবে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য কি ? পরাজিত শত্রুকে হত্যা না করে মুক্তি দেওয়া ? এ কথা অবশ্য সত্য যে ইংরাজদের কাজের রীতিনীতি সব সময় বুঝা যায় না। তবে এ ক্ষেত্রে আশ্চর্য

ব্যাপার হল এই যে লোকটি মুখে এত সাহস দেখিয়েছিল তাকে কিন্তু যুদ্ধের পর লুকিয়ে থাকতে দেখা যায়।

গজনী সহরটি খুব বড়; চারদিক উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সহরের কেল্লাটিও বেশ বড়। আফগানদের ধারণা ছিল যে কোনও শত্রু এ সহর অধিকার করতে পারবে না। উপজাতিদের সম্বন্ধে হয়ত একথা বলা চলত। কিন্তু সরকারের সেনাদের সামনে কে দাঁড়াতে পারে? শোনা গেল আমীরের পুত্র আকবর খান ইংরাজবাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য সসৈন্যে এগিয়ে আসছেন। গজনীর পতনের খবর শোনামাত্রই কিন্তু তিনি দ্রুত পশ্চাৎ অপসরণ করলেন। অন্যান্য অবরোধের তুলনায় এই স্থানটি জয় করতে অনেক বেশী সাহেব হতাহত হয়েছিলেন। সাধারণ সিপাহী কিন্তু বেশী মারা যায় নি; তাদের সংখ্যা একশ আশী জনের বেশী হবে না। আমাদের রেজিমেণ্টের সওয়াররা এই যুদ্ধে ভাল কাজ করেছিল; শাহর সৈন্যরাও বীরত্ব দেখিয়েছিল। ১৮৩৯ সালের গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি গজনী অবরোধ করা হয়। অন্য পল্টনের[১] সঙ্গে কয়েকজন সাহেবের পত্নী এই অঞ্চলে এসেছিলেন। তাঁরা কেমন করে এলেন জানিনা। অসীম তাঁদের সাহস। জেনারেল সাহেবের স্ত্রী যেন আসল জঙ্গী মেমসাহেব। এই সব মহিলারা কোন পথে এসেছিলেন জানিনা; যে পথেই আসুননা কেন তখন সর্বত্রই যুদ্ধ চলেছে। গিরিপথের মাঝে কোন একজন মহিলাকে সৈন্য চালনা করতে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এর চেয়ে অবাক হবার আর কি আছে? পণ্ডিত দলীপরামজী প্রায়ই বলতেন, "বৎস! স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করো না। তা যেন বরফের মত—সকালে খুব শক্ত থাকে কিন্তু সূর্যের তেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বরফ গলতে আরম্ভ করে।" কিন্তু তিনি কখনও মেমসাহেব দেখেননি। অফিসাররা যদি তাঁদের স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন তাহলে পরে তাদের যে বিপর্যয়ের মাঝে পড়তে হয়েছিল ইংরাজ সেনাদলের তেমন দুর্ভোগ কখনও হত না।

গজনীতে একদল সৈন্য রেখে আমরা কাবুলের দিকে এগিয়ে চললাম। পথে খবর এল মহারাজা রণজিৎ সিংএর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর ফল কি দাঁড়ায় দেখবার জন্য অফিসাররা খুব শঙ্কিত হয়ে রইলেন। শোনা গেল শিখেরা আফগানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে এবং ইংরাজদের বিরুদ্ধে আফগানদের সাহায্য করবে এবং শিখরাজ্যের ভিতর দিয়ে যে ইংরাজবাহিনী আসছে তাদের আক্রমণ করবে। ইংরাজ অফিসারদের মত আফগানরাও খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল; কারণ তারা জানত সরকারের হাতে প্রচুর সম্পদ। তাদের সারা দেশে যা আছে ইংরাজদের একটি সহরের সম্পদই তার চেয়ে অনেক বেশী। নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়ল। প্রথমে শোনা

১। কোন পথে এই পল্টন গজনী এসেছিল সে কথা সীতারাম উল্লেখ করেননি।

গেল কান্দাহার থেকে ইংরাজরা বিতাড়িত হয়েছে এবং বোলান গিরিপথ দিয়ে দশ লক্ষ সৈন্য নিয়ে ইংরাজরা আসছে। কত রকম গুজব যে কানে আসতে লাগল। আসলে কি ঘটছে সাহেবরা জানতেন না। কাজেই তারা কোন গুজবের প্রতিবাদ করতে পারলেন না।

এমন সময় আমাদের তাঁবুতে চরের মুখে খবর এল। জেনারেল সাহেব বললেন শীঘ্রই ছুটি পল্টন আফগানিস্থানে আসছে। আমাদের মনে সাহস এল। এই পল্টন আসার আগেই আমাদের কম্যাণ্ডাররা এগিয়ে যেতে চাইলেন পাছে তারা আমাদের হাত থেকে পুরস্কার ছিনিয়ে নেয়। গজনী থেকে উত্তরে আরও আটবার কুচ করে গেলে কাবুল পৌঁছন যাবে। এই কুচ করার সময় আমীর দোস্ত মহম্মদের কাছ থেকে কয়েকজন দুত আমাদের তাঁবুতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন আমীরের ভাই নবাব জব্বর খান। তিনি ইংরাজ সেনাদলকে আফগানিস্থান ত্যাগ করে যেতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বড় সাহেবকে (পলিটিক্যাল এজেন্ট) তাঁর এই প্রস্তাবে রাজী না করিয়েই তিনি চলে যান। এই সব দুতেরা প্রায়ই ইংরাজ শিবিরে এসে বোকার মত নানা রকম প্রস্তাব করত। কোন কিছুতেই তারা ভয় পেতনা; তাদের ভরসা ছিল ইংরাজরা দূতের কোন অসম্মান করবেনা।

নবাবের চলে যাওয়ার তিনদিন পরেই খবর এল দোস্ত মহম্মদের অনুচররা তাঁর পক্ষ ত্যাগ করেছে। তাঁর পিছু নেওয়ার জন্য ছোট একটি দল প্রস্তুত হল। অফিসারদের বিশ্বাস এবার নিশ্চয়ই দোস্ত ধরা পড়বেন। হাজী কাকুর নামে একজন আফগান আমাদের দলের সঙ্গে ছিল। আমীরের মনোভাব ও গতিবিধি সব নাকি সে জানে। সোজা রাস্তায় অল্প সময়ে আমীরের আস্তানায় সে আমাদের নিয়ে যাবে বলেছিল। কয়েকবার মাত্র কুচ করে বিশ্রাম করেছি—তাও কাকুরের পরামর্শমত—ঠিক সেই অবসরে আমীর পাহাড় ডিঙিয়ে কাবুল পার হয়ে অন্য দেশে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর শিবির ও কামান আমাদের হস্তগত হল। দোস্ত মহম্মদের পালিয়ে যাওয়ার খবর শুনে শাহ বুঝতে পারলেন কাকুর আসলে বিশ্বাস-ঘাতক। তিনি তার শিরচ্ছেদের হুকুম দিলেন। ইংরাজরা তাকে বন্দী করে হিন্দুস্থানে পাঠালেন।

কোনরূপ যুদ্ধ না করেই আমাদের সিপাহীরা কাবুলে প্রবেশ করল। শাহকে রাজা বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এখানে, কান্দাহারে যেমন হয়েছিল, সাধারণ লোকে আনন্দ-উৎসবে যোগ দিলনা। শাহর নিজের সৈন্য ও দরবারের লোকেরাই যা কিছু করেছিল। লোকেরা মনে মনে আসলে আমীরের দলেই ছিল; শাহ সুজাকে তারা চায়নি।

প্রকাশ্য দরবারে শাহ কয়েকজন লোককে হত্যা করেন। তাদের গজনীতে

বন্দী করা হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন আফগান সর্দার ছিলেন। এই ঘটনায় ইংরাজ অফিসাররা খুব বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন; কাবুলের লোকেরাও শাহ্‌র উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। ম্যাকনাটন সাহেব এমন অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে তিনি শাহকে বলে পাঠালেন যদি ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আবার ঘটে তাহলে তিনি ইংরাজ সৈন্যদের সরিয়ে নেবেন। যদি তখনই সেই জঘন্য দেশ ছেড়ে চলে আসা হত তাহলে সব দিক থেকেই ভাল হত। শাহ সুজা সিংহাসনে বসেছেন; আমীর আফগানিস্থান ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। কিন্তু সবাই জানত ফিরিঙ্গী সেনারা সেখান থেকে চলে আসার পরক্ষণেই দেশে বিদ্রোহ দেখা দেবে। শাহসুজা এবং তাঁর পক্ষের লোকেরা এই ভয়ে ছিলেন এবং আমার বিশ্বাস তাঁদের একান্ত অনুরোধের জন্য সরকার সেখানে পল্টন রেখে দিলেন। কাবুলের লোকেরা বাজারে প্রকাশ্যে বলে বেড়াত যতদিন লাল-কুর্তা সিপাহীরা শাহকে রক্ষা করবে ততদিনই তিনি রাজত্ব করবেন।

আমাদের সেনাদলের অনেকে কাবুলে সিপাহীদের ছাউনিতে রইল। কয়েকজন অফিসার স্থানীয় লোকের গৃহে আশ্রয় নিলেন। বাকী সবাই সহরের বাইরে বাড়ী দখল করে সেখানে রইল। হিন্দুস্থানের মতই এখানে আমাদের দিন কাটতে লাগল। কিছুদিন পরেই শীত পড়ল; এমন ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা আমাদের দেশে কখনও পড়েনি। শীতে সিপাহীরা বড় কষ্টে পড়ল। তারা হাত পা নাড়তে পারেনা; রক্ত যেন শরীরের মধ্যে জমে গেছে। ইংবাজ সেনারা ইউরোপ থেকে এসেছে; তাদের তেমন কষ্ট হয়নি। তবে তুষারপাতের জন্য তাদের অনেকে কষ্ট পেয়েছিল। অনেকের শরীরে ঠাণ্ডায় ঘা হয়ে গেল। মানুষ সমান উঁচু হয়ে বরফ পড়ত। খাদ্যদ্রব্যের দাম খুব বেশী। আমরা, হিন্দুরা, স্নান করতে ভয় পাইনা। কিন্তু এখানে স্নান করা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। আমাদের সুখ বা আরামের কোন রকম ব্যবস্থা ছিলনা। কত লোভ দেখিয়ে শাহ এই জঘন্য দেশে আমাদের এনেছিলেন; কিন্তু তার কিছুই আমরা পেলামনা।

শীত পড়বার আগে বোম্বাই আর্মির কয়েকটি দলকে হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই সিপাহীরা জাগত্তলুক ও খাইবার গিরিপথের ভিতর দিয়ে গিয়েছিল মনে হয়। ঐ পথে দূরত্ব অনেকটা কম। পথে কোন মরুভূমি নেই, অবশ্য শিখ সৈন্যদের আক্রমণের ভয় আছে। যদিও সরকারের সঙ্গে শিখ শাসনকর্তাদের বন্ধুত্ব ছিল তবুও তারা সুযোগ পেলেই ফিরিঙ্গীদের আক্রমণ করত। আমাদের সৈন্যসংখ্যা খুব কমে গেল। কিছুদিন অবশ্য নির্বিঘ্নে কাটল।

নিজেদের দেশে ইংরাজদের থাকতে দেখে আফগানরা অল্পকাল পরেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ম্যাকনাটন সাহেব যা করবেন বলেছিলেন তা কাজে করা হয়নি বলে তারা অভিযোগ করল। তিনি নাকি বলেছিলেন শাহ নিরাপদে সিংহাসনে বসলেই ইংরাজ সেনারা হিন্দুস্থানে ফিরে যাবে। তারা বলল রাজা সিংহাসন লাভ

করেছেন বটে কিন্তু ফিরিঙ্গীরা এখনও তাদের দেশে রয়েছে। ম্যাকনাটন সাহেব দেখালেন যে অধিকাংশ সিপাহীকেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা প্রতিবাদ করে বলল সে সব সিপাহী ত যায়নি এবং আসলে ইংরাজরাই তাদের দেশ জয় করে বসে আছেন। সাহেব বলেছিলেন কাবুলের সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী শাহ সুজাকে যারা বাধা দিয়েছে তারা ছাড়া অন্য আফগানদের ইংরাজ সরকার শত্রু বলে মনে করেন না। আফগানরা জানাল যে তাদের রাজা কে হবে না হবে সে তারাই স্থির করবে। এই ভাবে আফগান সর্দার ও ইংরাজ দরবারের মধ্যে বিবাদ সুরু হয়।

এই রকম বিবাদ সত্বেও অনেক আফগান ভদ্রলোক সাহেবদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন এবং অনেক আফগান মহিলা গোপনে সাহেবদের সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন। সে দেশে মেয়েরা বোরখা পরে চলাফেরা করে। তাদের কেউ দেখতে পায় না বটে তারা কিন্তু সবাইকে দেখে। সহরে যে সব সাহেব থাকতেন তাদের গৃহে যেন অভিসার সুরু হল। সুদর্শন বলে ফিরিঙ্গীদের মেয়েরা খুব পছন্দ করত। কাবুলের মেয়েদের সুন্দরী বলে অহঙ্কার ছিল। যার রং যত ফর্সা তাকে ততই সুন্দরী মনে করা হত। মেয়েদের সঙ্গে এভাবে মেলামেশায় অফিসারদের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা দেখা দেয়। তাদের কেউ বা ছুরিকাহত হলেন; কাউকে বা লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। মেয়েদের জন্যই যত গণ্ডগোল। সম্ভ্রান্ত বংশের কয়েকজন মহিলা বড় সাহেবদের কাছে যেতেন। কেউ বলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই নিজেদের স্বামীরাই সাহেবদের কাছে তাদের পাঠিয়েছেন। আবার কেউ বা বলত অন্য কোন উদ্দেশ্যে তারা সেখানে যেতেন। একথা অবশ্য সত্যি এই মহিলারা যে গোপনে সাহেবদের কাছে যাতায়াত করতেন এ তাদের স্বামীরা জানতে পেরেছিলেন। কারণ পরে দেখেছি আর গোপনে যাওয়ার দরকার ছিলনা; সবার সামনেই তারা যেতেন। দেশের সব লোক যখন ফিরিঙ্গীদের সর্বত্র নিন্দা করে বেড়ায়, ঘৃণায় তাদের 'কাফের' বলে ডাকে তখন এমন কাজ কি করে সম্ভব হয় ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। মেয়েদের খেয়ালখুসীর কোন সীমা নেই। প্রথমে হয়ত সরকারের উদ্দেশ্য জেনে নেবার জন্যই তাদের পাঠান হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল নিজেদের স্বামীর চেয়ে সাহেবদেরই তারা বেশী পছন্দ করেন। শ্রীশুকদেবজী বলেছেন—"নীচজাতের মেয়েরা স্বামী ত্যাগ করে চলে যায়। পৃথিবীর সকল দেশেই এক রীতি এবং আবহমান কাল থেকেই এটা চলে আসছে।" কিন্তু এই মেয়েরা ত নীচজাতের নয়। এদের কেউ কেউ আফগান সর্দারদের স্ত্রী এবং তারা স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করেনি।

দশম অধ্যায়

আফগানদের নিয়ে ইংরাজরা কয়েকটি সেনাদল গঠন করেছিলেন। ইংরাজদের কাছে সময়মত মাইনে পাওয়া যায় শুনে আফগানরা সরকারী ফৌজে যোগ দিয়েছিল। শাহ সুজার সেনাদলের একজন ক্যাপ্টেনকে এই সেনাদলের কম্যাণ্ডার নিযুক্ত করা হয়।

আমীর দোস্ত মহম্মদ বোখারার দিকে চলে গেছেন। শোনা গেল সেখানে তাঁকে বন্দী করা হয়েছে। কিছুদিন পরেই খবর এল তিনি সেখান থেকে পালিয়ে গেছেন এবং ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সসৈন্যে আসছেন। তাঁকে আক্রমণ করতে আমাদের একটি দলকে পাঠান হল। সেগান সহরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে নতুন আফগান সেনাদল কিছু না করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের যুদ্ধ করতে বলা হলে তারা অফিসারদের পর্যন্ত ভয় দেখিয়েছিল। এ সত্বেও ইংরাজরা আমীরকে পরাজিত করেন। তিনি পুনরায় পালিয়ে যান। তাঁর অনুচররা সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে; মাত্র কয়েকজন তাঁর সঙ্গে ছিল।

এর পর ছোট খাট যুদ্ধে ইংরাজদের কখনও হার হয়েছে বটে তাতে কিন্তু আমীরের বিশেষ কোন লাভ হয়নি। এদিকে সরকার পক্ষের আরও অনেক সৈন্য কাবুলে এসে পৌঁছল। এই দেখে আমীর যুদ্ধ করার আশা ত্যাগ করলেন এবং আফগান ও ফিরিঙ্গী—দুপক্ষকেই অবাক করে দিয়ে কাবুলে এসে পুত্রসহ আত্মসমর্পণ করলেন। সরকার তাঁকে হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে কলকাতায় আটক করে রাখলেন।

শাহ সুজার দরবারে খুব উল্লাস সুরু হল। তাঁর সব শত্রু নিপাত হয়েছে। কিন্তু শাসনকর্তাকে লোকে যেখানে ঘৃণা করে তখন তাদের কে শাসন করবে? আফগানরা ভেবেছিল শাহর অনুরোধে দোস্ত মহম্মদকে হত্যা করা হবে। কেউ বলল কাবুলে তাঁকে হত্যা করার সাহস না থাকায় ইংরাজরা দোস্তকে হিন্দুস্থানে নিয়ে গেছেন। শাহর বিপক্ষ দলের সর্দাররা এই শুনে ভাবল তাদিকেও এভাবে বন্দী করে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। ফলে তারাও ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল। পার্বত্য জাতিগুলিও ইংরাজদের প্রজা হয়ে দাঁড়াবে এই ভয় দেখিয়ে সর্দাররা তাদিকেও ইংরাজদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। আফগানরা কয়েকবার বিদ্রোহী হয়ে উঠল বটে কিন্তু শীঘ্রই তাদের দমন করা হয়। তারা লাল-কুর্তা দলের বন্দুকের গুলিকে ভীষণ ভয় করত।

ইংরাজদের কাবুলে আসার দু বছর পরে এই প্রথম সহরে বিদ্রোহ দেখা দিল। প্রথমে মাত্র কয়েকজন অসন্তুষ্ট আফগান এই বিদ্রোহ সুরু করে। তারা বড় সাহেব বার্নেসের বাড়ী ঘেরাও করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বাগানের মধ্যে ছোট

দরজা দিয়ে পালিয়ে যাবার সময় সাহেবকে তাঁর নিজের আফগান চাকর হত্যা করে। আরও দু তিনজন ইংরাজ অফিসারকে হত্যা করা হয়। বার্ণেস সাহেবের হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়ার পরেই সাধারণ লোকে এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। সারা সহরেই মারামারি সুরু হয়ে গেল। এমন অতর্কিতে এই আক্রমণ সুরু হয় যে আমাদের অফিসাররা এর জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না। আমাদের সেনারা এক জায়গায় না থেকে ছড়িয়ে ছিল। একদল ছিল সহরে, আর একদল সহর থেকে এক ক্রোশ দূরে বাদশাহীবাগে। এ সত্বেও ইংরাজরা নিজেদের ঘাঁটি রক্ষা করতে লাগলেন। প্রতিদিনই উপজাতিরা এসে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে এবং এমন কি শাহর নিজের দরবারেও বিশ্বাসঘাতকতার আভাস পাওয়া গেল।

এইবার ইংরাজদের বিপদ ও দুর্ভোগ সুরু হল। তাদের সব জিনিসপত্র শত্রুরা লুট করেছে বা পুড়িয়ে দিয়েছে। সৈন্যদের মনের জোরও অনেক কমে গেছে। শীতও এমন ভয়ঙ্কর পড়েছে যে হিন্দুস্থানী সিপাহীরা একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছে। গুজব শোনা গেল দোস্তর পুত্র আকবর খান সৈন্য নিয়ে আসছেন এবং তিনি নিজেই সৈন্যচালনা করছেন। প্রতিদিনই যুদ্ধ হচ্ছে। ইউরোপীয়দের ভাল খাবার জিনিস কিছু নেই; তাদের মন ভেঙ্গে গেছে। এই সব কারণে তারা পূর্বের মত লড়তে পারছে না। এখন চারিদিকেই শত্রু। শত্রুকে হটানর অনেক চেষ্টা করা হয়। কখনও কখনও এতে ফল হত বটে কিন্তু প্রতিবারেই ইংরাজদের প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। বেহমেরুর যুদ্ধে আমাদের রেজিমেণ্ট যোগ দিয়েছিল। কাপুরুষের মত হেরে গিয়ে আমরা পিছিয়ে আসি। এই যুদ্ধে আমাদের ভীষণ ক্ষতি হয়েছিল। সিপাহীরা যুদ্ধে তেমন অভ্যস্ত ছিল না। এই দেশে আসার জন্য তারা অনুতাপ করতে লাগল। ক্যাণ্টনমেণ্ট অঞ্চলে শত্রুরা লুকিয়ে থেকে গুলি ছুঁড়ে আমাদের বিব্রত করে তুলল। শত্রুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। হাজার হাজার লোক তাদের পক্ষে যোগ দিচ্ছে। আমাদের চেয়েও আফগানদের বন্দুকে আরও দূরে গুলি ছোঁড়া যেত। শত্রুরা সরাসরি আমাদের আক্রমণের সামনে কখনও দাঁড়াতে পারেনি বটে কিন্তু তারা প্রাচীর বা গৃহের আড়াল থেকে গুলি ছুঁড়ে আমাদের বড় বিপদে ফেলেছিল।

কাবুলের চারপাশের পাহাড় থেকে আফগানদের বারবার তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা সরে এলেই তারা আবার আরও লোক নিয়ে এসে তা দখল করত। আফগানরা ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি এক রকম জামা পরত—তাকে বলা হয় 'পোস্তিন'। এই জামা গায়ে থাকলে তলোয়ারের আঘাতে কোন ক্ষতি হত না; এমন কি বন্দুকের গুলিও জামায় লেগে ফিরে আসত। লোকের ধারণা ছিল আফগানদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে দুররানি নামে এক উপজাতি, যুদ্ধে অজেয়। একদিন এদের একদল সওয়ারকে দেখতে পেলাম। একটি পাহাড়ী

খাদ থেকে কুড়ি পা দূরে তারা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের একদল সিপাহী সেখানে লুকিয়ে ছিল। অফিসাররা সিপাহীদের বন্দুক ছুঁড়তে প্রস্তুত হতে বললেন। সবাই এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু গুলির আঘাতে মাত্র তিন চারজন সওয়ার মারা গেল; বাকী সবাই পালিয়ে যায়। সিপাহীরা এতে আরও দমে গেল। শীতও ক্রমে বেশী পড়ছে। আমরা একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছি; হাত পা নাড়তে পারিনা। হাতের ও পায়ের আঙুলে খুব যন্ত্রণা বোধ হয়। ইংরাজ সেনাদলে দুর্দশার আর শেষ নেই। একটানা যুদ্ধ ও পাহারা দেওয়া এবং খারাপ খাওয়ার ফলে সবার শরীর ভেঙ্গে পড়েছে।

আগেই বলেছি আমাদের সেনারা দু জায়গায় ছিল। তার ফলে সেনাদলের শক্তি অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। শাহীবাগ অঞ্চলটি শত্রুরা অধিকার করে; সেখান থেকে তারা আমাদের উপর আক্রমণ চালাত। কয়েকবার এই বাগানটি জয় করার চেষ্টা করা হয়; তাতে কোন সুফল পাওয়া যায় নি। এই রকম চেষ্টায় আমাদের অনেক সিপাহী মারা যায়। সে সময় লোক ক্ষতি ছিল আমাদের পক্ষে মারাত্মক। সরকার ও শাহসুজার সব সৈন্যকে সেখানে পাঠানর জন্য গজনী ও কান্দাহারে খবর পাঠান হয়। সম্ভবতঃ পথিমধ্যেই সংবাদবাহকদের হত্যা করা হয়েছিল। কিছুদিন পরে একদল গুর্খা সৈন্য আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। একজন সাহেব তাদের চালনা করছিলেন। কিন্তু তাদের সবাইকেই মেরে ফেলা হয়, মাত্র দুজন অফিসার কাবুলে পালিয়ে যান। এই দুর্ঘটনায় অবস্থা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। সেদেশে সরকারের সকল সেনারই এমন দশা হবে আমাদের মনে হল।

এই সময় এমন এক ঘটনা ঘটল যা পূর্বে কখনও শুনিনি বা দেখিনি। সর্দাররা নিজেরাই সন্ধির সর্ত ঠিক করে সরকারের কাছে দূত পাঠালেন। তারা বলেছিলেন ইংরাজসেনারা এখন তাদের কবলে। ইচ্ছা করলেই তারা তাদের ধ্বংস করতে পারেন কিন্তু যদি তারা সে দেশ ছেড়ে চলে যায় তাহলে তারা কিছু করবেন না। এই সর্তের কথা জানার পর অনেক সাহেব নিজেদের অপমানিত বোধ করেন। এরা জেনারেল ও অন্যান্য কম্যাণ্ডিং অফিসারদের দোষ দিতে লাগলেন—তারা নাকি সব বৃদ্ধ এবং একেবারে অকর্মণ্য হয়ে পড়েছেন। কয়েকদিন যুদ্ধ বন্ধ রইল। এই সময় শত্রুরা আরও কয়েকজন দূত পাঠিয়েছিল। আমাদের শিবিরে নানা রকম সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। কেউ বলল অবিলম্বে আমাদের পিছিয়ে যাবার আদেশ হবে নয়ত সৈন্যরা সব অস্ত্রত্যাগ করে দাঁড়িয়ে থাকবে; কেউ বা বলল ইংরাজ সেনারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এই কথাবার্তায় কোন ফল হল না। আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল।

অবশেষে ম্যাকনাটন সাহেব বলে পাঠালেন যে তিনি এই সর্ত মানতে রাজী আছেন। আমীর আকবর খান নিজে আলোচনা করতে এলেন। শোনা গেল ম্যাকনাটন ও জেনারেল সাহেব সন্ধির সর্ত পালন না হওয়া পর্যন্ত জামিন থাকতে

সম্মত হয়েছেন। এর দুতিনদিন পরে সৈন্যরা সব বাল-হিসার থেকে ক্যান্টনমেণ্টে চলে এল। চলে আসার সময় আমাদের কোনরূপ বাধা দেওয়া হয়নি। এই সময়ে অফিসারদের স্ত্রীরা অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরা সবাই জামিন রাখার বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু তাঁদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে যখন সাহেবরা একাজ করলেন তখন তাঁরাও তাঁদের স্বমীদের সঙ্গে চললেন। আমাদের সেনাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য ও গাড়ী পাঠিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি সর্দাররা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে সব কিছুই এলনা। এমন দুর্দশার মধ্যে আরও কিছুদিন আমরা রইলাম। আমাদের তাঁবুতে খাদ্যদ্রব্য বা অন্যান্য জিনিসপত্র যাতে না আসে আফগানরা সেই চেষ্টা করত। এ ছাড়া এই সময় আমাদের উপর তারা আর কোন উপদ্রব করেনি। জিনিস-পত্রের দামও ছিল বড় বেশী। সবারই কষ্ট হচ্ছে; বিশেষ করে ইউরোপীয়ান অফিসারদের কষ্ট যেন আরও বেশী। শুকনো ফল ও গম ছাড়া আর কোন খাবার তাদের ছিলনা।

একদিন বড় সাহেব ও তার দেহরক্ষী এবং সর্দারদের মধ্যে আলোচনা চলেছে এমন সময় খবর এল আকবর খান নিজে ম্যাকনাটন সাহেবকে হত্যা করেছেন। তুফানের সময় ঝড়ের গর্জনের মত অল্পক্ষণ পরেই লোকজনের চীৎকার শোনা গেল এবং শিখেরা আমাদের তাঁবু আক্রমণ করল। ম্যাকনাটন সাহেবের মৃত্যু সংবাদ সংবাদ সত্য। দুজন কমিশনারকেই এভাবে প্রাণ হারাতে হল। এই বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রতিহিংসায় জেনারেল সাহেব সহর আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। অন্যান্য অফিসাররা বললেন সিপাহীরা এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে; তারা এ সময় যুদ্ধ করতে পারবেনা। পরে এ দেশ ছেড়ে ফিরে যাবার সময় যেভাবে তাদের বধ করা হয়েছিল তার চেয়ে এসময় যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করা ছিল অনেক ভাল। সে সময় প্রত্যেকেরই যেন বুদ্ধিলোপ হয়েছিল। ইংরাজ অফিসাররা তাদের মনের স্বাভাবিক জোর ও উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন, এত রকম বিপদ ও দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে তাদের মনোবল একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, শুনলাম শাহ সুজা ইংরাজদের বিরুদ্ধে আমীরের পক্ষে যোগ দিয়েছেন, ঘটনাচক্রে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে তিনি নিজেকে ইংরেজের বন্ধু বলে পরিচয় দিতে ভয় পেয়েছেন।

এইবার আফগানিস্থান থেকে আমাদের ফিরে আসার পালা। শীতকাল; পথের উপর চারফুট বরফ জমে আছে। কাবুল ছেড়ে আসার প্রথম দিনে আফগানরা কোন উপদ্রব করেনি। দ্বিতীয় দিনও ভালভাবে কেটে গেল। তৃতীয় দিনে পল্টনের সিপাহী, চাকরবাকর ও অন্যান্য লোকজন ও মালপত্র সব একসঙ্গে মিশে গিয়ে ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। এই রকম গোলমাল দেখে আফগানরা আমাদের উপর চড়াও হল। পাহাড়ের উপর থেকে তারা আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। আমাদের তখন অসহায় অবস্থা; আমরা যেন হাত-বাঁধা বন্দী।

আকবর খান নিজে আমাদের পিছনে আসছিলেন। এই রকম বিশ্বাসঘাতকতার কথা তাঁকে জানান হলে তিনি বললেন যে তাঁর অমতেই এ সব করা হচ্ছে এবং গাজীদের শাসন করার ক্ষমতা তাঁর নেই। জামিনস্বরূপ আরও অফিসারদের চাওয়া হয় এবং তারা চলেও গেলেন। নিজেদের বুদ্ধিলোপ হওয়া ছাড়া এমন সর্তে রাজী হওয়ার কি কারণ ছিল বুঝিনা। কারণ অফিসারদের এভাবে চলে যাওয়ার ফলে আমাদের সেনাদলে নেতার সংখ্যা কমে যেতে লাগল। একজন সাহেব চলে যাওয়া মানে প্রায় দুশ সিপাহী হারানর ক্ষতি। অবশেষে আফগানরা বলল যে জেনারেল সাহেবকে জামিন দিলে তবে তারা ইংরাজ সেনাদলকে রক্ষা করার ভার নেবে। তিনি এতে সম্মত হওয়ায় সবাই অবাক হয়ে গেল। বার্নেস ও ম্যাকনাটন সাহেবের কথা মনে করে এই অবস্থায় তাঁরই বা আর কি করার ছিল? জেনারেল সাহেব চলে যাওয়ার পরেই সেনাদলে নিয়ম শৃঙ্খলা সব ভেঙ্গে পড়ে। যার যা খুশী করতে লাগল। ফলে আফগানরা সহজেই আমাদের বিব্রত করে তুলল। আমাদের অনেক লোককে তারা হত্যা করে। প্রাণভয়ে কিছু সিপাহী ও চাকর শত্রুর সঙ্গে যোগ দেয়।

যে রেজিমেণ্টে আমি ছিলাম তার দেখা পাওয়া গেল না। গোরা সৈন্যদের সঙ্গে থাকলে হয়ত এদেশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারব এই ভেবে তাদের একটি দলে ভিড়ে গেলাম। কিন্তু ভাগ্যের লেখা কে খণ্ডাতে পারে? যুদ্ধে প্রতিদিনই আমাদের লোক মারা পড়ছে। সামনে এবং পিছনের দিক থেকে এবং এমনকি পাহাড়ের উপর থেকেও শত্রুরা আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। আমরা যেন নরকের মধ্যে পড়েছি। সে সময়ের বিভীষিকা বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই। কিছুদূর গিয়ে দেখা গেল পাথর দিয়ে উঁচু করে রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে। পাথর সরিয়ে যাবার সময় আমাদের সৈন্যদলটি একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। সিপাহীরা খুব বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিল; কিন্তু শত্রুর সংখ্যাধিক্যের কাছে তারা হেরে হায়। মাথায় গুলির আঘাতে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। জ্ঞান ফিরতে দেখি একটি ঘোড়ার পিঠে আমাকে বেঁধে কাবুলের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বুঝতে পারলাম সেখানে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস বলে আমাকে বিক্রি করা হবে। আমি তাদের বললাম হয় আমাকে গুলি করে মেরে ফেল কিম্বা আমার মুণ্ড কেটে ফেল। পুস্তু এবং হিন্দি ভাষায় আফগানদের গালাগালি করতে লাগলাম। অনেকবার ছোরা উঁচিয়ে আমাকে ভয় দেখান হয়। আমি কিন্তু মুখ বন্ধ করলাম না। মরতে ভয় পাচ্ছিনা দেখে যার হাতে ধরা পড়েছি সেই লোকটি যদি চুপ না করি তাহলে তখনই আমাকে মুসলমান করা হবে বলে ভয় দেখাল। সারা রাস্তায় কত বীভৎস শব পড়ে রয়েছে। বরফের ভিতর থেকে কোথাও হাত পা বেরিয়ে আছে, কোথাও বা ইউরোপীয় ও হিন্দুস্থানী সিপাহীদের দেহের অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে; আবার কোথাও বা মরা ঘোড়া ও উট পড়ে আছে। এ দৃশ্য কখনও ভুলব না।

এমন বিপদেও ভয় না পেয়ে আমি মরতে প্রস্তুত দেখে আফগান মালিক আমার উপর সদয় হলেন। ঘোড়া থেকে নামিয়ে উটের পিঠে ঝোলার সঙ্গে আমাকে বাঁধা হল। ঘোড়ার পিঠে নীচুতে মাথা ঝুলিয়ে যাওয়ার চেয়ে এ অনেক ভাল। আফগানটি বরফ দিয়ে আমার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে দিলেন; এতে সব যন্ত্রণা দূর হল। বন্দুকের গুলি লেগে মাথার খুলিতে আঘাত লেগেছিল। গায়ের চামড়াতেও অনেকখানি ক্ষত হয়েছিল। চার পাঁচ দিনের মধ্যে আমরা কাবুলে হাজির হলাম। আফগান পোষাক পরিয়ে আমাকে বাজারে ক্রীতদাস বলে বিক্রি করে দেওয়া হল।

ধনী আফগানরা হিন্দুস্থানীদের খুব পছন্দ করত। তাদের অনেক হিন্দুস্থানী চাকর ছিল। আমি দেখতে ভাল; শরীরেও শক্তি আছে। আমার দাম ঠিক হল দু'শ চল্লিশ টাকা। ওসমান বেগ নামে এক ব্যক্তি আমাকে কিনলেন। আমার সঙ্গেই বাজারে আরও অনেক সিপাহী ও কয়েকজন ইউরোপীয় বিক্রির জন্য ছিলেন। আফগান সেনাদের যুদ্ধবিদ্যা শেখানর কাজে ইউরোপীয়দের নিয়োগ করা হবে। তাদের কয়েক বোতল সিরাজী মদ দেওয়া হয়েছিল। এই পেয়ে তারা আমাদের মত আর ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য দুঃখ করেনি। ইউরোপীয়দের মধ্যে কোম্পানী বাহাদুরের সেনাবাহিনীর এক সাহেব রয়েছেন দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন সরকার শীঘ্রই এ দেশ জয় করতে সৈন্য পাঠাবেন এবং আমরা যদি ততদিন বেঁচে থাকি তাহলে তারা আমাদের সবাইকে উদ্ধার করবে। যতদূর মনে পড়ে তাঁর নাম Wallan (সম্ভবতঃ হুইলার)। এখন আর ঠিক নাম আমার মনে নেই। তাঁর কথা শুনে অনেকটা শান্তি পেলাম।

নতুন মালিক আমাকে তেমন অনাদর করেন নি। কিন্তু তিনি ভয় দেখালেন যদি তাঁর কথা না শুনি বা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করি তাহলে আমাকে খোজা করে বেশী টাকায় বিক্রি করে দেবেন; আমাকে সারা জীবন হারেম পাহারা দিতে হবে। তিনি তাঁর ভাষায় আমাকে বেশী কথা বোঝাতে পারতেন না। সেজন্য আমাকে ফার্সী শিখতে বললেন। ওয়ালন সাহেবের কথা একদিন সত্য হবে ভাবতাম। নাহলে বন্দীদশায় হয়ত আত্মহত্যা কিম্বা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতাম। মহম্মদ সুফী নামে এক মৌলভীর কাছে ফার্সী শিখতে আমাকে পাঠান হয়। প্রথম প্রথম তিনি কেবল আমাকে গালাগালি করতেন; আমাকে বলতেন "মুসরেক"।[১] কিন্তু যখন দেখলেন কষ্ট করে আমি তাঁর ভাষা শিখছি তখন তার সুর বদলে গেল। আমাকে মুসলমান করবার জন্য তিনি নানা রকম চেষ্টা করেন।

"এখন আমি কোথায় আছি জানিনা; এমন কি প্রথমে কোথা থেকে এসেছি তাও জানিনা। হায়! আমি যেন নিজেকেই ভুলে গিয়েছি।"

১। যারা মূর্তি পূজা করে।

মুসলমান ধর্ম আমি গ্রহণ করি নি। বরং ভাগ্যে যা লেখা আছে তা সহ্য করার জন্য মন শক্ত করলাম। প্রথমে আমাকে কেবলমাত্র প্রভুর জন্য তামাক তৈরি করতে হত। এর চেয়ে হীন কাজ যে আমাকে করতে হয়নি তার জন্য ভাগ্যকে ধন্যবাদ। আমি হিসাবের কাজ জানি—এ কথা শোনার পর ওসমান বেগ তাঁর নিজের হিসাবপত্র রাখার ভার আমাকে দিলেন। এই ঘটনার পর তাঁর পরিবারে আমার মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে যায়।

(ক্রমশঃ)

স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ ও আকাঙ্খা
(১৯০৫-০৬)

পূর্বানুবৃত্তি

উমা মুখোপাধ্যায়

(৪)

জাতীয় শিক্ষা

১৯০৫-এর জাতীয় আন্দোলনে যে কয়টি ভাবধারার বিবর্তন ঘটে, তন্মধ্যে 'বাংলার সংহতি', 'বয়কট' ও 'স্বদেশীর' পাশে 'জাতীয় শিক্ষার' আদর্শও ছিল উল্লেখযোগ্য। সুপ্রচলিত ইংরেজী শিক্ষার অসারতা ও ব্যর্থতার ফলে দেশবাসীর মনে বহুদিন পূর্ব হ'তে যে অসন্তোষ ধুমায়িত হ'তে থাকে, জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন তারই স্বাভাবিক পরিণতি।

উনবিংশ শতকে ইংরেজ প্রবর্তিত যে শিক্ষা-ব্যবস্থা, তার ত্রুটি ছিল বহুবিধ। প্রথমত, এ শিক্ষা ছিল একান্তভাবেই পুঁথিগত। বিদ্যার সংগে জীবনের যোগা-যোগ ছিল যৎকিঞ্চিৎ। ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনাশক্তির স্ফুরণের চেয়ে সেই বিদ্যাশিক্ষার আবহাওয়ায় বড় ঠাঁই পেতো কোন রকমে পরীক্ষা-পাশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী-লাভ। যে পরিমাণে শক্তি ও সময় ব্যয়িত হতো, সে পরিমাণে বিদ্যাশিক্ষা হতো না, আর যেটকুও বা বিদ্যাশিক্ষা হতো, তা জীবনের স্বাভাবিক অংগে পরিণত হতো না। দ্বিতীয়ত, এই শিক্ষা-পদ্ধতিতে ব্যবহারিক বা কারিগরী শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী ও সম্মান লাভের পরেও শিক্ষার্থীদের সাংসারিক ক্ষেত্রে বরণ করতে হতো নিদারুণ আর্থিক নৈরাশ্য। তৃতীয়ত, এ-শিক্ষা দেশ-প্রীতি বা জাতীয়তাবোধ সঞ্চারে সহায়তা না করে বরং ছাত্রদের মনে বিজাতীয় ও বিদেশীয় ভাবের সৃষ্টি করত। বিদেশী শাসনযন্ত্র পরিচালনার উপযোগী ও সহায়ক ইংরেজের অনুগত এক কেরাণাগোষ্ঠী সৃষ্টি করাই ছিল এ শিক্ষার মূল লক্ষ্য—সত্যকার মনুষ্যত্বের বিকাশ বা দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে অনুরাগ জন্মানো এর উদ্দেশ্য নয়। উনবিংশ শতকের শেষভাগে আমাদের দেশে যে জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ দেখা যায়, প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষায় তার স্বাভাবিক সাড়া ছিল না। স্যার উইলিয়াম হাণ্টার এ প্রসংগে লিখেছিলেন, ইংরেজী শিক্ষার আওতায় যারা গড়ে উঠ্ছে, তাদের মনে না আছে নিয়মানুবর্তিতা, না আছে

ধর্মভাব, না আছে তৃপ্তির স্বস্তি। এ শিক্ষায় যে কেরাণীর দল ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলেছে, সরকারের সকল চাকুরীর দুয়ার তাদের সম্মুখে খুলে ধরলেও তাদের সন্তুষ্ট করা যাবে না।

এদিকে ইংরেজী শিক্ষায় পুষ্ট যে সম্প্রদায় তাদের সংগে জনসাধারণের সৃষ্টি হয় এক দারুণ ব্যবধান। ইংরেজী শিক্ষার পূর্বে এদেশে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু ছিল, সরকারী নীতির ফলে তা উপেক্ষিত ও ক্রমে অবলুপ্ত হ'তে থাকে; অথচ তৎপরিবর্তে জনসাধারণকে নূতন আলো দেবার ব্যবস্থাও দেখা দিল না। এর পরিণতি হয় এই যে, জনসাধারণের জীবন থেকে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় বহুদূর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সরকারী শিক্ষা-নীতির এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপূর্ণতা সম্পর্কে আমাদের দেশের যে কয়জন মনীষী গত শতকের শেষভাগেই চিন্তা করতে থাকেন, তাঁদের মধ্যে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও বিপিন চন্দ্র পাল প্রভৃতির নাম শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়। স্যার র্যালে পরিচালিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কাজকর্ম সুরু হলে (জানুয়ারী-জুন ১৯০২) এই চিন্তানায়কগণ শিক্ষা সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করে কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। এই বিশিষ্ট পরিবেশে প্রকাশিত হয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের A Note of Dissent, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের Note on University Reform শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ ('নিউ ইণ্ডিয়া', মার্চ-মে, ১৯০২), বিপিন পালের The Revised Scheme of Primary Education in Bengal নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধ ('নিউ ইণ্ডিয়া', ১৯০২) এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের An Examination into the Present System of University Education and a Scheme of Reform শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ।[১] সতীশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষার এই আকাঙ্খা কেবল লেখালেখির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, ইহাকে বাস্তবে রূপদানেরও সার্থক প্রচেষ্টা করেছিলেন ডন সোসাইটী স্থাপন করে (জুলাই, ১৯০২)। বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষার ত্রুটিগুলি দূর করে ছাত্রগণকে ব্যবহারিক শিক্ষাদান, তাদের নৈতিক চরিত্র-গঠন ও তাদের অন্তরে দেশপ্রেমের সঞ্চার করাই ছিল এই সোসাইটীর মূল লক্ষ্য। এক কথায় ডন সোসাইটী ছিল সরকারী শিক্ষার পরিপূরক স্বদেশ সেবার কর্মশালা। ১৯০৫-এর রাষ্ট্রিক আন্দোলনের সংগে জাতীয় শিক্ষার যে আন্দোলন আনুসঙ্গিকভাবে দেখা দেয়, তার আত্মিক পূর্বপুরুষ হলো এই ডন সোসাইটী। ১৯০২-০৫ এর মধ্যে প্রায়

১। এই প্রবন্ধটি ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর অর্থানুকূল্যে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়ে ১৯০২-সনের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সামনে পেশ করা হয়েছিল। পরে 'ডন' মাসিকের তিন সংখ্যায় (এপ্রিল-জুন, ১৯০২) উহা ছাপা হয়।

শ' পাঁচেক যুবক এই সোসাইটীতে জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হয় ও নতুন নতুন চিন্তা ও আদর্শের সংগে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করে। ডন সোসাইটির ছাত্র ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ লিখেছেন : "ডন সোসাইটি ও সতীশচন্দ্র মুখার্জীর সান্নিধ্যে আসায় আমার অন্তরে যে মনোভাবের সৃষ্টি হয় তাহাই আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারিত করে" ('যুগান্তর', ৬ই নভেম্বর, ১৯৫৭)। মনীষী বিনয় সরকারও লিখেছেন ডন সোসাইটী ও সতীশবাবুর পাল্লায় পড়েছিলাম বলে জীবন ধন্য হয়েছে। ডন সোসাইটীতে যে সকল কৃতবিদ্য তরুণ শিক্ষা পেয়েছিলেন, তারাই অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্মী ও সেবকরূপে দেশার্থে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯০৫ সনে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হলে দেশের মধ্যে স্বাদেশিকতার প্লাবন প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। বিলাতী পণ্য বয়কটের সঙ্কল্প গৃহীত হয় ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের দাবীও ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন এম. এ পরীক্ষা বয়কট দাঁড়িয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়-বয়কটের প্রথম ধাপ। এই বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট আন্দোলনে ডন সোসাইটীর ছাত্রগণই ছিলেম বিশেষ উৎসাহী ও অগ্রণী। মন্ত্রণাদাতা ছিলেন ডন সোসাইটীর সতীশ মুখার্জী ও এটর্ণী হীরেন দত্ত। সে সময় হীরেন দত্ত একদিন এম. এ. পরীক্ষার্থীদের এক সভায় বলেছিলেন : "ভাঙো সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, কায়েম করো স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়। আমি তার হব চাকর। ···শ্যামের বাঁশরী বেজেছে। গোপিনীরা যে যেখানে আছে সেখান থেকেই ছুটে আসবে" (বৈঠকে, ১ম খণ্ড, পৃ ৩১৪)। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার যে আন্দোলম এভাবে দেখা দেয় (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০৫) সরকারী ছাত্র-নির্যাতন নীতির ফলে তা বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করে। অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটী জাতীয় শিক্ষার দাবীর ইন্ধন জোগাতে থাকে ছাত্র ও যুব-সমাজের মধ্যে। উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' বিশ্ববিদ্যালয়কে "গোলদীঘীর গোলামখানা" আখ্যা দেয়।

ছাত্রদলনের প্রথম আগুন জ্বলে ওঠে রংপুরে (অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯০৫)। শতাধিক ছাত্রের বহিষ্কার আদেশ জারী হলো। কায়েম হলো রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় (৮ই নভেম্বর, ১৯০৫)। এই সকল ছাত্রের ভবিষ্যত নিয়ে যে দারুণ সমস্যা সেদিন জাতির সামনে উপস্থিত হয়, তার সুসমাধানের জন্য নেতৃবর্গ স্থাপন করলেন কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (১১ই মার্চ, ১৯০৬) নামক বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। আর এই পরিষদের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত হলো দি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ এণ্ড স্কুল (১৪ই আগষ্ট)। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন এই জাতীয় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রথম তত্ত্বাবধায়ক। বস্তুত, যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে জাতীয় শিক্ষার আকাঙ্খা কলেবর ধারণ করে, তিনিই হলেন ডন

সোসাইটীর সতীশচন্দ্র। দি বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ছাড়াও বাংলাদেশে ও ভারতের নানা স্থানে স্থাপিত হয় সে সময় বহু জাতীয় বিদ্যালয়। সেদিন বাংলাদেশে এমন নেতা প্রায় ছিলেন না, যিনি এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে যোগদান করেন নি। অ-বাঙ্গালী নেতাদের মধ্যে তিলক ও লাজপত রায় জাতীয় শিক্ষার পূর্ণ সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

এই ন্যাশন্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যে আবেগের ভাষায় অভিব্যক্ত করেছিলেন, তা আজও আমাদের মনে সম্মোহন সৃষ্টি করে। "আজ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, ইচ্ছাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, সমস্ত সৃষ্টির গোড়াকার কথাটা ইচ্ছা। যুক্তি নহে, তর্ক নহে, সুবিধা-অসুবিধার হিসাব নহে, আজ বাঙালীর মনে কোথা হইতে একটা ইচ্ছার বেগ উপস্থিত হইল এবং পরক্ষণেই সমস্ত বাধা-বিপত্তি, সমস্ত দ্বিধাসংশয়, বিদীর্ণ করিয়া অখণ্ড পুণ্যফলের ন্যায় আমাদের জাতীয় বিদ্যা-ব্যবস্থা আকার গ্রহণ করিয়া দেখা দিল। বাঙালীর হৃদয়ের ইচ্ছার যজ্ঞহুতাশন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অগ্নিশিখা হইতে চরু হাতে করিয়া আজ দিব্যপুরুষ উঠিয়াছেন—আমাদের বহু দিনের শূন্য আলোচনার বন্ধ্যাত্ব এইবার বুঝি ঘুচিবে।...

অনেক দিন পরে আজ বাঙালী যথার্থভাবে একটা কিছু পাইল। এই পাওয়ার মধ্যে কেবল যে একটা উপস্থিত লাভ অছে তাহা নহে, ইহা আমাদের একটা শক্তি। আমাদের যে পাইবার ক্ষমতা আছে—সে ক্ষমতাটা যে কি এবং কোথায়, আমরা তাহাই বুঝিলাম। এই পাওয়ার আরম্ভ হইতে আমাদের পাইবার পথ প্রশস্ত হইল। আমরা বিদ্যালয়কে পাইলাম যে, তাহা নহে, আমরা নিজের সত্যকে পাইলাম, নিজের শক্তিকে পাইলাম।

আমি আপনাদের কাছে সেই আনন্দের জয়ধ্বনি তুলিতে চাই। আজ বাংলা দেশে যাহার আবির্ভাব হইল, তাহাকে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা যেন আমরা না ভুলি।...আমাদের বঙ্গমাতার সূতিকাগৃহে আজ সজীব মঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছে—সমস্ত দেশের প্রাঙ্গণে আজ যেন আনন্দশঙ্খ বাজিয়া উঠে—আজ যেন উপঢৌকন প্রস্তুত থাকে, আজ আমরা যেন কৃপণতা না করি।"

'জাতীয় শিক্ষা' পরিভাষায় স্বদেশী আন্দোলনের এক বিপুল আকাঙ্খা মূর্তিমন্ত হয়ে উঠেছিল। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিচালনাধীনে যে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তিত হয় তার মূলীভূত বিষয় হলো জাতীয় স্বার্থে ও জাতীয় কর্তৃত্বে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা—"To impart Education—Literary as well as Scientific and Technical—on National Lines and exclusively under National Control." এই নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির কয়েকটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, শিক্ষা পরিষদ হলো যথার্থ বে-সরকারী বিশ্ব-

বিদ্যালয়। এর সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের কোন বিভাগের কোন সম্পর্ক ছিল না—সাংস্কৃতিক স্বরাজের কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এর প্রথম বিশেষত্ব। দ্বিতীয় বিশেষত্ব হলো—টেকনিক্যাল শিক্ষার সার্বজনিক ও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। প্রাথমিক বিভাগ থেকে ম্যাট্রিকের সমান ক্লাশ পর্যন্ত (Fifth Standard class) এই ব্যবস্থার জের চলেছিল। এমন কি কলেজ বিভাগেও টেকনিক্যাল শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। তৃতীয় বিশেষত্ব—স্কুল বিভাগে ভাষা, সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির সঙ্গে পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যাগুলির সার্বজনিক ও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। চতুর্থ বিশেষত্ব—কলেজ বিভাগে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যে শিক্ষাদান ও গবেষণার ব্যবস্থা। পঞ্চম বিশেষত্ব—কলেজ বিভাগে পালি, হিন্দী ও মারাঠী এবং যুগপৎ স্কুল ও কলেজ বিভাগে সংস্কৃত, আরবী ও পারসী ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা। এছাড়া, উচ্চতর গবেষণার সুবিধার জন্য কলেজ বিভাগে ফরাসী ও জার্মান ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। আধুনিক পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ছাত্রদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কায়েম করানোর লক্ষ্য ছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সপ্তম বিশেষত্ব। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হলো স্কুল বিভাগের নিম্নতম শ্রেণী হতে কলেজ বিভাগের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত সব কিছু শেখাবার জন্য বাংলা ভাষাকেই বাধ্যতামূলক ও সার্বজনিক বাহন হিসাবে গ্রহণ। ইংরেজী ছিল বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা। শিক্ষা পরিষদের আর একটি লক্ষ্য ছিল যথাসম্ভব কম পরীক্ষা গ্রহণ ও যথাসম্ভব কম সময়ে নিম্নতম হ'তে পরিষদের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত (এম. এ-র সমান) শিক্ষা প্রদান। প্রাইমারী বিভাগে ছিল তিন বছরের কোর্স, মাধ্যমিক বিভাগে সাত বছরের কোর্স (প্রথম পাঁচ বছরে ম্যাট্রিকের ও পরের দুই বছরে আই. এ-আই. এস্‌সি-র সমান ক্লাস) এবং কলেজ বিভাগে চারি বছরের কোর্স (বি এ. অনার্স ও এম. এ-র সমান ক্লাস)। প্রত্যেক বিভাগের পাঠ সমাপ্ত হলে একবার ক'রে পরিষদের পরিচালনায় পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে প্রথম-প্রথম কয়েক বছর ম্যাট্রিকের সমান ক্লাসের শিক্ষান্তেও পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া, পরিষদের আবহাওয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কাণ্ডে, বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, নীতি-শাস্ত্র, শিল্প, কলা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার উপর বিশেষ জোর পড়েছিল। ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনও এই শিক্ষা-প্রণালীর আর একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য। মোটের উপর, ছাত্রদের সত্যকার মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, যথার্থ জ্ঞান-লাভ ও জ্ঞান-চর্চা এবং জাতীয় চিত্তের পূর্ণ বিকাশই এই 'জাতীয় শিক্ষার' গোড়ার কথা। পরিষদ-প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণকালে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে (ন্যাশনাল কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবসে, ১৪ই আগষ্ট, ১৯০৬) এই শিক্ষার এক প্রধান লক্ষ্য

হলো "to train students intellectually and morally so as to mould their character according to the highest national ideals; and on its technical side to train them so as to qualify them for developing the natural resources of the country and increasing its material wealth". এই বিশেষত্বগুলির কথা এক সঙ্গে চিন্তা করলে স্বদেশী যুগের শিক্ষা-বিপ্লবের মূর্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত, জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এক পুরাদস্তুর যুগান্তর সাধিত হয়। ১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে পরিষদ-প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষার স্বপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হলে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ সর্বভারতীয় গুরুত্ব লাভ করে। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন পরিষদের সেক্রেটারী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রস্তাবটি এই মর্মে গৃহীত হয় যে, That in the opinion of this Congress the time has arrived for people all over the country earnestly to take up the question of national education for both boys and girls and organise a system of education—Literary, Scientific and Technical—suited to the requirement of the country on national lines and under national control."

পরবর্তীকালে কোন কোন লেখক ও গবেষক স্বদেশী যুগের জাতীয় শিক্ষার আদর্শকে প্রগতিবিরোধী বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও ধর্মের কুসংস্কারগুলি পুনরুদ্ধারই নাকি এই জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য এরূপ মন্তব্যও তারা প্রকাশ করেন। সমালোচকদের এরূপ মতামত যে কিরূপ ভ্রান্ত, জাতীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলির কথা চিন্তা করলেই তা প্রতীয়মান হয়।[২] ১৯০৫-০৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে ঐরূপ প্রগতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতের কোথাও চালু ছিল না। স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় জাতীয় শিক্ষার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় প্রবর্তিত হয়েছে। ১৯০৭-১৪ সনের মধ্যে আশুতোষের কনভোকেশান্ বক্তৃতাগুলি পড়লেই এবিষয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও সাধনা যে কত গভীর ছিল তা জানা যায়।[৩] স্বতন্ত্র বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগীয় পঠন-পাঠন ও উচ্চতম গবেষণার ব্যবস্থা, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের উদ্বোধন, পালি, পারসী

২। জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত "The Origins of the National Education Movement" (ডিসেম্বর, ১৯৫৭) গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

৩। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের "Addresses" (১৯০৭-১৪) পুস্তকখানি দ্রষ্টব্য।

হিন্দী, ফরাসী জার্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা, নিম্নতম শ্রেণী হ'তে বি. এ. পাস পর্য্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যম গ্রহণ, বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা ও বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের পরিচালনায় বিদ্যালয় বিভাগেও টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রচলন এবং সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম স্বদেশী যুগের জাতীয় শিক্ষার সাফল্য ঘোষণা করে।

(৫)

স্বরাজ

স্বদেশী আন্দোলনের পঞ্চম আদর্শ ছিল 'স্বরাজ'। বংগভংগের বিরুদ্ধে বয়কট-স্বদেশীর মন্ত্র উচ্চারণ করে যে জাতীয় আন্দোলন প্রথমে দেখা দেয়, তার মধ্যে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার আকাঙ্খাও ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ১৯০৬ সনের ভারতের রাষ্ট্রিক অবস্থা বিশ্লেষণ কালে 'লণ্ডন টাইম্‌সের' ভারতীয় সংবাদদাতা ভ্যালেনটাইন চিরোল মন্তব্য করেছিলেন যে, বাংলার ভৌগলিক সংহতি রক্ষার চেয়েও আজ বড় প্রশ্ন জাতির সাম্‌নে দেখা দিয়েছে; আর তা হলো বাংলা তথা ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হবে কিনা সে প্রশ্ন। ভারতে ইংরেজ শাসনের বৈধতায় ভারতবাসীর এ জিজ্ঞাসা ও সন্দহ সম্পূর্ণ অভিনব।

১৯০৫-০৬ সনের পূর্বে বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে মুক্তির আদর্শ এদেশের রাজনীতি-বিদ্‌দের চেতনায় ঠাঁই পায় নি। উনবিংশ শতকের শেষভাগে, এমন কি বিংশ শতকের গোড়ার দিকেও, ভারতে ইংরেজ শাসনের নৈতিক অধিকারে আস্থাপোষণ ছিল এদেশবাসীর দস্তর। বৃটিশ শাসনের কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে আন্দোলন চালাতেন কংগ্রেসী নেতাগণ। আবেদনের সহজ পথে এগোতেন তাঁরা ধীরে ধীরে। ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি নিয়ে করুণা ভিক্ষার মধ্যে যে গ্লানি ও লজ্জা আছে, তা তাঁরা বরণ করে নিয়েছিলেন বিনা দ্বিধায় ও নিঃসঙ্কোচে। ১৯০২ সালে আমেদাবাদ কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বৃটিশ শাসনের চিরস্থায়িত্বের জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেছিলেন "We plead for the permanence of British Rule in India". এমন কি স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম চরমপন্থী নেতা বিপিন চন্দ্র পালও প্রাক্‌-১৯০৫ সনে অনুরূপ মত পোষণ করতেন। বিপিন পালের রাষ্ট্রদর্শন আলোচনা প্রসংগে কোন কোন পণ্ডিত মন্তব্য করেছেন যে পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 'নিউ ইণ্ডিয়া' প্রকাশের সময় থেকেই (১২ই আগষ্ট, ১৯০১) তাঁর বিপ্লবী রাষ্ট্রদর্শন প্রচারিত হ'তে থাকে। উক্তি ভুল। ১৯০১ সালে 'নিউ ইণ্ডিয়া' সাপ্তাহিক প্রথম প্রকাশের দিন বিপিন পাল এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিশ্লেষণ করে যে প্রবন্ধ লেখেন, তার মধ্যে ভারতের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-সম্পর্কীয় সমস্যাকে তিনি রাজনৈতিক সমস্যার উপরে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি

লিখেছিলেন : "And though never wishing to ignore any question, whether political, social or religious, affecting the interests of New India, we desire to make a persistent agitation of our present day economic and educational problems, our speciality"।[৪] ১৯০২ সনে তিনি স্যার হেনরী কটনের সংগে সুর মিলিয়ে বলেছিলেন, ভারতবাসী যে এদেশে ইংরেজ শাসনকে "irrevocable necessity" বলে মেনে নিয়েছে, তার কারণ ইংরেজ এদেশে অনেক উপকার সাধন করেছে ('নিউ ইণ্ডিয়া', ৭ই আগষ্ট, ১৯০২—Loyalty in India শীর্ষক প্রবন্ধ)। ঐ বছরই কলিকাতার প্রথম শিবাজী উৎসব উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বক্তৃতায় বিপিন পাল অনুরূপ মন্তব্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, "And we are loyal, because we believe in the workings of the Divine Providence in our national history···And as long as Britain remains at heart true and faithful to her sacred trust, her statesmen and politicians need fear no harm from the upheaval of national life in India, of which this movement, and movements of its kind, are such hopeful signs" ('নিউ ইণ্ডিয়া', ২৬শে জুন, ১৯০২) অর্থাৎ আমরা যে বৃটিশের অনুগত তার কারণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে আমরা ঈশ্বরের বিধানে বিশ্বাস করি ; এবং যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের এই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকবে, ততদিন আমাদের কোন আন্দোলন হ'তে ইংরেজ রাজনীতিবিদের ভয়ের কারণ নেই।[৫]

কিন্তু জাতির এই মানসিক গঠনে আমূল পরিবর্তন দেখা যায় স্বদেশী আন্দোলনের আবহাওয়ায়। কংগ্রেস-পরিচালিত রাষ্ট্রনীতির সমালোচনা যে ইতিপূর্বে হয় নাই তা নয়। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ আত্মশক্তি ও স্বাবলম্বনের মন্ত্র ইতিপূর্বেই প্রচার করেছিলেন। আরও জোরের সংগে কংগ্রেসী নীতির সমালোচনা করেছেন

৪। কিন্তু ১৯০৬-০৮ সনে চরমপন্থী দলের রাষ্ট্রিক আদর্শ ছিল ঠিক বিপরীত। 'Political freedom is the very life-breath of a nation, to attempt social reform, educational reform, industrial expansion, the moral improvement of the race without aiming first and foremost at political freedom is the very height of ignorance and futility (বন্দে মাতরম্, ১৯০৭—Vide "The Doctrine of Passive Resistance" (১৯৫৪)।

৫। উধৃত অংশটি বিপিন পালের "স্বদেশী ও স্বরাজ" (১৯৫৪) গ্রন্থে সন্নিবেশিত The Sivaji Festival—II শীর্ষক বক্তৃতার শেষাংশ। বক্তৃতাটি প্রথমে 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রকাশিত ও পরে The New Spirit (১৯০৭) পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়। ১৯০৭ সনের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে চরমপন্থী নেতা বিপিন পালের মডারেটিষ্ট মনোভাব ১৯০২ সনের ঐ বক্তৃতার শেষাংশে পরিস্ফুট হওয়ায় গ্রন্থকার কর্তৃক অংশটি The New Spirit পুস্তকে বর্জিত হয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে তৎকালে অংশটি বাদ দেওয়ার হয়ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ১৯৫৪ সনের "স্বদেশী ও স্বরাজ" পুস্তকেও অংশটি অনুরূপভাবেই বাদ পড়েছে। তাছাড়া, প্রকাশের তারিখেও উভয় বইয়েই ভুল রয়েছে—২৬শে জুলাই ১৯০২র পরিবর্তে ২৬শে জুন, ১৯০২ হবে।

অরবিন্দ ঘোষ ১৮৯৩-৯৪ সনে 'ইন্দুপ্রকাশে' প্রকাশিত "New Lamps for Old" ও "বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে। "New Lamps for Old" প্রবন্ধমালার প্রথমটিতে (৭ই আগষ্ট, ১৮৯৩) অরবিন্দ লিখেছিলেন : "আমি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। দুই বৎসর পূর্বে (১৮৯১) ইহা আমি করতে পারতাম না। আমি তখন কংগ্রেসের অনুরক্ত ছিলাম।···কিন্তু এক অন্ধ যদি আর এক অন্ধকে পথ দেখায়, তবে উভয়েই গর্তে পড়ে—এই আশঙ্কায় আমি দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য লেখনী ধারণ করেছি।" অন্যত্র তিনি মন্তব্য করেন : "মিঃ ফিরোজ শা' মেটা আদালতে ওকালতি করার পদ্ধতি কংগ্রেস সভায় আমদানী করেছেন। কংগ্রেস যে আমাদের একত্রে বসে কাজ করতে শিখিয়েছে, তা ঠিক নয়। কংগ্রেস আমাদের একত্রে কথা বলতে শিখিয়েছে মাত্র" (দ্বিতীয় প্রবন্ধ, ২১শে আগষ্ট, ১৮৯৩)। তৃতীয় প্রবন্ধে অরবিন্দ লিখেছিলেন "কংগ্রেসের আদর্শ ভুল, কর্মপদ্ধতি ভুল. নেতারা একেবারে নেতৃত্বের অযোগ্য" (২৮শে আগষ্ট, ১৮৯৩)।[৬] ১৯০১ সনে কংগ্রেসী-নীতির সমালোচনা করে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'নিউ ইণ্ডিয়া'তে (১১ই নভেম্বর, ১৯০১) যে সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন, তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তিনি কংগ্রেসকে "Three days' wonder"—'তিন দিনের বিস্ময়' রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং বছরের পর বছর কয়েকটি প্রস্তাব পাশ ভিন্ন কংগ্রেস আন্দোলনের যে অন্য কোন লক্ষ্য নেই এরূপ মন্তব্য করেন।[৭] কিন্তু এ সবই ছিল মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা নেতা বিশেষের সমালোচনা।

পক্ষান্তরে, ১৯০৫-এর আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সংগে-সংগে দেখা দিল এক সম্পূর্ণ নূতন অবস্থা যখন জাতি জেগে উঠেছে এক নূতন উন্মাদনায়, এক নূতন ভাবুকতায়। সেই আবেষ্টনে সুরু হ'ল দেশে এক অভিনব সংগ্রাম ও বিপ্লব। বাংলা মায়ের সেই দৃপ্ত তেজ ও রণ মূর্তি দেখে রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—"তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা ব'লে ভাসা তরী।" তিনি আরও গাইলেন—

৬। শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত "শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ" (১৯৫৬), পৃ ৬৩-৮৪ দ্রষ্টব্য।

(৭) হেমেন্দ্র প্রসাদ লিখেছিলেন : "It is only when November opens into December that the 'leaders' are seen busy collecting subscriptions and enlisting volunteers....They vanish with the 'three days wonder' and the enthusiasts of one year are, as a rule, nowhere the next...Nothing has been done to make the Congress ideas filter down to the masses. The peasants are as ignorant of the parrot cry of politics to-day as they were before the birth of the Congress." পত্রখানির শেষে 'নিউ ইণ্ডিয়ার' সম্পাদক পত্র-লেখকের মতামতকে পাঠকবর্গ যাতে পত্রিকার মতামত বলে ভুল না করেন এজন্য তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

আজি বাঙ্গলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন্ আপনি—
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননি
ওগো মা—তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে!…

সেই বিপ্লবের দিনে বাংলার সংগ্রামী মনোভাব পরিস্ফুট হলো চরমপন্থী নেতৃবর্গের কণ্ঠে ও কলমে। নূতন নূতন ভাবধারা উন্মেষের সংগে সংগে স্বরাজের আকাঙ্খাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাগপাশ ছিন্ন করে পরিপূর্ণ মুক্তির আদর্শ উজ্জ্বল রূপ গ্রহণ করে। এই নব্য রাজনীতিক আদর্শ প্রচারের কাজে যাঁরা তৎকালে অগ্রণী ছিলেন তাঁদের মধ্যে বাংলা দেশে বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও অশ্বিনী কুমার দত্ত এবং বাংলার বাইরে মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক ও পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায় ছিলেন প্রধান। ১৯০৬-০৮ এর যুগে স্বরাজের আদর্শ খুব জোরের সংগে প্রচারিত হলো বিপিন পালের 'নিউ ইণ্ডিয়া' সাপ্তাহিকে, (প্রধানত) অরবিন্দ-সম্পাদিত 'বন্দেমাতরম্' দৈনিকে, ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' পত্রে এবং 'বিপ্লবী' যুবকদের 'যুগান্তর' পত্রিকায়। দিনের পর দিন নেতাগণ ভারতের রাষ্ট্রিক স্বাধিকারের আদর্শ প্রচার করতে লাগলেন নিজ নিজ দৈনিকে ও সাপ্তাহিকে। কিন্তু যে-কাগজে এই নূতন রাষ্ট্রীয় দর্শন সবচেয়ে সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রচারিত হয়েছিল, তা হলো অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা (৬ই আগষ্ট, ১৯০৬—অক্টোবর, ১৯০৮)। ১৯০৫-এর শেষাশেষি বাংলার রাষ্ট্রিক রঙ্গমঞ্চে নব্য রাজনীতিক দল (New Party) বা চরমপন্থী দলের আবির্ভাব হয়। সেই সময় থেকেই এই দলের একটি মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা বোধ হতে থাকে। কিন্তু অর্থাভাব হেতু ইহা তখন কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় নি। বরিশাল যজ্ঞভঙ্গের পর (এপ্রিল, ১৯০৬) নব্য দলের মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা দ্বিগুণ বর্ধিত হ'লে "বিপিনচন্দ্র কাহাকেও এক-প্রকার না জানাইয়া পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন।"[৮] বিপিন

৮। বিপিন পালের জামাতা স্বর্গত সুরেশচন্দ্র দেবের লেখা "বন্দে-মাতরম্' পত্রিকার জন্ম-বৃত্তান্ত" শীর্ষক অপ্রকাশিত প্রবন্ধ। সুরেশবাবু ঐ প্রবন্ধে লিখেছেন: "কালীঘাটের শ্রীহরিদাস হালদার ও শ্রীহট্টের শ্রীক্ষেত্রমোহন সিংহ দুই জনে ৪৫০৲ টাকা দিলেন। পত্রিকা ছাপাইবার ভার নিলেন তদানীন্তন 'প্রদীপ' পত্রিকার ও ক্লাশিক প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। প্রেসের অফিস ছিল তদানীন্তন করপোরেশন ষ্ট্রীটের উপর; ওয়েলসলী ষ্ট্রীট ও লোয়ার সার্কুলার রোডের মধ্যস্থলে বাড়িটী অবস্থিত ছিল।" ১৯০৬এর ৭ই আগষ্ট বয়কট আন্দোলনের জন্ম-তারিখে পত্রিকা প্রকাশের দিন স্থির ছিল ইতিমধ্যে সুরমা উপত্যকা সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনের তারিখ নির্দিষ্ট হয় ৭ই আগষ্ট। "বিপিনচন্দ্রের নিজের জন্মভূমির এই সম্মিলনে উপস্থিত থাকিবার আহ্বান তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না; এবং 'বন্দে

পালের সম্পাদনায় এই পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে ১৯০৬এর ৬ই আগষ্ট। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ হলেন এই পত্রিকার প্রধান মন্ত্রণাদাতা ও পরিচালক। 'বন্দে মাতরম্' পত্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক যুগান্তর সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে স্বরাজের মন্ত্র এই পত্রিকা এত জোরের সংগে প্রচার করে যে তার প্রভাব তৎকালে কম-বেশী সকলেই অনুভব করেছিল।

প্রধানত এই স্বরাজের আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করেই বাংলা তথা ভারতে নব্য দলের অভ্যুদয় ঘটে। সরকারী চণ্ডনীতির প্রতিক্রিয়ার ঢেউ-এ চরমপন্থী রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষা ক্রমশই পুষ্ট হতে থাকে এবং ১৯০৬-০৮ সনে স্বদেশী আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য পারিভাষিকে পরিণত হয়। ভারতের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার আদর্শ সমগ্র দেশে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি মডারেট নেতা দাদাভাই নৌরজীও ১৯০৬এর কলিকাতা কংগ্রেসে স্বরাজের মন্ত্র প্রচার করেন তাঁর সভাপতির ভাষণে। নৌরজী বলেছিলেন, ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য হ'লো Self-government or Swaraj like that of the United Kingdom or the Colonies. নৌরজী ইংলণ্ডের মত স্বরাজের কথা বললেও তিনি আসলে ভারতীয় মডারেটদের মত ঔপনিবেশিক স্বাধীনতাই বুঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নৌরজী কল্পিত স্বরাজে বিপিন পাল-অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা ভারতের যথার্থ কাম্য নয়—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে পরিপূর্ণ মুক্তিই ভারতের লক্ষ্য। তাঁরা চেয়েছিলেন "Unqualified Swaraj for India" অথবা "Entire removal of British rule from India." কারণ শাসনতান্ত্রিক স্বাধিকার অর্জিত না হলে কি সামাজিক সংস্কার, কি শিক্ষামূলক সংস্কার, কি আর্থিক প্রগতি, কি নৈতিক উন্নয়ন কোন কিছুর চেষ্টা করা নিছক অজ্ঞতা ও ব্যর্থতামাত্র। বৃটিশ শাসনের সততা ও ন্যায়ধর্মে যারা আস্থাবান ছিলেন ১৯০৫-০৬ সনের পরেও, সেই নরমপন্থী রাজনীতিকদের প্রতি 'বন্দে মাতরম্' পত্রের পরিচালক-গোষ্ঠীর শ্লেষ ছিল অন্তবিহীন। ১৯০৮ সনের মে মাসে 'বন্দে মাতরম্' পত্র মডারেটদের চরিত্র ও রাষ্ট্রিক নীতি প্রসংগে বলে :

"It is their misfortune to be placed between two powers, the bureaucracy and the Convention on one side and the country

মাতরমের' প্রথম সংখ্যা হাতে নিয়া ৬ই আগষ্টের প্রাতে চাট-গাঁ মেলে যাত্রা করিয়া ৭ই আগষ্টের সুরমা উপত্যকা সম্মেলনে যোগদান করিলেন।

"এই অবস্থায় দৈনিক পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখিবার দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহাকে ভাবিতে হইল। ৫ই আগষ্টের বিকালে অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দিনে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিবার অনুরোধ করিলেন। অরবিন্দের স্বীকৃতি নিয়া বিপিনচন্দ্র নিশ্চিন্তমনে শ্রীহট্ট যাত্রা করিলেন।"

on the other, and to be unable to abandon either···The situation in Bengal is complicated by the nebulous character of Moderatism. A sort of aggregate of petitioning and self-help, loyalism and revolutionary aspirations, patriotism and self-seeking, active support of Boycott and fear of the results of Boycott, Swadeshi enthusiasm and Anglophile habit, liking for National Education and preference for Government education, such is Bengal Moderatism—a monstrosity formless, unspeakable, indefinable, without a fixed principle which it can call its own. It is Moderate in the Convention, Nationalist when it goes to the country, loyal in its writings, revolutionary in its private conversation and sometimes in its speeches, patriotic wherever it can, self-seeking when fear, misnamed prudence, and self-interest, misnamed respectability, drive" ('বন্দেমাতরম', সাপ্তাহিক সংস্করণ, ৩রা মে, ১৯০৮)।

নব্য জাতীয়তাবাদীর দল যে স্বরাজের আদর্শ প্রচার করেন, তার লক্ষ্য শুধু রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা নয়—ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ উদ্বোধন। ভারতের স্বাধীনতা তাঁরা কামনা করেছিলেন সমগ্র মানব জাতির উন্নতির ও মুক্তির প্রাথমিক সোপান হিসাবে। এই বিষয়ে অরবিন্দ ঘোষ 'বন্দে মাতরমে' লিখলেন: "The return to ourselves is the cardinal feature of the national movement. It is national not only in the sense of political assertion against the domination of foreigners, but in the sense of a return upon our old national individuality ('বন্দে মাতরম্, সাপ্তাহিক সংস্করণ, ১৯শে এপ্রিল, ১৯০৮)। আর একটি প্রবন্ধে আবার তিনি ঘোষণা জানালেন: "Swaraj as the fulfilment of the ancient life of India under modern conditions, the return of the Satyayuga of national greatness, the resumption by her of her great *role* of teacher and guide, self-liberation of people for the final fulfilment of the Vedantic ideal in politics, this is the true Swaraj for India...The function of India is to supply the world with a perennial source of light and renovation. The world needs India and needs her free" (বন্দে মাতরম্, সাপ্তাহিক সংস্করণ, ৩রা মে, ১৯০৮)। বিপিন পালও তাঁর The Bed-Rock of Indian Nationalism

প্রবন্ধে একই মন্ত্র প্রচার করেন। তিনি বললেন, আমাদের আন্দোলন তো নিছক আর্থিক বা রাষ্ট্রিক আন্দোলন নয়। এর পশ্চাতে রয়েছে মহত্তর ও বৃহত্তর আদর্শ। আর এখানেই আমাদের নব-জাগ্রত শক্তি ও আশা নিহিত। বিপিন পাল এই আন্দোলনকে Spiritual movement আখ্যা দিলেন।[৯]

কিন্তু স্বরাজ লাভের উপায় কি? নব্য রাজনীতিক নেতাগণ পুরাতন আবেদন-নিবেদনের পথ (prayers and petitions) বর্জন করে যে নূতন পথের সন্ধান দিলেন, তা হলো অসহযোগ বা বয়কটের পথ। বৃটিশ শাসনযন্ত্রের সংগে চালাতে হ'বে এক সর্বাংগীন অসহযোগ—"a totalitarian refusal of co-operation with the existing form of Government. বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষ এই নূতন কর্মনীতির নাম দিলেন The Doctrine of Passive Resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। নিরস্ত্র ও অসহায় ভারতবাসীর পক্ষে বিপুল শক্তিশালী বৃটিশের সংগে সম্মুখ রণে জয়লাভ দুরাশা মাত্র। এই গভীর সত্য উপলব্ধি করেই নেতাগণ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথে জাতিকে অগ্রসর হ'তে নির্দেশ দেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সফলতা সম্ভব জনসাধারণের ত্যাগ ও সংগ্রামের দ্বারা। কংগ্রেস সভায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রাধান্য ভেঙ্গে ফেলে আন্দোলনকে পরিব্যাপ্ত করতে হ'বে দেশের আপামর জনগণের মধ্যে। কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠানকে তাই গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সংগঠনের আবেদন জানালেন চরমপন্থী নেতাগণ[১০]। নিষ্ক্রিয় সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন যথার্থ স্বার্থত্যাগী সৈনিক ও কর্মী। কেবল 'স্বরাজ'-'স্বরাজ' বলে চীৎকার করলেই 'স্বরাজ' পাওয়া যাবেনা। এজন্য দেশের প্রত্যেকটি নরনারীকে স্বরাজ লাভের উপযোগী হ'তে হ'বে। দেশ-মাতৃকার দাসত্ব -শৃঙ্খল ভাঙ্গতে হ'লে চাই সকল প্রকার ত্যাগ-স্বীকারের কঠিন ব্রত গ্রহণ। স্বরাজ-সাধনার মহাযজ্ঞে আত্মবলিদানের আহ্বান এতে নিহিত। ১৯০৭-০৮ সনে যখন দেশে সরকারী নির্য্যাতন উত্তরোত্তর বেড়ে চলে ও যখন দেশবাসীর প্রাণে হতাশা

৯। 'বন্দে মাতরম্, সাপ্তাহিক সংস্করণ, ১৪ই জুন, ১৯০৮-এ প্রকাশিত বিপিনচন্দ্রের The Bed-Rock of Indian Nationalism শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধ দুইটি অধুনা প্রকাশিত "'Bande Mataram' and Indian Nationalism" (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭) পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। ঐ পুস্তকে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষের লেখা আরও চৌদ্দটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধও সন্নিবেশিত আছে। এই সকল প্রবন্ধে তৎকালীন চরমপন্থী দলের রাজনৈতিক আদর্শ অতি পরিষ্কার ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

১০। এই প্রসংগে বিপিন পালের "The Shell and the Seed" ('বন্দে মাতরম', ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৬) ও অরবিন্দ ঘোষের "Congress and Democracy" ('বন্দে মাতারম্, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৬) শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় পঠিতব্য।

ও নৈরাশ্যের লক্ষণ দেখা যায়, তখন বিপিন পালের অগ্নিময়ী বাণী ও অরবিন্দের ক্ষুরধার লেখনী আন্দোলনে নূতন রক্ত-কণিকার সঞ্চার করে। সরকারী নিষ্পেষণের দুর্য্যোগ যতই বৃদ্ধি পায়, নেতাগণ ততই জাতিকে কঠিনতর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে উপদেশ দেন। ১৯০৭ সনে বিপিন পাল মাদ্রাজে চরমপন্থী দলের নীতি ও পন্থা বিশ্লেষণ করে যে বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন, তার ফলে সমগ্র দক্ষিণ ভারত নব্য রাজনীতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।[১১]

১৯০৮ এর এপ্রিল মাসে অরবিন্দ 'বন্দে মাতরমে' লিখলেন: "It is not by patriotic desires that a nation can be liberated, it is not by patriotic work that a nation can be built. For every stone that is added to the National edifice, a life must be given. It is not talk of Swaraj that can bring Swaraj but it is the living of Swaraj by each man among us that will compell Swaraj to come.···How then can we live Swaraj? By abandonment of the idea of self and its replacement by the idea of the nation. As Chaitanya ceased to be Nimai Pandit and became Krishna, became Radha, became Balaram, so every one of us must cease to cherish his separate life and live in the nation. The hope of the national regeneration must absorb our minds as the idea of salvation absorbs the minds of the *mumuksha*. Our *tyaga* must be as complete as the tyaga of the nameless ascetic. Our passion to see the face of our free and glorified Mother must be as devouring a madness as the

১১। R. Subbiar নামক জনৈক দক্ষিণ ভারতবাসী শ্রীবৈকুণ্ঠম্ থেকে ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০৭ সনে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদকের নিকট নিম্নলিখিত মর্মে এক পত্র লিখেছিলেন: "I am glad to inform you that Southern India has, after all, awakened from her lethargy...It was only after the stirring oratory of Bepin Chandra this year in Madras, that the educated community have shaped their minds to nationalistic views, and that even we, who are situated in the southernmost district of the Peninsula, have begun to assimilate nationalistic ideas and have procured a band of true Nationalists whom we sent to Surat to side with the leaders of the Extremist Party in this year's Congress" ('বন্দে মাতরম, সাপ্তাহিক সংস্করণ, ৫ই জানুয়ারী, ১৯০৮)।

passion of Chaitanya to see the face of Srikrishna. Our sacrifice for the country must be as enthusiastic and complete as that of Jagai and Madhai who left the rule of a kingdom to follow the Sankirtan of Gauranga".[১২] বিংশ শতকের নবীন উষায় নব্য রাজনীতিক দল ভারতে যে জাতীয়তার মন্ত্র প্রচার করেছিলেন, তার কাছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতালিতে মাৎসিনি-প্রচারিত জাতীয়তাবাদও বুঝি নিষ্প্রভ মনে হয়।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পাশাপাশি আর একটি বিশিষ্ট ধারাও স্বদেশী আন্দোলনে বিদ্যমান ছিল, তা হলো সন্ত্রাসবাদের অভিব্যক্তি। সন্ত্রাসবাদের অর্থ সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা। বাংলা দেশে তৎকালে সন্ত্রাসবাদের প্রধান প্রচারকদের মধ্যে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ কর্মবীরের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই বিপ্লবী যুবকদেরই মুখপত্র ছিল 'যুগান্তর' সাপ্তাহিক (মার্চ, ১৯০৬—জুন, ১৯০৮)। সন্ত্রাসবাদের আদর্শ এই পত্রিকায় প্রচারিত হতো। ১৯০৭ সনে 'যুগান্তর' পত্রিকা "সিডিসন ও বিদেশী রাজা" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখে: "ভারতবাসী বুঝিয়াছে স্বাধীনতাই তাহার সকল আপদের মহৌষধ; সুতরাং রুধিরের সাগরে সন্তরণ করিয়াও সে লক্ষ্য সাধন করিবে"।[১৩] ১৯০৮ সনে "অকাল বোধন" নামক যে কবিতা 'যুগান্তরে' (৩০শে মে, ১৯০৮) প্রকাশিত হয়, তা সেযুগে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

না হইতে মাগো বোধন তোমার
ভেঙ্গেছে রাক্ষস মঙ্গল ঘট।
জাগো রণচণ্ডী! জাগো মা আমার
আবার পূজিব চরণ তট॥
... ...
নরমুণ্ড ছিঁড়ে পরাইব গলে
বিনাশ করিব অসুরের দলে
রক্তাম্বুধি আজ করিয়া মন্থন
তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধন।
জাগো রণচণ্ডী! জাগো মা আমার
আবার পূজিব চরণ তট।

১২। 'বন্দে মাতরম্', সাপ্তাহিক সংস্করণ, ১২ই এপ্রিল, ১৯০৮—অরবিন্দের "The Demand of the Mother" শীর্ষক প্রবন্ধ।

১৩। বিপ্লবী 'যুগান্তর' পত্রিকায় (৩০শে জুলাই, ১৯০৭) প্রকাশিত "সিডিসন ও বিদেশী রাজা" শীর্ষক প্রবন্ধ। এই প্রসংগে 'মন্দিরা'য় (বৈশাখ ও শ্রাবণ, ১৩৬৪) প্রকাশিত আমাদের 'যুগান্তর' ব ক প্রবন্ধ দুটি পঠিতব্য।

এই সন্ত্রাসবাদের নীতি ও পন্থায় নব্য রাজনীতিক নেতা অরবিন্দ ঘোষেরও দান যথেষ্ট। বস্তুত এই ভাবধারার বিকাশেও কর্মনীতি নির্ধারণে তাঁর নেতৃত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তথাপি তাঁর নিরস্ত্র জাতির জন্য তিনি এই সশস্ত্র বিপ্লবের পথ নির্দেশ করেন নি। তিনি জানতেন, "An act of violence brings us into conflict and may be inexpedient for a race circumstanced like ours" অর্থাৎ হিংসার পথে এগোলে যে সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী তা আমাদের মত পরাধীন জাতির পক্ষে শুভফলপ্রসূ হবে না। কিন্তু তিনিও ১৯০৮ সনে সরকারী চণ্ডনীতির প্রচণ্ড তাণ্ডবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পন্থায় কতকটা অনাস্থাবান হয়ে পড়েন। বোমার মামলায় জড়িত হয়ে জেলে যাওয়ার পূর্বে (২রা মে, ১৯০৮) তিনি 'বন্দে মাতরমে' "New Conditions" নামে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তাতে এই অনাস্থা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছিলেন: "The fair hopes of an orderly and peaceful evolution of self-government, which the first energies of the new movement had fostered, are gone for ever. Revolution, bare and grim, is preparing her battle-field, mowing down the centres of order which were evolving a new cosmos and building up the materials of a gigantic downfall and a mighty new creation. We could have wished it otherwise, but God's will be done" ('বন্দে মাতরম্', সাপ্তাহিক সংস্করণ, ৩রা মে, ১৯০৮)।

সমাপ্ত

সাময়িক পত্রে ইতিহাস

মধ্যযুগে ইওরোপে স্থলপথে পরিবহণ ব্যবস্থা—পশ্চিম ইওরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে রোমান শাসনের স্থায়ী চিহ্ন স্বরূপ ছিল বহু যোজন বিস্তৃত একাধিক রাজপথ। রোমানদের এই বিরাট পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যকে সুরক্ষিত ও সুশাসিত রাখা। যাতে অল্প সময় এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাওয়া যায় তার জন্য রোমানরা দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল স্থান দিয়ে পাহাড় পর্বতের সানুদেশ অতিক্রম করে সরকারী পথ নির্মাণ করেছিল। এই পথ দিয়ে সৈন্য চালনা করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার কথা কেউ চিন্তা করে নি। পথগুলি ছিল সঙ্কীর্ণ। চলতে গিয়ে একই পথে পড়তো বহু চড়াই ও উৎরাই। পাথরের তৈরী পথগুলি ছিল খুব মজবুত। তবে স্থানে স্থানে সূর্যের তাপে ও বৃষ্টির জলে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হত। রোমান সম্রাটের অধীনে ছিল অসংখ্য ক্রীতদাস ও অতুল সম্পদ। রাস্তাগুলি মেরামত করতে কোন অসুবিধা হত না। পথ সঙ্কীর্ণ হলেও পদাতিক বা অশ্বারোহী বাহিনীর যাতায়াতে কোন বাধা হত না। কিন্তু এই সকল রাজপথ দিয়ে পন্য দ্রব্য পরিবহণে ছিল বিশেষ অসুবিধা। একটি ক্ষুদ্র মালবাহী গাড়ী টেনে নিয়ে যেতে যে অর্থ ব্যয় হত তাতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পণ্যদ্রব্য চালান দেয়ার মজুরী পোষাত না। রোমান সাম্রাজ্যের যুগে সমাজে বণিক অপেক্ষা জমির মালিককে উচ্চ স্থান দেয়া হত। বাণিজ্যের চাহিদা মত পথগুলি প্রশস্ত করার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। সরকারী রাস্তা তৈরী ও রক্ষার ভার ছিল সরকারী কর্মচারীদের উপর। তারা ব্যবসায়ীদের কথায় কান দিত না। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক অবধি এই অবস্থা বজায় ছিল। তারপর সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরল; অর্থনৈতিক কাঠামো পড়লো ভেঙ্গে। জনবল ও অর্থবল না থাকায় রাজপথগুলি আর মেরামত করা হল না। লাভজনক নয় দেখে ব্যবসায়ীরা স্থলপথে একস্থান থেকে অন্যস্থানে জিনিষপত্র চালান দেয়া বন্ধ করে দিল।

সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বহু বর্বর জাতি পশ্চিম ইওরোপে এসে বসবাস শুরু করল। প্রথম প্রথম রাজপথগুলি রক্ষার দায়িত্ব তারা নিজেরা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অসংখ্য ক্রীতদাস ও অতুল সম্পদ তারা কোথায় পাবে? তাই সেগুলি মেরামত করা তাদের সামর্থ্যে কুলাল না। কোন কোন দেশে এই পথগুলি রক্ষা করার জন্য কঠোর আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয় নি। অল্প দিনের মধ্যে অধিকাংশ রাজপথের বুকে গজিয়ে উঠলো ঘাস ও আগাছা, সেগুলি একেবারে অব্যবহার্য হয়ে পড়লো।

মধ্যযুগের প্রারম্ভে ব্যবসা-বাণিজ্যে ছিল মন্দা। সুতরাং রাজপথগুলি অব্যবহার্য হয়ে পড়ায় বিশেষ ক্ষতি হয় নি। লোকে সে সময়ে অনেক অসুবিধা সত্বেও জলপথে যাতায়াত করত। প্রথমত রাস্তা মেরামতের কোন প্রয়োজন নেই; দ্বিতীয়ত অল্প খরচে জিনিষপত্র চালান দেয়া যায়। রোমানরাও জলপথে যাতায়াত করত। তাদের আমলে রোন নদীর তীরে অবস্থিত আর্লস্ ছিল মার্সাই অপেক্ষা সমৃদ্ধ। জেনোয়া ও ত্রিয়েস্ত্ অপেক্ষা ওষ্টিয়া ও পীসার প্রাধান্য ছিল বেশী। লম্বার্ডিতে চলাচলের পথ ছিল 'পো' নদী। আরবরা মরুর অধিবাসী হয়েও জলপথেই যাতায়াত করত বেশী। সম্ভবত উটের মন্থর গতিতে তারা অভ্যস্ত ছিল বলেই জলপথে যাতায়াতে বিলম্ব হলেও তাদের বিশেষ অসুবিধা হত না।

মধ্যযুগের শেষ ভাগে ইওরোপে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। বাণিজ্যের প্রয়োজনে নতুন নতুন রাস্তা তৈরী হতে আরম্ভ হল। এগুলি কিন্তু রোমানদের তৈরী রাজপথের মত নয়। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বণিক-সম্প্রদায় সমাজে উচ্চ স্থান পেল। রাস্তা তৈরীর ভার পড়ল বণিক-সংঘের উপর। রোমানদের মত রাজপথ নির্মাণের বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করার সঙ্গতি তাদের নেই, তাই তারা পায়ে চলা পথই প্রথমে বেছে নিল। কিছুকাল পরে সেই রাস্তার স্থানে স্থানে পাথর বা কাঠ বিছিয়ে দেয়া হল। প্রাচীন রাজপথের মত এগুলির ভিত মোটেই শক্ত ছিল না। তবে অল্প খরচে মেরামত করা চলত এবং ইচ্ছামত গতিপথ পরিবর্তন করা যেত। সহরে যে সব রাস্তায় লোক চলাচল বেশী সেগুলি শান বাধান হল। ফরাসীরাজ ফিলিপ অগাষ্টসের আদেশে প্যারিসের রাস্তাগুলি পাকা করা হয়। রাস্তায় রাহাজানির ভয় ছিল। ১২৮৫ সালে ইংলণ্ডে আইন করা হলো যে রাস্তার দুই পার্শ্বের ২০০ ফিটের মধ্যে কোন গাছপালা বা ঝোপ রাখা চলবে না।

একই পথ দিয়ে তীর্থযাত্রী ও পণ্য ব্যবসায়ী যাতায়াত করত; তাই পথের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল ধর্মপ্রতিষ্ঠান এবং বণিক-সংঘের উপর। বহুদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র সে দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। মধ্যযুগে অধিকাংশ রাস্তাই ছিল আঁকা বাঁকা। তাই অনেক ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক পুল বা সাঁকোর প্রয়োজন হত। বন্যায় পুল ভেসে যেত। একটি রাস্তার জন্য ৩০টি পুলের প্রয়োজন হয়েছিল, তার ১৭টি ১৩৭০ খৃঃ বন্যায় ভেসে যায়।

রাজপথগুলি রাষ্ট্রের সম্পত্তি। ঐ পথে চলতে গেলে রাষ্ট্রকে শুল্ক দিতে হয়। শুল্ক এড়াবার জন্য জনসাধারণ পায়ে চলা পথে যাতায়াত করে। রাষ্ট্রে কড়া শাসন থাকলে এরূপ এড়ান সম্ভব হয় না। ইংলণ্ডের শাসনকর্তারা ছিলেন এ বিষয়ে খুব সজাগ। তাই সকলকে সরকারী পথে যাতায়াত করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত ভৌগোলিক পরিবেশ এমন যে অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন রাজপথের উপর দিয়েই নতুন রাস্তা নির্মাণ করতে হয়েছে। ফ্রান্সে বহুদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত

হয় নি। রাজপথগুলি সাধারণের প্রয়োজনমত বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। ফ্রান্সে তাই রোমান যুগের রাজপথ ও আধুনিক পথঘাটের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই।

মধ্যযুগের পর এল রেনেসাঁসের যুগ। ইওরোপের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে নানা দিক থেকে দেখা দিল বিরাট পরিবর্তন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার চাপে রাষ্ট্রকে রাজপথগুলি রক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করতে হল। বারুদ আবিষ্কৃত হওয়ায় তার সাহায্যে পাহাড় পর্বত ভেদ করে সুড়ঙ্গ তৈরী করা সম্ভব হলো। এইভাবে মধ্যযুগের অবসানের পর স্থলপথে উন্নতর পরিবহণের সূত্রপাত হলো।*

মধ্যপ্রাচ্যে ইস্রায়েল—ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর মধ্যপ্রাচ্যে যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা'নিয়ে আলোচনা করেছেন আর্থার সি. এ. লিভারান। ১৯৪৮ সালে ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মিশর, ট্রান্স-জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন এবং ইরাকের সম্মিলিত বাহিনী ইস্রায়েল আক্রমণ করে। ১৯৪৯ সালে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু তখন থেকে ইস্রায়েল সীমান্তের উপর 'ফেদায়ীন্' দলের আক্রমণ চলতে থাকে। এদের পিছনে ছিল মিশরের সক্রিয় সমর্থন। ইতিমধ্যে দক্ষিণে সিনাই ও পশ্চিমে গাজা অঞ্চল সামরিক ঘাটিতে পরিণত হয়। ১৯৫৬ সালে অবস্থা চরমে পৌঁছল। মিশর ও জর্ডান সম্মিলিত ভাবে ইস্রায়েল আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ হল। ইস্রায়েল আত্মরক্ষার জন্য প্রথমেই শত্রুঘাটি আক্রমণ করে তা ধ্বংস করল। বেশ বোঝা গেল শত্রুপক্ষের উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র থাকলেও ইস্রায়েল আত্মরক্ষা করতে সক্ষম। এই যুদ্ধে অন্য কোন আরব রাষ্ট্র মিশরের সাথে যোগ দেয় নি। আপততঃ রক্ষা পেলেও ইস্রায়েলের অবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। সোবিয়েৎ রাশিয়া মিশর ও সিরিয়ার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে— অদূর ভবিষ্যতে সোবিয়েৎ সরকার মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ব্যাপারে আরও প্রত্যক্ষ ভাবে হস্তক্ষেপ করবে।

আইসেন হাওয়ার যে নীতি অনুসরণ করছেন তাও সমস্যা সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আরব রাষ্ট্রগুলি নির্ভর যোগ্য নয়। সৌদি আরব আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছে, মিশরের কাছ থেকে সোবিয়েৎ প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্রও হাত পেতে নিয়েছে, আবার ওমানের বিদ্রোহীদের আমেরিকান যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েৎ রাশিয়া এভাবে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করলে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না। পুরাতন ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া চলবে না। ইস্রায়েলকে

* "The evolution of land transport in the Middle Ages"—R. S. Lopez—Past & Present. April, 1956.

বাদ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের কথা চিন্তা করা যায় না। অথচ বাস্তুহারা আরবদের, যারা ইস্রায়েল থেকে বিতাড়িত হয়েছে, কোথায় পুনর্বসতি হতে পারে ?

সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি ইস্রায়েল সাময়িক ঘটনা নয় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র এই সত্যটুকু আরব নেতারা মেনে নেন। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ বিশেষত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইস্রায়েলকে আরও সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে, এবং সব ব্যাপারে ইস্রায়েলের মতামতের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আরবদের মনোভাব পরিবর্তনে সাহায্য করতে পারে। এতে যে আরব মহলে পাশ্চাত্য প্রভাব হ্রাস পাবে সে আশঙ্কা ভিত্তিহীন। বরঞ্চ দেখা গেছে ইস্রায়েল সম্পর্কে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের নীতি খুব স্পষ্ট নয় বলেই আরবরা ইস্রায়েলের বিরোধিতা করতে সাহস পেয়েছে। পশ্চিম জার্মানী ইস্রায়েলকে যখন সাহায্য করে তখন আরব লীগের তরফ থেকে শাসান হয়েছিল, জার্মানীর তৈরী জিনিষপত্র 'বয়কট' করা হবে। পশ্চিম জার্মানী তা অগ্রাহ্য করে। তখন থেকে পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে আরব রাষ্ট্রগুলির ব্যবসা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইস্রায়েলের সব দিক দিয়ে অভাবনীয় উন্নতি আরব নেতাদের মনে সৃষ্টি করেছে ঈর্ষা ও ভীতি। ইস্রায়েলের প্রতি তাদের বৈরিতার মূলে রয়েছে এই ভীতি। ইস্রায়েলে যে সব আরবরা বাস করে (যারা মিশরের আহ্বান সত্ত্বেও ইস্রায়েল ত্যাগ করেনি) ইস্রায়েল সরকারের প্রচেষ্টায় তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয়েছে। তাদের জীবন যাত্রার মান অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক উন্নত। এই প্রগতিশীল সমগোষ্ঠীয় আরবদের সংস্পর্শে এসে অন্যান্য আরবগোষ্ঠীও স্বদেশে সমাজ সংস্কার, শিক্ষার প্রচলন আর্থিক উন্নতি ইত্যাদি দাবি করতে পারে সে সম্ভাবনা রয়েছে। আরব নেতারা এই প্রভাব থেকে নিজ নিজ দেশের অধিবাসীদের দূরে রাখতে বদ্ধপরিকর। নবীন রাষ্ট্রের উচ্ছেদের জন্য বিদেশ থেকে যুদ্ধাস্ত্র আমদানি করতেও তারা দ্বিধা করে না। লেখক মনে করেন অদূর ভবিষ্যতে এই নেতাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে জড়িয়ে পড়তে হবে। তার সমাধানের জন্য ইস্রায়েল প্রদর্শিত পথেই তাদের অগ্রসর হতে হবে। তখনই মধ্যপ্রাচ্যে সত্যকার শান্তি ফিরে আসবে।*

মালয়েতে ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম—ওলন্দাজ ঐতিহাসিকদের মতে গুজরাটি মুসলমানদের প্রচেষ্টার ফলে মালয়েতে ইসলামধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। প্রবন্ধ লেখক ম্যারিসন তা মানতে রাজী নন। ১২৮০ খৃঃ মালয়েতে ইসলাম প্রথম প্রচারিত হয়। গুজরাট তখনও হিন্দু রাজার অধীনে ছিল। দ্বিতীয়তঃ গুজরাটিরা ইসমাইলী

* Current History—November, 1957. 'Israel in the Middle East'—Arthur C. A. Liveran.

সম্প্রদায়ভুক্ত, মালয়বাসীরা সুন্নী মুসলমান। চতুর্দশ শতকের শেষপাদে অধিকাংশ মালয়বাসী ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। যোড়শ শতকের প্রথম পাদে মালাক্কা পর্টুগীজরা দখল করে এবং সেখানকার অধিবাসীদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে। ইহার পর আরবের সহিত মালয় উপদ্বীপের যোগাযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এই সময় ভারতের সহিত যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি।

মালয়ের অধিবাসীদের উপর ইসলাম ধর্মের প্রভাব খুব গভীর নয়। তাদের মধ্যে বিবাহাদি অনুষ্ঠানে নানা প্রকার আদিম আচার ব্যবহার ও হিন্দু রীতি নীতির প্রচলন এখনও দেখা যায়। রবার এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম। যে বৎসর রবারের মূল্য বৃদ্ধি হয় সে বৎসর মালয় ও ইন্দোনেশিয়া থেকে বহু তীর্থযাত্রী 'হজ' উপলক্ষ্যে মক্কায় যায়।

মালয়েতে বসবাসকারী বিদেশীদের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ; তারা সাধারণত তামিলী—দোকানদার; মালায়লী—হোটেলওয়ালা, গুজরাটি—কাপড়ের ব্যবসাদার; পাঞ্জাবী—দরোয়ান এবং পিয়ন। এরা ধর্ম সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন। এরা ১৯৫০ সালের 'হার্টগ' দাঙ্গায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল।

খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব মালাক্কার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। মালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। মালয়বাসীরা অত্যন্ত রক্ষণশীল। যে কোন বিদেশী প্রভাবকে তারা সন্দেহের চক্ষে দেখে। পর্টুগীজরা মালাক্কায় অত্যাচার করার ফলে মালয়বাসীদের মনে জেগেছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা। এপর্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকগণ ঐ ধর্মের প্রতি মালয়বাসীদের আকৃষ্ট করার জন্য কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন নি। লেখক মনে করেন মালয়বাসীদের ভাষা শিক্ষা করে তাদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করলে ইভানজেলিষ্টরা খুব সহজেই মালয়েতে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন।*

তড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায়

* The Muslim World. October, 1957 Vol, No. 4—"Islam and Church in Malaya"—G. E. Marrison.

অষ্টম খণ্ড তৃতীয় সংখ্যা ১৩৬৪-৬৫

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

ইতিহাস

সম্পাদকঃ

শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রী নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ

৪৭-এ, একডালিয়া রোড :: কলিকাতা-১৯

সূচীপত্র

ইতিহাস

অষ্টম খণ্ড] ফাল্গুন-বৈশাখ, ১৩৬৪-৬৫ [তৃতীয় সংখ্যা

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ বিপ্লব

১৬৪০—৬০

অমলেশ ত্রিপাঠী

১

একথা বলা অসমীচীন নয় যে আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম মূল প্রসঙ্গ হোল বিপ্লব—তা দেশভেদে সাম্যবাদী বা জাতীয়তাবাদী যেই রূপ নিক না কেন। এই বৈপ্লবিক ধ্যান ধারণা ও প্রচেষ্টার গঙ্গোত্রী সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ড, ফরাসী ও রুশ বিপ্লবে পুষ্ট হয়ে তার ঢেউ আজ সমগ্র বিশ্ব প্লাবিত করতে চায়। তা অনেক অলীক মোহের আবর্ত সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই, মাঝে মাঝে দিকভ্রষ্টও হয়েছে, আর তার ফলে শস্যসম্ভব পলিমাটি নিয়েছে নিস্ফলা চোরাবালির রূপ। নূতন নূতন দল ও শ্রেণী তাদের স্বার্থ এবং সাধনা দিয়ে কতবার বৈপ্লবিক প্রবাহের প্রকৃতি বদলে দিলে, পথ ঘুরিয়ে দিলে। যন্ত্রশিল্পের অভাবনীয় উন্নতি তাকে দিলে দুর্বার বেগ। কিন্তু আজকের দিনের সামাজিক ও ঔপনিবেশিক বিপ্লব আর সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লব একই ঐতিহাসিক ধারার উত্তর ও পূর্বাবস্থা। যা ছিল স্বচ্ছ ও ক্ষীণধারা, দেশবিদেশের মাটী ও শাখাপ্রশাখার জল তাকেই দিয়েছে সমুদ্র সঙ্গমের দিগন্তব্যাপী প্রচণ্ড বিস্তার।

সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লবের ফলাফল বিবেচনা করলে প্রথমে তা মনে

হয় না। ইংরেজের চরিত্রগত আপোষ-প্রবণতা তার তাৎপর্য্য অনেকখানি আবৃত করে রেখেছে। কিন্তু অধ্যাপক ফার্থ তাঁর কেম্ব্রিজের রিড বক্তৃতা—The Parallel between the English and American Civil Wars-এ দেখিয়েছেন ১৬৪০ থেকে ১৬৬০ সালের ইতিহাসে ইংরেজ আপোষকে আমল দেয়নি। Clark Papers ও পাট্‌নীতে আহূত সৈন্যদলের বিতর্ক সভার বক্তৃতাবলী বিশ্লেষণ করলে, উইনষ্ট্যান্‌লির বক্তব্য অনুধাবন করলে উক্ত মত দৃঢ়তরই হবে। অন্ততঃ রাজতন্ত্রের সাময়িক বিলুপ্তি, প্রজাপুঞ্জের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে রাজার প্রাণদণ্ড এবং সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। পার্লামেণ্ট শাসনের সুরুও এই যুগে। দ্বিতীয়তঃ বিপ্লবের ফলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাজগতে বিপুল আলোড়ন উঠেছে। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে অন্য কোন অধ্যায়ে রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি, রাজনৈতিক অধিকারের প্রকৃতি ও দায়িত্বের স্বরূপ, ধর্ম্ম, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বিবেকের স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌল বিষয় নিয়ে এত ব্যাপক ও গভীর আলোচনা হয় নি। প্রতিষ্ঠান (institution) নিয়েও হয়নি এমন পরীক্ষা নিরীক্ষা। ইউটোপিয় সমাজতন্ত্রবাদের ভাবনা জন্ম নেবার বহু পূর্বে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ সাম্য-বাদী সাধারণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিল, যদিও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে ধর্ম্মের ভাষায় তার আশা আকাঙ্ক্ষা রূপ নিয়েছে।

তৃতীয়তঃ সমসাময়িক অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করলে এর পরিণতি বিস্ময়কর প্রতীয়মান হবে। জার্ম্মানীর অ্যানাব্যাপটিষ্ট আন্দোলন, স্পেনের বিরুদ্ধে ডাচদের স্বাধীনতা আন্দোলন ও তার সঙ্গে জড়িত অরেঞ্জ বংশের বিরুদ্ধে সাধারণতন্ত্রী আন্দোলন, ক্যাটালোনিয়া, পর্তুগাল ও নেপল্‌সের আধাজাতীয় আধাসামরিক আন্দোলন এবং ফ্রান্সের ফ্রঁদের কথা সবাই স্পষ্ট জানেন। কিন্তু অ্যানাব্যাপটিষ্ট আন্দোলনের কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বা কর্ম্মসূচী ছিলনা, খৃষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাবের আশার গোলকধাঁধাঁয় তার সব প্রচেষ্টা ঘুরে মরেছে। ডাচ বিপ্লবকে হয়ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রথম সার্থক বিপ্লব বলা যায় এবং তার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-সংস্কৃতির জগতে ডাচ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইউরোপের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু চিন্তাজগতে ইংল্যাণ্ডের অনুরূপ কোন সাড়া জাগেনি, দ্বিতীয় ফিলিপের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ ঘোষণা কোন নূতন

মতবাদের জন্ম দেয়নি। তার প্রতিপাদ্য ছিলনা স্বৈরতন্ত্র অমান্য করবার প্রকৃতিদত্ত মানবাধিকার (natural rights), ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের Apologie বরং জোর দিয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনের ওপর (যা দ্বিতীয় ফিলিপ ভঙ্গ করেছিলেন)। সর্ব্বজনীন ভোটাধিকারের কোন প্রশ্নই তাতে উত্থাপিত হয়নি বা শাসনের ভিত্তি যে প্রজা-সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত এমন কোন স্বীকৃতির চিহ্ন পাওয়া যায় না। ফ্রঁদের সময় কিছুটা রাজনৈতিক বিতর্ক হয়েছিল বটে কিন্তু একটিও নূতন ভাবনার উদয় হয়নি। অভিজাত শ্রেণী বা পার্লেমেণ্ট যেই জিতুকনা কেন, ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের মত তার শক্তি হতনা এবং জয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল নৈরাজ্য।[১] সুতরাং নানা দিক থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ তার সামাজিক প্রকৃতি সম্বন্ধে কি মতামত পোষণ করেন এবং সে বিষয়ে সাম্প্রতিক গবেষণা কোন পথে চলেছে বর্তমান প্রবন্ধে তারই আলোচনা করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক আলোচনার প্রস্থানভূমি হোল মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গী যা রুশ বিপ্লবের সময় থেকে অধিকাংশ ঐতিহাসিককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। মার্ক্সবাদীর চোখে বিপ্লব শ্রেণী-সংগ্রামের চরম রূপ। সেই সংগ্রামের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রশক্তি অধিকার এবং তার পরিণামের ওপর পরস্পর বিরোধী সমাজব্যবস্থার জয় পরাজয় নির্ভরশীল। স্বতঃই সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লব সম্বন্ধে উক্ত মতবাদ প্রযুক্ত হচ্ছে। রাজতন্ত্রী ও পার্লামেণ্টতন্ত্রীর বিরোধ যে শুধু শাসনতান্ত্রিক বিরোধ নয়, এমন কি আরমিনিয়ান ও পিউরিটান অভিহিত দুই ধর্ম্মমতের বিরোধ নয়, বরং অর্থনৈতিক প্রাধান্য লাভের জন্য দুটি সামাজিক শ্রেণীর সংগ্রাম এমন

১। H. See Les idees politiques en France au XVIIIe Siecle pp. 85-86 and chapt. IV. Also P. Doolin, The Fronde (Camb. 1935), chapt. III-VI.

সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। বলা বাহুল্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবাদগুলিকে এক বা অন্যপক্ষের সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা চলেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লবের যাঁরা প্রথম বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশপ গার্ডিনার ও অধ্যাপক ট্রেভেলিয়ান। মেকলের ইতিহাস হুইগ ব্যাখ্যার অনবদ্য নিদর্শন, কিন্তু র‍্যাঙ্কের পরবর্তী কোন ঐতিহাসিক তাকে নিরাসক্ত ইতিহাস বলে স্বীকার করবে না। গার্ডিনার এই বিপ্লবের কোন বিশেষ সামাজিক প্রকৃতি খুঁজে পান নি। History of the Great Civil War এর প্রথম খণ্ডে তিনি স্পষ্টই বলেছেন ফরাসী বিপ্লবের মত ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব শ্রেণীসংগ্রাম নয় কারণ রাজা ও পার্লামেণ্ট উভয় পক্ষেই অভিজাত, সহরবাসী ও ইওমেনদের দেখা যায়। ট্রেভেলিয়ানের মতে এই বিপ্লব শ্রেণীসংগ্রাম নয়, ভাবনার সংগ্রাম। England under the Stuarts-এ তিনি লিখেছেন "For in motive it was a war not of classes or of districts, but of ideas." পরবর্তীকালে English Social Historyতে অনুরূপ মন্তব্য পাই— "The Cromwellian Revolution was not social and economic in its causes and motives. It was the result of political and religious thought and aspiration among men who had no desire to recast society or redistribute wealth." সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা রাজনীতিকে বা ধর্ম্মকে কিঞ্চিৎ প্রভাবিত করলেও তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া যায় না কারণ লোকে সে বিষয়ে অর্ধসচেতন ছিল।

গার্ডিনার বা ট্রেভেলিয়ানের প্রতিপাদ্য মেনে নেওয়া চলে না। প্রত্যেক বিপ্লবেই কিছু কিছু উদাহরণ মেলে যেখানে একই শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে যোগ দিয়েছে। এর কারণ মানুষের বিচিত্র উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক দেখবেন কোন পক্ষ জিতলে বা হারলে কোন ধরনের শ্রেণীস্বার্থ এবং সমাজগঠনাদর্শ জয়ী বা বিজিত হবে। তাছাড়া ভাবনা মানুষের কার্য্যকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে মেনে নিলেও তাকেই ঘটনার অনন্য নিয়ন্তা স্বীকার করা অসম্ভব। ঐতিহাসিক ভাবনাগুলিকে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করবেন, তাদের সাহায্যে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে না বাধা-প্রাপ্ত হচ্ছে বিচার করবেন। ধর্ম্মমত বা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক চিন্তাধারা

বা সাহিত্যকৃতি প্রত্যেকটিরই স্বকীয় তাৎপর্য্য বিদ্যমান। কিন্তু ঐতিহাসিকের কর্তব্য তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা, পারিপার্শ্বিক সংঘর্ষের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ পর্য্যালোচনা করা এবং তার দ্বারা তাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যের ওপর নূতন আলোকপাত করা। গাডিনার সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে একেবারেই নিরঙ্কুশ ছিলেন আর ট্রেভেলিয়ান মেকলের পদ্ধতিতে সমসাময়িক আচার ব্যবহার রীতিনীতি আলোচনা করেই ক্ষান্ত। উভয়ে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল সামাজিক কাঠামো সম্বন্ধে অনবহিত। ফলে তাঁদের ইতিহাসে অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলে না, যেমন কেন পিউরিট্যানরা সহরাঞ্চলে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল, আর্চবিশপ লডের সংস্কারের বিরুদ্ধে কেন এত শক্তিশালী প্রতিবাদ উঠেছিল, কেন বস্ত্র-শিল্পের কেন্দ্রগুলি পার্লামেণ্ট পক্ষ অবলম্বন করেছিল। কেন লঙ পার্লামেণ্ট ফিউড্যাল টেনিওর উচ্ছেদ করলেও তন্নিম্ন টেনিওরে হস্তক্ষেপ করে নি, কেনই বা এ সময় নানা র‍্যাডিক্যাল আন্দোলন গড়ে ওঠে। আধুনিক ঐতিহাসিকের কাছে উপর্য্যুক্ত প্রশ্নগুলি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং এড়িয়ে না গিয়ে তাঁরা উত্তর দেবার চেষ্টা করছেন। এক এক করে সেগুলি বিবেচনা করা যাক্।

৩

জে. ডব্লু. নেফ্ ও এল. ষ্টোন প্রমুখ ঐতিহাসিকের বক্তব্য ১৫৪০ থেকে ১৬৪০ এর মধ্যে ইংলণ্ডে এক শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল এবং তাকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক প্রগতির পুরোধা এক দল গড়ে ওঠে। এই দলে ছিল সেই সব বণিক শিল্পের সঙ্গে যাদের যোগ ঘনিষ্ঠ (যেমন clothiers), ব্যবহারজীবী, ইওমেন ও ছোটখাট ফ্রিহোল্ডার এবং নূতন জোতদার শ্রেণী (new gentry) যারা টিউডার আমল থেকেই কৃষিকর্ম্মে ধনতান্ত্রিক প্রথা প্রয়োগ করছিল, খনিজ সম্পদ উৎপাদনে মন দিয়েছিল এবং সুবিধামত শিল্প, বাণিজ্য এবং ঔপনিবেশিক উদ্যম গুলিতে মূলধন নিয়োগ করত। এই দলের বিরোধী শিবিরে ছিল সেই সব বণিক একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার

নিয়ে রাজার সঙ্গে যাদের যোগ ঘনিষ্ঠ, বড় বড় মহাজন যারা লাভ-জনক চাকুরীর বিনিময়ে রাজাকে টাকা ধার দিত, রাজকর্ম্মচারী ও পারিষদবর্গ এবং আধা-ফিউড্যাল অভিজাতকুল। এই অভিজাতকুল দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে কিছুতেই নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনি আর যোগ্যতার সঙ্গে জমিদারী চালাতে না পেরে ও ব্যয় বাহুল্য কমাতে না পেরে ক্রমশঃ ঋণজালে জড়িয়ে পড়ছিল। বলাবাহুল্য এরা নূতন জোতদার শ্রেণীর উন্নতি সুনজরে দেখতে পারেনি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে মন্ত্রীরা যখন শিল্পকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা পেলেন স্বতঃই তখন শিল্প বিপ্লবের নেতা ও তাদের সঙ্গে জড়িত স্বার্থের সঙ্গে রাজতন্ত্রের বিরোধ বাধল। নেফের ভাষায় "Together with the religious and political conflicts described by Gardiner and other historians, this economic conflict, with its industrial origins, brought about the constitutional crisis of the seventeenth century. The influence of industrial upon constitutional history was more positive and probably stronger than the influence of constitutional upon industrial history."[২] ষ্টোনের মতে শিল্প-বিপ্লবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণী কেবল ধনাগমপন্থাগুলি আয়ত্ত করে ক্ষান্ত হয়নি, হাউস অব কমন্সেও প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার পরিণাম ষ্টুয়ার্ট রাজতন্ত্র ও পার্লামেণ্টের ক্রমবর্দ্ধমান কলহ এবং গৃহযুদ্ধ।[৩] ক্রিষ্টোফার হিল তাঁর The English Revolution নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে, মরিস ডব তাঁর Studies in the Development of Capitalism গ্রন্থের ১৭০-৭১ পৃষ্ঠায় এবং মরিস এশলি তাঁর পেঙ্গুইন সিরিজের সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে মোটামুটি এই মত গ্রহণ করেছেন।

ক্রিষ্টোফার হিলের বক্তব্য, যে দলের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্ট যুদ্ধ ঘোষণা

২। J. W. Nef, Industry and Government in France and England, 1540—1640, p. 149.

৩। L. Stone, "State control in Sixteenth Century England, Economic History Review, XVII, n. 2 (1947), p. 120.

করল তা হল "a semi-feudal aristocracy, the successors in social position and political power···of the feudal class which had ruled in England since the Norman Conquest." কিন্তু তাঁর দেওয়া সামন্ত প্রথার সংজ্ঞা অনেকে গ্রহণ করেনি।[৪] সন্দেহ

৪। ক্রিষ্টোফার হিলের সংজ্ঞা হ'ল "a form of society in which agriculture is the basis of the economy and in which political power is monopolised by a class of land owners." Hill and Dell, *The Good Old Cause*, p. 19. ডবের সংজ্ঞায় সামন্ততন্ত্র হ'ল "a mode of production," যা সার্ফ প্রথার সঙ্গে একাত্ম। রুশ ঐতিহাসিক পক্রভস্কি সামন্ততন্ত্র সম্বন্ধে বলেছিলেন—"a system of self-sufficient—natural economy"—"an economy that has consumption as its object." পরবর্তী রুশ ঐতিহাসিক এ সংজ্ঞা গ্রহণ করেন নি। অধ্যাপক কস্‌মিন্‌স্কি তাঁর *Studies in the Agrarian History of England in the thirteenth century* গ্রন্থের ভূমিকায় (VI) ডবের সংজ্ঞাকে আরও বিশদ করেছেন। সামন্ত তন্ত্রের দুটি সামান্য লক্ষণ তিনি নির্দেশ করেছেন—(a) A special type of landed property which was directly linked with the exercise of lordship over the basic producers of society (b) A special type of class of basic producers with a special connection with the land—which remained, however, the property of the ruling class of feudal lords. সম্প্রতি রাশটন কুলবর্ণের সম্পাদনায় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *Feudalism in History* নামে সামন্ততন্ত্র সম্বন্ধে এক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছে। তাতে রুশ অধ্যাপক Szeftel রুশ ঐতিহাসিকগণ বর্তমানে এ বিষয়ে কি ভাবছেন তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে সামন্ততন্ত্র হ'ল "a social and economic format based on the appropriation by the landlord of a part of the cultivator's work" (p. 415). অমার্ক্সিষ্ট ঐতিহাসিক এমনকি রাশিয়ার বাইরের অনেক মার্ক্সিষ্ট ঐতিহাসিক এসব সংজ্ঞা গ্রহণ করেন নি। প্রথমোক্তরা সামন্ততন্ত্রের আইনগত লক্ষণের ওপর অধিক জোর দিয়েছেন। যেমন *Cambridge Economic History of Europe* এ অধ্যাপক ষ্ট্রুভ (Struve) : "a contractual but indissoluble bond between service and land grant, between personal obligation and real right." মার্ক ব্লখ ও গ্যানসফের পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য।

নেই যে টিউডর ও ষ্টুয়ার্ট যুগে সমস্ত প্রথার বহু চিহ্ন বর্তমান ছিল।[৫] হার্ষ্টফিল্ড ওয়ার্ডশিপ সম্বন্ধে তা ভালো করে দেখিয়েছেন এবং ম্যানর কোর্ট গুলির নথিপত্র বিশ্লেষণ করলে আরও প্রামাণ্যতথ্য মিলবে। তবু অধ্যাপক টনি বৃহত্তর ভূম্যধিকারীকুলকে 'semi-feudal' আখ্যা দিতে প্রস্তুত নন। ব্রাণ্টন ও পেনিংটনের Members of the Long Parliament এর ভূমিকায় তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন—"If the word 'feudal' refers merely to territorial influence it draws no dividing line between Royalists and Parliamentarians, such influence was exercised by both. If it is used, as it should be, in a more precise sense to describe a class dependent wholly or mainly like the French *noblesse* before 1789, on the revenue from seigneurial rights, it is a solecism, for unless the right in question be interpreted to include all or most payments from tenants to landlords, evidence of the existence of such a class in the England of Charles I is still to seek."

কেম্‌ব্রিজের ইকনমিক হিষ্ট্রি রেভ্যুর পৃষ্ঠায় অনেকদিন আগে থেকেই অধ্যাপক টনি এযুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে আসছেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধটি—The Rise of the Gentry, 1558-1640—বেরোয় ১৯৪১ সালে। সেই বছর বৃটিশ অ্যাকাডেমিতে তিনি হ্যারিংটনের ওপর র‍্যালে বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক ট্রেভর রোপার কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে ১৯৫৪ সালের ইকনমিক রেভ্যুতে তিনি প্রত্যাক্রমণ করেন —"The Rise of the Gentry : a Postcript." নামক প্রবন্ধে। সাতটি কাউন্টির ২৫৪৭টি ম্যানরে ১৫৫৮ ও ১৬৪০ সালের মধ্যে কি ভাবে জমি হস্তান্তর ঘটেছে টনির প্রতিপাদ্য সেই মালমসলার ওপর তৈরী। তাঁর মতে গৃহযুদ্ধের এক শতাব্দী পূর্ব্বে এক নূতন ভূম্যধিকারী শ্রেণীর

৫। J. B. Hurstfield, "The Revival of Feudalism in Early Tudor England." History, XXXVII, 1952, p. 130.

উদয় হয়। তারা ধনতান্ত্রিক প্রথায় চাষবাস করতে থাকে এবং রাস্তা চার্চ্চ, পুরাতন অভিজাতকুল এবং ছোটখাট প্রজা সকলকেই শোষণ করে সম্পত্তি বাড়াতে থাকে। অর্থনৈতিক প্রাধান্যের অবশ্যম্ভাবী ফল রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবী এবং গৃহযুদ্ধের পর তাতে সাফল্যলাভ। ষ্টোনের গবেষণা টনির প্রস্তাবকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করে। তিনি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পুরাতন অভিজাত কুলের আর্থিক অবনতি দেখিয়েছেন।[৬] অধ্যাপক ক্যাম্পবেলের ইওমেন শ্রেণীর ওপর গবেষণাও টনির সমর্থক। নবীন ভূম্যধিকারীর (new gentry) অনেকেই উঠেছিল এই "land hungry, profit-hungry, profit-conscious class" থেকে।[৭] এতদ্ব্যতীত এদের আর্থিক শক্তি জুগিয়েছিল পিউরিট্যান চিন্তাধারা যা ব্যবসায়কে প্রায় ধর্ম্মের পর্য্যায়ে উন্নীত করেছিল এবং মুনাফা লোভকে অন্যতম virtue বলে বিশ্বাস করত।

অধ্যাপক টনির মতামতের জোরালো প্রতিবাদ এসেছে অক্সফোর্ডের বর্তমান রিজিয়াস অধ্যাপক ট্রেভর রোপারের কাছ থেকে। ইকনমিক হিষ্ট্রি রেভ্যুতে উভয়ের মধ্যে বহুদিন মসীযুদ্ধ চলেছিল। ট্রেভর রোপার পুরাতন অভিজাতকুলের ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক সংকট অস্বীকার করলেন,[৮] জেন্ট্রি শ্রেণীর উন্নতি অপেক্ষা অবনতি লক্ষ্য করলেন। তাঁর মতে কেবলমাত্র যে কয়েকজন নবীন জোতদার ভাল চাকুরী পেত বা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল বা অন্য কোন লাভজনক কাজ করত তারাই অবস্থার উন্নতি করতে পারত। কিন্তু এদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। জেন্ট্রির অধিকাংশ থাকত

৬। L. Stone, "The Anatomy of the Elizabethan Aristocracy, Economic History Review, XVIII, n. 1—2 (1948) এবং "The Elizabethan Aristocracy—a Restatement." Ecomonic History Review, 2d Series, IV, n. 3 (1952)

৭। M. Campbell, The English yeoman under Elizabeth and the Early Stuarts, P. 220 et seq.

৮। H. R. Trevor Roper, "The Elizabethan Aristocracy : an Anatomy anatomised," Economic History Review, 2d Series, III n. 3 (1951).

গ্রামাঞ্চলে চাষবাস নিয়ে এবং ষ্টুয়ার্ট নীতি তাদের সর্বপ্রকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। ক্রমওয়েল ও ইণ্ডেপেণ্ডেণ্টরা ছিলেন এই বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতিভূ এবং গৃহযুদ্ধের অন্যতম কারণ হ'ল এদের ধন, সামাজিক মর্য্যাদা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি আকাঙ্খা।[৯]

টনি এর যথাযোগ্য উত্তর দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ট্রেভর রোপারের সমালোচনা মেনে নিলেও তিনি পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল আছেন।[১০] কেরিজ উক্ত পত্রিকায় এক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন আলোচ্য যুগে শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায় কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বেশী বাড়ে এবং তার ফলে খাজনার হার ও দ্রব্যমূল্যের হারের মধ্যে ব্যবধান বাড়ে। খাজনার হার অধিক থেকে অধিকতর হওয়ায় জেন্ট্রির শ্রীবৃদ্ধিই হয়, অন্ততঃ অধঃপতনের কথা ভাবাই যায়না।[১১] তাছাড়া ট্রেভর রোপারের অন্যান্য প্রমাণ ও যথেষ্ট নয়।

সম্প্রতি ব্রাণ্টন ও পেনিংটন নেমিয়ার পন্থায় লঙ্‌ পার্লামেণ্টের সভ্যদের বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন গৃহযুদ্ধকে প্রগতিশীল জেন্ট্রি ও পতনোম্মুখ অভিজাত শ্রেণীর সংঘর্ষ বলা চলে না। রাজপক্ষ ও পার্লামেণ্ট পক্ষের মধ্যে কোন শ্রেণীগত পার্থক্য তাঁরা খুঁজে পাননি।[১২] এমত বিশপ গার্ডিনারের মন্তব্যকে সমর্থন করেছে। আরেক ঐতিহাসিক, মেরী কিলারও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।[১৩] যে সব সভ্য ১৬৪১ সালে রাজাকে তার ঐতিহ্য-লব্ধ নানা অধিকার থেকে

৯। H. R. Trevor Roper, "The Gentry, 1540—1640," Economic History Review, Supplements, I

১০। R. H. Twaney, "The Rise of the Gentry : a Postscript Economic History Review, 2d series, VII. n. 1 (1954)

১১। E. Kerridge, "The Movement of Rent, 1540—1640," Economic History Review, 2d series, VI no. 1 (1953).

১২। D. Brunton and D. H. Pennigton, *Members of the Long Parliament, pp. 19—20.*

১৩। Mary Keeler, *The Long Parliament 1640—41 A Biographical Study of its Members,*

বঞ্চিত করে, তাদেরই অনেকে পরে রাজপক্ষে যোগ দেয়। অবশ্য একটা প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে। পার্লামেণ্টের সভ্য কোন দেশের পক্ষে কতখানি typical ? ধন ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে তাঁরা বিশিষ্টই হয়ে থাকেন। তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করে ব্রাণ্টন ও পেনিংটন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সমগ্র দেশের পক্ষে তা কতটা প্রযোজ্য ?

১৬৪০ থেকে ১৬৫০ সালের মধ্যে রাজপক্ষীয়দের অনেক জমি নীলামে বিক্রয় হয়েছিল এবং অনেকে এর পশ্চাতে জেন্ট্রি শ্রেণীর স্বার্থ দেখতে পান। কিন্তু আরও একটু অনুধাবন করলে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজপক্ষীয়েরাই বেনামে জমিগুলি কিনে নিয়েছে। এ যুগে কোন বিশিষ্ট ভূম্যধিকারীর উদ্ভবের কথা শোনা যায় না।[১৪] অতএব জেন্ট্রির উত্থানের সঙ্গে গৃহযুদ্ধের সম্পর্ক উপস্থাপন করার বিপদ আছে।

উপসংহারে বলা যায় উপর্যুক্ত আলোচনার কয়েকটি দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমতঃ "জেন্ট্রি" বা "অ্যারিস্টোক্র্যাসির" সঠিক সংজ্ঞা কি ? সে বিষয়ে মতানৈক্য যথেষ্ট অথচ সংজ্ঞা বিষয়ে মতভেদ থাকায় অনেক অনাবশ্যক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ "জেন্ট্রির" ওপর গবেষকরা বড় বেশী জোর দিয়েছেন, সে অনুপাতে লণ্ডন ও অন্যান্য মফস্বল সহরের বণিকশ্রেণী বা কারুশিল্পী শ্রেণী (artisan) নিয়ে কোন বিশদ আলোচনা হয়নি। জেন্ট্রির নিম্নস্তরের ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। স্থানীয় দলিল দস্তাবেজের সাহায্য না নিলে এ সকল তথ্য মিলবে না। ইংল্যাণ্ডের গবেষণাজগতে অর্থনৈতিক ও স্থানীয় ইতিহাস কি ভাবে রাজনৈতিক ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করছে, তার কিছু নমুনা দেওয়া গেল। আশা করি সহকর্মীগণ কিছু অনুরূপ উদ্যম নিয়ে ও পন্থা অবলম্বন করে ভারতীয় ইতিহাস ক্ষেত্রের নানা অন্ধকার কোনে আলোক সম্পাত করবেন।

১৪। Joan Thirsk, "The sales of Royalist lands during the Interregnum," Economic History Review, 2d Series IV. no. 2 (1952)

নেপালের ইতিহাস সম্পর্কে দুইটি নূতন তথ্য

শ্রী সরসীকুমার সরস্বতী

নেপালের ইতিহাস সম্পর্কে কয়েক ধরণের বংশাবলী কাহিনী নেপালে প্রচলিত আছে। নেপালের ইতিহাসরচনার আদিযুগে পণ্ডিতেরা এই বংশাবলী কাহিনীর উপর অনেকখানি নির্ভর করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন বংশাবলীর পরস্পরবিরোধী উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বংশাবলীর তথ্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রামাণিক বা নির্ভরযোগ্য নয়। বংশাবলীগুলি সাধারণতঃ সংকলিত হয়েছে অনেক পরবর্তী যুগে। তখন অতীত ঘটনা অস্পষ্ট স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত। সুতরাং বংশাবলীর কাহিনীতে ভুল তথ্যের সমাবেশ বিচিত্র নয়। ইতিহাসরচনার আর একটি মূল্যবান উপাদান প্রাচীন লেখমালা। নেপাল উপত্যকা এই উপাদান-সম্পদে সমৃদ্ধ। অতীত ঘটনা সম্বন্ধে লেখমালার তথ্যও কোন কোন ক্ষেত্রে অপ্রামাণিক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কেও লেখমালার তথ্য অতিশয়োক্তি আর পক্ষপাতদোষে দুষ্ট বলে জানা যায়।

নেপালের ইতিহাসের আর একপ্রকারের মূল্যবান উপাদান সন্নিবিষ্ট আছে প্রাচীন পুঁথির পুষ্পিকায়। নেপালের হিমশীতল আবহাওয়ায় অনেক প্রাচীন পুঁথি সেখানে রক্ষা পেয়েছে। এই সব পুঁথির অন্ত্যভাগে লিপি-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্য ছাড়াও তদানীন্তন রাজার নাম ও রাজত্ব কালের তারিখের উল্লেখ দেখা যায়। সমসাময়িক তথ্য হিসাবে এই পুঁথির পুষ্পিকা-গুলি বিশেষ মূল্যবান। বংশাবলী ও লেখমালার অনেক তথ্যের যাথার্থ্য যাচাই করা সম্ভব হয় পুঁথির পুষ্পিকার সাহায্যে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Bendall সাহেব এই মূল্যবান উপকরণের প্রতি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকর্ষণ করেন। এই প্রবন্ধের লেখক এশিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথি অবলম্বনে নেপালের ইতিহাস আলোচনা ক'রেছেন এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়। নেপালে আরও অনেক মূল্যবান তথ্য অনাবিষ্কৃত

আছে এই বিশ্বাসে লেখক ঐতিহাসিক তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের নিকট একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। ভারতসরকারের অনুমোদনেও অর্থ সাহায্যে ১৯৫৬ সালে বর্তমান লেখক নেপালে প্রথম পর্যায়ের অনুসন্ধান কার্য ক'রে এসেছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে অনেক মূল্যবান ও নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। তার সম্পূর্ণ বিবরণ এশিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। বর্তমান প্রবন্ধে লেখক দুইটী তথ্যের আলোচনা ক'রেছেন—একটী সংগৃহীত হয়েছে পুঁথির পুষ্পিকা থেকে, আর একটী নেপালে প্রাপ্ত লেখমালা থেকে।

১। রাজা সোমেশ্বরদেব

নেপালের বিভিন্ন বংশাবলীতে সোমেশ্বরদেব নামে এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর রাজত্বকালের কোন সঠিক তারিখ না জানায় রাজবংশ-তালিকায় সোমেশ্বরদেবের স্থান নির্ণয় করা এযাবৎ সম্ভব হয়নি। Bendall যে সব বংশাবলী পরীক্ষা ক'রেছেন তার একটী থেকে জানা যায় সোমেশ্বর-দেবের পিতার নাম মহেন্দ্রদেব। জৌরাজ (যুবরাজ) মহেন্দ্রদেব নেপাল সম্বৎ ২৩৯, অর্থাৎ ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'মহেন্দ্রসর' নামে একটী দিঘী খনন করেছিলেন। এই মহেন্দ্রদেব আর India Office এর একটী পুঁথিতে (সংখ্যা ২৯২৮; তারিখ নেপাল সম্বৎ ২৪৯=১১২৯ খ্রীষ্টাব্দ) উল্লিখিত রাজা ইন্দ্রদেব যে একই ব্যক্তি Bendall এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। Kirkpatrick যে বংশাবলীর উপর নির্ভর ক'রে নেপালের ইতিহাস রচনা ক'রেছিলেন তা' থেকে জানা যায় সোমেশ্বরদেব ছয় বৎসর তিনমাস রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু সোমোশ্বরদেবের রাজত্ব কালের কোন তারিখ না জানায় ঠিক কোন সময়ে তিনি নেপালে রাজত্ব করেছিলেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

Bendall এর একখানি বংশাবলীতে উল্লেখ আছে যে সোমেশ্বরদেব নেপাল সম্বৎ ২৪০, অর্থাৎ ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ বংশাবলীতে আর একটী উক্তি আছে—রাজা অস্ত বষ ৫৩। Bendall এই উক্তির ব্যাখ্যা করেছেন যে এই রাজা ৫৩ বৎসর বয়সে, অর্থাৎ নেপাল

সম্বৎ ২৯৩ (২৪০+৫৩) বা ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অস্তমিত হন, সহজ ভাষায় তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু আমাদের জানিত তথ্যের সহিত এই ব্যাখ্যার কোন সঙ্গতি নাই। নেপাল সম্বৎ ২৯৬ অর্থাৎ ১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পুর্বে সোমেশ্বর-দেবের রাজত্বকাল সুরু হতে পারে না।

ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত History and Culture of the Indian people গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে (পৃঃ ৪৬) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন যে রত্নদেবের পর সোমেশ্বরদেব রাজত্ব করেছিলেন। রত্নদেবের তারিখ-সম্বলিত কয়েকখানি পুঁথির অস্তিত্ব আগেই জানা ছিল। বর্তমান লেখকও রত্নদেবের সময়ের আর একখানি পুঁথি পেয়েছেন। সবগুলিতেই তাঁর তারিখ দেখা যায় নেপাল সম্বৎ ৩০৩, ও ৩০৪ অর্থাৎ ১১৮৩ ও ১১৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে সোমেশ্বরদেব ১১৮৪ খ্রীষ্টাব্দের পর রাজা হন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর Catalogue of Palmleaf and Paper Manuscripts in the Durbar Library, Nepal গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে Bendall যে রাজতালিকা দিয়েছেন, মনে হয় তার উপর নির্ভর করেই শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্ত করেছেন। কেবলমাত্র পুঁথি থেকেই রত্নদেবের অস্তিত্ব জানা যায়। আর সব পুঁথিতেই রত্নদেবের উল্লেখ আছে 'মহাসামন্ত' রূপে। সুতরাং নেপালের রাজবংশ-তালিকা থেকে রত্নদেবের নাম অনায়াসেই বাদ দেওয়া যেতে পারে। Bendall এর তালিকায় এই তথ্যের উল্লেখ থাকলেও শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সোমেশ্বর-দেবের মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে Bendall পাদটীকায় যে উক্তি করেছেন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সেটীও লক্ষ্য করেন নি বলেই মনে হয়।

নেপালে প্রথম অনুসন্ধান পর্যায়ে নেপালের প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি স্যর কাইজার সামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণার গ্রন্থাগারে লেখক সোমেশ্বর-দেবের তারিখসম্বলিত তিনখানি প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পান। এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত একখানি বংশাবলীর প্রতিলিপিতেও সোমেশ্বরদেবের অভিষেকের তারিখ দেওয়া আছে। নূতন আবিষ্কৃত এই তথ্যের সাহায্যে সোমেশ্বরদেবের রাজত্বকাল সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত সম্ভব হয়েছে। পুঁথি তিনখানি তাল পাতায় লেখা, বংশাবলীর প্রতিলিপি আছে কাগজে। প্রত্যেকটিরই লিপি নেওয়ারী।

প্রথম পুঁথিখানি 'প্রায়শ্চিত্তোপদেশ' নামক গ্রন্থের প্রতিলিপি। এটী নেপাল সম্বৎ ২৯৯।১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সোমেশ্বরদেবের রাজত্বকালে লিখিত হয়। পুঁথির অন্ত্যপুষ্পিকার এই বিবরণ পাওয়া যায়—

সম্বৎসরে নবাধিকনবতিশতদ্বয়ে মাসে মার্গশিরে শুক্লষষ্ঠমে রাজাধিরাজ পরমেশ্বর রঘুকুলতিলক শ্রীসোমেশ্বর দেবস্য বিজয়রাজ্যে লিখিতমিদম্...।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুঁথি লেখা হয় নেপাল সম্বৎ ৩০০।১১৮০ খ্রীষ্টাব্দে, সোমেশ্বর দেবের রাজত্বকালে। দ্বিতীয় পুঁথিখানি 'বোধিচর্য্যাবতার' গ্রন্থের প্রতিলিপি। অন্ত্যপুষ্পিকায় নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়—

সম্বৎ ৩০০ প্রথমাষাঢ় শুক্লষষ্ঠম্যাং বৃহস্পতিদিনে রাজা শ্রীসোমেশ্বরদেবস্য বিজয়রাজ্যে লিখিতমিদং পুস্তকম্।

তৃতীয় পুঁথি 'মহামন্থান ভৈরবতন্ত্র' গ্রন্থের প্রতিলিপি। এখানির অন্ত্যপুষ্পিকা এইরূপ—

সম্বৎ ৩০০ ফাল্গুন শুক্লপূর্ণিমায়াং [মহা] রাজ শ্রীসোমেশ্বরদেবস্য বিজয়রাজ্যে...।

উপরিলিখিত তিনখানি পুঁথির অন্ত্যপুষ্পিকা থেকে নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা চলে যে সোমেশ্বরদেব নেপাল সম্বৎ ২৯৯।১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং নেপাল সম্বৎ ৩০০।১১৮০ খ্রীষ্টাব্দে নেপালে সার্বভৌম রাজারূপে রাজত্ব ক'রছিলেন। শেষের দুইখানি পুঁথিতে তাঁকে শুধু রাজা বা মহারাজা বলে পরিচিত করা হয়েছে সত্য। কিন্তু প্রথম পুঁথিখানিতে তাঁর সার্বভৌম পরিচয় সুস্পষ্ট। যে সব লিপিকার পুঁথিসমাপ্তির কাল নির্দেশের প্রয়োজনে এইসব তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁরা সাধারণ স্তরের মানুষ, রাজদরবারের বিধি বা নিয়ম সম্বন্ধে প্রায়শঃই অজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং রাজার সম্পূর্ণ পদবী বা বিরুদ সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতা ক্ষমার্হ সন্দেহ নাই।

এই সম্পর্কে এই গ্রন্থ সংগ্রহে রক্ষিত বংশাবলীর একখানি খণ্ডিত প্রতিলিপির সাক্ষ্যও বিশেষ মূল্যবান। সোমেশ্বরদেবের অভিষেককাল সম্বন্ধে এই প্রতিলিপিতে নিম্নলিখিত উক্তি পাওয়া যায়—

সম্বৎ ২৯৯ কার্ত্তিক কৃষ্ণ ষষ্ঠী শুক্রবার [রাজাশ্রী] সোমেশ্বরদেব পুণ্যাভিষেক কৃতবান।

ভাষাগত ত্রুটী যথেষ্ট লক্ষিত হলেও, উক্তিটীর অর্থোদ্ধারে বিশেষ কষ্ট হয় না। এই উক্তি থেকে জানা যায় যে নেপাল সম্বৎ ২৯৯।১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে শুক্রবার সোমেশ্বরদেবের রাজপদে অভিষেক হয়েছিল। প্রথম পুঁথিখানি কাজেই তাঁর রাজত্বের প্রথম বৎসরে লেখা। বংশাবলীর এই প্রতিলিপিখানিতে সোমেশ্বরদেব কতদিন রাজত্ব করেছিলেন সে তথ্যও দেওয়া ছিল। কিন্তু বৎসরের সংখ্যাটি এখন নষ্ট হয়ে গেছে। মাসের সংখ্যা লেখা আছে ৩। Kirkpatrick সোমেশ্বরদেবের রাজত্বকাল ৬ বৎসর ৩ মাস ধরেছেন; মনে হয় বর্তমান বংশাবলীর বৎসরের লুপ্ত সংখ্যাটী হবে ৬। এই অনুমান সত্য হ'লে সোমেশ্বরদেব ছয় বৎসর তিনমাস রাজত্ব করেছিলেন। বর্তমান বংশাবলীতে পাওয়া যায় যে তিনি নেপাল সম্বৎ ২৯৯।১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজপদে অভিষিক্ত হন। সুতরাং নেপাল সম্বৎ ৩০৫।১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রাজত্বকাল শেষ হয় বলে সিদ্ধান্ত করা চলে। উল্লিখিত তিনখানি প্রাচীন পুঁথির সাক্ষ্যও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। এই সব নূতন তথ্য আবিষ্কারের ফলে নেপাল সম্বৎ ২৯৩।১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সোমেশ্বর দেবের মৃত্যু হ'য়েছিল Bendallএর এই মত যথার্থ ব'লে স্বীকার করা চলে না। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক নেপালের রাজবংশতালিকায় রত্নদেবের পর সোমেশ্বরদেবের স্থান নির্দেশও জ্ঞাত তথ্যের বিরোধী বলে স্বীকারযোগ্য নয়। রত্নদেবের জানা তারিখ নেপাল সম্বৎ ৩০৩।১১৮৩ খ্রীষ্টাব্দ ও ৩০৪।১১৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। সর্বত্রই তিনি 'মহাসামন্ত'রূপে উল্লিখিত হয়েছেন। কাজেই এ সিদ্ধান্ত অসমীচিন নয় যে রত্নদেব সোমেশ্বরদেবের অধীনে একজন মহাসামন্ত ছিলেন।

২। সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের নেপাল অভিযান

নেপালে আর আমাদের দেশে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে নেপাল কোনদিন মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। মুসলমান ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে ও নেপালে মুসলমান অভিযানের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু নেপাল ও

যে মুসলমানদের সর্বধ্বংসী আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি তার প্রমাণ নেপালে এখনও বিদ্যমান আছে। স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ জয়সবাল মহাশয় নেপালের স্বয়ম্ভূনাথ প্রাঙ্গণে অবস্থিত একটী সংস্কৃত লিপির প্রতি সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই লিপি থেকে জানা যায় সুলতান সমসদীন বাংলার বহু সৈন্য নিয়ে নেপাল আক্রমণ করেছিলেন। সমসদীনের এই অভিযানের তারিখ ও এই লিপিতে পাওয়া যায়। জয়সবাল মহাশয় তারিখটির সঠিক পাঠোদ্ধার ক'রতে না পারায় আচার্য যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত History of Bengal গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আক্রমণের তারিখটি সম্বন্ধে ভুলতথ্য স্থান পেয়েছে। প্রাচীন পুথির অনুসন্ধানে নেপালে অবস্থানকালে লেখকের এই লিপিটি পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ হয়েছিল। সেই সময়ে তিনি মুসলমান আক্রমণের তথ্যসম্বলিত আর একটী লিপির সন্ধান প্রাপ্ত হন পাটনে। মুসলমান আক্রমণের অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যায় নেপালের এক বংশাবলীতে। এই বংশাবলী খানি খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের শেষ ভাগে, অর্থাৎ মুসলমান আক্রমণের সামান্য কিছুকাল পরে, সংকলিত হ'য়েছিল। প্রধানতঃ এই তিনটী প্রমাণের উপর ভিত্তি ক'রে এই প্রবন্ধে নেপালে মুসলমান অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে।

প্রাচীন ললিতপুরী বা পাটনে নেপাল সম্বৎ ৪৭৭ অর্থাৎ ১৩৫৭ খীষ্টাব্দের এক লিপিতে সমসদীন নামে এক যবন রাজার নেপাল আক্রমণের উল্লেখ দেখা যায়।

শ্রুতান সমসদীন যবনাধিরাজঃ
নেপাল সর্বনগরং ভস্মীকরোতি।

এই লিপির 'শ্রুতান' আর 'সমসদীন' অবশ্যই 'সুলতান' আর 'সামসুদ্দীন' শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর। আক্রমণের ধ্বংসলীলায় প্রাচীন নগরীর অনেক ধর্মস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে মেঘপাল বা মেঘবর্মা নামে একজন মহাপাত্র একটী চৈত্যের সংস্কার করেন। এই সংস্কারের উল্লেখ দেখা যায় নেপাল সম্বৎ ৪৭৭।১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এই লিপিতে। আক্রমণের তারিখ এই লিপিতে না পাওয়া গেলেও এই অভিযান যে ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই ঘটেছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

জয়সবাল মহাশয় যে লিপি প্রকাশ করেছেন সেটি দেখা যায় কাঠমাণ্ডুর সন্নিকটস্থ স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে। নেপাল সম্বৎ ৪৯২ বা ১৩৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই লিপিটি উৎকীর্ণ হয়। এই লিপি খানিতে অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলার সৈন্যবাহিনী সহ সুলতান সমসদীনের নেপাল আক্রমণ নিম্নলিখিত দুইটী শ্লোকে বিবৃত হ'য়েছে।

সপ্তত্যভ্যধিকে শ্রীমন্নেপালাব্দ চতুঃশতে।
মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে দশম্যাং গুরুবাসরে ॥
সুরত্রাণ সমসদীনো বঙ্গাল বহুলৈ র্বলৈঃ।
সহাগত্য চ নেপালে ভগ্নো দগ্ধশ্চ সর্বশঃ ॥

সুতরাং এই লিপির সাক্ষ্য অনুসারে নেপালে এই মুসলমান অভিযান সংঘটিত হয় নেপাল সম্বৎ ৪৭০ অর্থাৎ ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে। জয়সবাল মহাশয় তারিখের 'সপ্তত্যভ্যধিকে' এই অংশটী প'ড়েছিলেন 'সপ্তষষ্ঠাধিকে', আর সে অনুসারে অভিযানের তারিখ ধ'রেছিলেন নেপাল সম্বৎ ৪৬৭ অর্থাৎ ১৩৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলার ইতিহাসে' এই তারিখটীই লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। বর্তমান লেখক তারিখের এই অংশটী বিশেষ ভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। 'সপ্তত্যভ্যধিকে' এই বাক্যটী স্পষ্ট, আর এই পাঠ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এই আক্রমণ নেপাল সম্বৎ ৪৭০।১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে ঘ'টেছিল ব'লেই জানা যায়। নিম্নে উল্লিখিত আর একটী প্রমাণেও এই তারিখ সমর্থিত হয়। লিপিতে বাংলাদেশের সৈন্যবাহিনীর উল্লেখ থাকায় আক্রমণকারী সুলতানের পরিচয় ও সহজে জানা যায়। বাংলা দেশের সুলতান সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তিনিই যে এই নেপাল অভিযানের নায়ক ছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

ইলিয়াস শাহের নেপাল অভিযানের কিছুকাল পর জয়রাজদেবের মৃত্যু হয়। রাজা হন তাঁর পুত্র জয়ার্জ্জুনদেব। জয়ার্জ্জুনদেবের রাজত্ব-কালে রাজ হর্ষ-নামক একজন অমাত্য ধর্মধাতু স্তূপটি পুনর্নিমাণ করেন, আর অন্যান্য ধর্মস্থানগুলিরও সংস্কার করেন। এই লিপিতে এই সব সংস্কারের বিবরণ দেওয়া আছে, আর সে সব কাজ নেপাল সম্বৎ ৪৯২।১৩৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই শেষ হয়েছিল।

মুসলমানদের নেপাল আক্রমণের তৃতীয় প্রমাণ পাওয়া যায় একখানি বংশাবলীতে। Bendall বংশাবলীর প্রতিলিপিটি পরীক্ষা করে সেখানি চতুর্দ্দশ শতকের শেষভাগে সংকলিত হয়েছিল ব'লে অনুমান করেছেন। এই বংশাবলীর কয়েকখানি পত্রের চিত্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের Catalogue of Palmleaf and Paper Manuscripts in the Durbar Library, Nepal গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। একখানি পত্রে জয়রাজদেবের রাজত্বকালের বিবরণ তারিখসহ উল্লেখ আছে। নেপাল সম্বৎ ৪৬৭।১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জয়রাজদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা হয়েই তাঁকে বিষম বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে দেশে তখন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। জয়রাজকে প্রথমেই এই বিশৃঙ্খলা দমনের চেষ্টা ক'রতে হয়। অর্থের অনটন হেতু নেপাল সম্বৎ ৪৬৮।১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পশুপতিনাথের কোষাগার থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। নেপাল সম্বৎ ৪৬৯।১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে নূতন বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। এই বৎসরও তিনি পশুপতিনাথের কোষাগার থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। আর এই বৎসরই পূর্বদেশের সুলতান নেপালে এসে পশুপতিনাথ বিগ্রহ তিনটুকরো করে ভেঙ্গে ফেলেন, এবং সব ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেন। ফলে সব লোক হাহাকার করে উঠে।

সম্বৎ ৪৬৯ পৌর্ণমাস্যাং শ্রীশ্রীরাজাজয়রাজদেবেন শ্রীপশুপতিভট্টারকস্য কোষ প্রচোকিতম্। তেন তত্র পূর্বস্সুরত্রাণ সমসদীনেনাগত্য শ্রীপশুপতি-স্ত্রিখণ্ডীকৃতঃ, নেপাল সমস্ত ভস্মীভবানা হাহাকরোন্তি লোকাশ্চ॥

উল্লিখিত তথ্যের বিচারে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ইলিয়াসশাহের নেপাল অভিযানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাই হোক্, নেপালের প্রধান প্রধান দেবস্থানগুলি এই অভিযানে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। নেপালের প্রাচীন দেবস্থানগুলির অপরিমিত ঐশ্বর্য্য তাঁকে নেপাল অভিযানে প্রলুব্ধ ক'রেছিল বললে হয়ত অত্যুক্তি হয় না। ১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পশুপতিনাথের প্রসিদ্ধ দেবস্থান ইলিয়াসশাহ বিধ্বস্ত করেন। তারপর পালা এলো পাটন আর স্বয়ম্ভূনাথের। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্বয়ম্ভূনাথের সুপবিত্র ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। সর্বত্রই এই অবাধ লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা সুলতান মামুদের ভারতাভি-

যানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জয়রাজদেবের সিংহাসনারোহণের সময় থেকেই রাজ্যে বিশৃঙ্খলা চলছিল। ফলে জয়রাজদেব এই বিধর্মী বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। এই আক্রমণের প্রচণ্ড আবর্তে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা আরও বেড়ে গিয়েছিল ব'লে অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

মনে হয় এই বিশৃঙ্খলার ফলে নেপালের ইতিহাসের গতিও পরিবর্তিত হয়। নেপাল সম্বৎ ৫০৩ অর্থাৎ ১৩৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটবংশীয় জয়স্থিতি-রাজমল্ল নেপালের সিংহাসনে আরোহন করেন বলে বিভিন্ন বংশাবলীতে উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর রাজত্বকালের তারিখ সম্বলিত অনেক লেখমালা আর পুঁথিও বিদ্যমান আছে। জয়স্থিতি পূর্ববর্তী রাজবংশের এক কন্যাকে (রাজল্লদেবী) বিবাহ করে নেপালে আপন প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছিলেন বলে জানা যায়। জয়রাজদেব ও জয়ার্জ্জুনদেবের রাজত্বকালে এই প্রতিপত্তি সমধিক বর্দ্ধিত হয়েছিল সন্দেহ নাই। মনে হয়, এই আমলে নেপালে বিশৃঙ্খলার সুযোগে জয়স্থিতিরাজমল্ল রাজক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। স্বয়ম্ভূনাথের শিলাপিতে নেপাল সম্বৎ ৪৯২।১৩৭২ খ্রীষ্টাব্দে জয়ার্জ্জুনদেব ও জয়স্থিতিরাজমল্ল দুজনেরই উল্লেখ আছে রাজা হিসাবে।

শ্রীজয়ার্জ্জুনদেবেন সূনুনা তস্য ভূভৃতঃ।
সম্পাল্যমানে নেপালে বীরনারায়ণেনতু॥
শ্রীজয়স্থিতিমল্লেন ক্ষত্রিরত্নাকরেন্দুনা।
পালিতে তত্র কালেন............ ॥

অমাত্য রাজ হর্ষ স্বয়ম্ভূনাথের সংস্কার করেন এই দুই রাজার নির্দেশে, তারও উল্লেখ আছে এই শিলালিপিতে—

আদায়াজ্ঞাং দ্বয়ো রাজ্ঞো ইন্দ্রোপেন্দ্রসমানয়োঃ।

নেপাল সম্বৎ ৪৯২।১৩৭২ খ্রীষ্টাব্দে নেপালে দুই রাজার অস্তিত্ব পূর্ববর্ত্তী কালের দ্বৈরাজ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জয়ার্জ্জুনদেবকে 'ইন্দ্র' আর জয়স্থিতিকে 'উপেন্দ্র' অর্থাৎ বিষ্ণুর সঙ্গে তুলনা ক'রে লিপিখানির

রচয়িতা দুইজনের ক্ষমতা ও অধিকার কৌশলে ব্যক্ত করেছেন বলে মনে হয়। পুরাণ মতে বিষ্ণু ইন্দ্রের কনিষ্ঠ। কিন্তু বিপৎকালে বিষ্ণুই ইন্দ্রের বল ও সহায়। জয়স্থিতি নেপালের রাজবংশসম্ভূত ছিলেন না; এ কারণে তাঁর আসন জয়ার্জ্জুনদেবের সমান হয়তো নয়। কিন্তু জয়স্থিতিই যে রাজ্যের রক্ষক ও প্রধান ক্ষমতার অধিকারী এ অনুমান নিরর্থক নয়। 'বীরনারায়ণ', 'ক্ষত্রিরত্নাকরেন্দু' প্রভৃতি বিশেষণে লিপিরচয়িতা জয়স্থিতির শৌর্য ও বীরত্বের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। এই শৌর্য ও বীরত্বগুণেই নেপালের রাজক্ষমতা তিনি করায়ত্ব করেছিলেন, অন্ততঃ নেপাল সম্বৎ ৪৯২।১৩৭২ খ্রীষ্টাব্দেই, এই ইঙ্গিত এই শিলালিপিতে সুস্পষ্ট। জয়ার্জ্জুন-দেবের মৃত্যুর পর পুরাতন রাজবংশকে অপসারিত ক'রে জয়স্থিতিরাজমল্ল নেপালের সিংহাসনে একক প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

বালাণ্ডা (বালহণ্ডা)?

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

একদা অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ প্রদান উপলক্ষ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়[১] বলিয়াছিলেন যে, "বালাণ্ডা পরগণায়……একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল, অনেক ভিক্ষু ছিল, পুথি কাপি হইত, ঠাকুর দেবতার পূজা হইত। বালণ্ডার একখানি 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা' এখনও নেপাল-দরবার-লাইব্রেরীতে আছে, বালাণ্ডার বৌদ্ধকীর্ত্তির এই মাত্র স্মৃতি জাগরূক আছে।" শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত কর্তৃক রচিত 'বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম' নামক পুস্তকটি পাঠ করিলে মনে হয় যে তিনিও এই ধারণা পোষণ করেন।[২] শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এই মত প্রচারের পথে আরও একধাপ অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি যে কেবল বালাণ্ডায় লিখিত একটি 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা'র পুঁথিতে বালাণ্ডা-বিহারের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে করেন তাহাই নহে, উক্ত পুঁথিটি প্রজ্ঞা-পারমিতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এমনকি তিনি কলিকাতা হইতে বার মাইল পূর্বে ভাঙ্গোরে প্রাপ্ত মঞ্জুশ্রীর একটি মূর্তিকে (ইহার বিভিন্ন অংশ ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে) বালাণ্ডা মহাবিহারের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা মঞ্জুশ্রীর মূর্তি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।[৩]

উপরোক্ত তিনজন পণ্ডিত ব্যক্তির রচনা পাঠ করিলে পাঠকের এইরূপ ধারণা হইবে যে নেপাল দরবার লাইব্রেরীতে (অধুনা বীর লাইব্রেরী) রক্ষিত একটি 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা'র পুঁথিতে বালাণ্ডা মহাবিহারের নাম লিখিত আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত পাঠাগারে রক্ষিত কোন পুঁথিতেই এই বিহারের উল্লেখ নাই। কেবলমাত্র একটি পুঁথিতে 'বালহণ্ডা' নামক একটি স্থানের উল্লেখ আছে। 'সর্বজ্ঞানোত্তরতন্ত্র' নামক একটি পুস্তকের একটি পুঁথি এই পাঠাগারে আছে। পুঁথিটি চত্বারিংশ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট।[৪] প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি সপ্তত্রিংশ পৃষ্ঠাতেই সমাপ্ত। অপর তিনটি

পৃষ্ঠার একটিতে স্বপ্ন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে ; এবং আর একটী পৃষ্ঠায় তান্ত্রিক পূজাবিধি আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় পৃষ্ঠাটিতে কুটিল অক্ষরে নিম্নলিখিত ছত্রগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

... ... শিবে পুরে ॥
দারুজানামিদং পুণ্যং মৃন্ময়ানাং ততোধিকম্।
দ্বিগুণং পৈত্তলানান্তু তারজানাং ততোধিকম্ ॥
দ্বিগুণং হেমজানান্তু রত্নজানাং ততোধিকম্।
এবং রত্নবিশেষেণ পুণ্যং স্যাৎ দ্বিগুণোত্তরম্ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রতিষ্ঠাপ্যো মহেশ্বরঃ।

পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ্-বিগ্রহপালদেবস্য বর্দ্ধমান-বিজয়রাজ্যে সম্বৎ ৭ ভাদ্রদিনে॥ বালহণ্ডাতঃ পণ্ডিতাচার্য্যশ্রীজ্ঞানগণেন লিখিতং কায়স্থ-রুদ্রদত্তেন লিখিতমিতি।

শিবধর্ম।
বৃষসারসংগ্রহ।
শিবধর্মোত্তর।
উমামহেশ্বরসংবাদ।
সাংখ্যতত্বকৌমুদী (৩৩ কারিকা)
শ্রীদত্তপদ্ধতি (মৈথিলীতে লিখিত)
উপযোগক্রম ঃ—।
সম্বৎ ৪৭১ শ্রাবণ কৃষ্ণএকাদশ্যাং বৃহস্পতিদিনে॥

নেপালের পাঠাগারে রক্ষিত পুঁথিগুলির মধ্যে কেবলমাত্র উপরিলিখিত স্থলেই 'বালহণ্ডা'র (নামটী বালাণ্ডা নহে) উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এই স্থলে বালহণ্ডা (বালণ্ডা) একটী স্থানের নাম মাত্র ; উক্ত নামবিশিষ্ট কোনও মহাবিহারের অস্তিত্ব ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় না। উপরন্তু যে পত্রে এই স্থানের নাম লিখিত আছে তাহা শিবধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থের শেষ পত্র বলিয়া মনে হয়। পুষ্পিকার শেষে শিবধর্মের বিভিন্ন খণ্ডের নাম ('শিবধর্ম', 'বৃষসারসংগ্রহ', 'শিবধর্মোত্তর' ও 'উমামহেশ্বর-'সংবাদ') পাওয়ায় এই অনুমান সমর্থিত হয়। পাতা খানির অবশিষ্ট অংশে পরবর্তী যুগে অন্যান্য

গ্রন্থের নাম সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা করা চলে। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নিঃসন্দেহে বলা চলে 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা'র কোনও পুঁথির সহিত বালহণ্ডার (বালণ্ডা) বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই। সুতরাং শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ প্রজ্ঞাপারমিতার প্রতি উৎসর্গীকৃত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র পুঁথিতে বালাণ্ডা (বালহণ্ডা) মহাবিহারের উল্লেখ আছে বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভিত্তিহীন। ভাঙ্গোরে প্রাপ্ত মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি সম্পর্কে ঘোষ মহাশয়ের উক্তিও সঠিক বলিয়া মনে হয় না। বালাণ্ডা মহাবিহারের অস্তিত্বই যখন সন্দেহজনক, তখন ভাঙ্গোরে প্রাপ্ত মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তিকে কি প্রকারে ঐ মহাবিহারের অধিষ্ঠাতৃ দেবের মূর্ত্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে?

বর্ত্তমান প্রবন্ধে 'সর্বজ্ঞানোত্তরতন্ত্রে'র পুঁথির সম্পর্কে যে সংবাদ পরিবেশিত হইল, তাহা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক রচিত নেপাল দরবার গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথিসমূহের তালিকা হইতে সংগৃহীত। এই তালিকায় বালাণ্ডা মহাবিহারে লিখিত 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা'র কোন পুঁথিরই উল্লেখ পাওয়া যায়না। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং কি প্রকারে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে প্রদত্ত অভিভাষণে উপরিউক্ত ভ্রান্ত তথ্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। বোধ হয় সভাপতির অভিভাষণ প্রস্তুত করিবার সময় তিনি প্রকৃত পুঁথির সাহায্য না লইয়া কেবলমাত্র স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, এবং আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সঠিক বার্ত্তা স্মরণ না থাকায় এইরূপ ভুল করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকগণ এই বিষয়ে লিখিবার পূর্ব্বে আসল উপাদান পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। তাঁহারা উহা করিলে শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক প্রচারিত প্রমাদের কথা পূর্ব্বেই জনসাধারণ জানিতে পারিত।

শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের পুঁথিতে উক্ত বালণ্ডার (বালহণ্ডার) স্থান বালাণ্ডা পরগণায় নির্দিষ্ট করিয়াছেন।* শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ বালাণ্ডা পরগণার অন্তর্গত খাস বালাণ্ডার নিকটবর্ত্তী ধারা নামক স্থানে বালাণ্ডা (বালহণ্ডা) মহাবিহার অবস্থিত ছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।' ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন যে ধারাতে গুপ্ত যুগের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে এবং খাস বালাণ্ডাতে পাল আমলের নিদর্শন সমূহ দেখিতে পাওয়া

যায়।[৮] এই সংবাদ যদি সত্য হয় তবে কেবলমাত্র ইহাই বলা যায় যে খাস ধারা ও বালাণ্ডাতে প্রাচীন ও মধ্যযুগে জনবসতি ছিল। হয়ত বা ঐ সকল স্থানে ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহও ছিল। কিন্তু বালাণ্ডা (বালহণ্ডা) মহাবিহারের অস্তিত্ব ইহার দ্বারা কিরূপে প্রমাণিত হয়?

উপরের আলোচনা হইতে ইহাই জানা যাইতেছে যে নেপাল দরবার গ্রন্থাগারে রক্ষিত কোনও পুঁথিতে বালহণ্ডা (বালাণ্ডা) মহাবিহারের উল্লেখ নাই। আমাদের জানিত অন্য কোনও উপাদানের সাহায্যেও এই মহাবিহারের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সঠিকভাবে স্থির করা যায় না।

পাদ-টীকা

১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২১, পৃঃ ২৭২।

২। বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম, পৃঃ ২১৭

৩। Archaeological Discoveries in Lower Gangetic Valley, *Science and Culture*, December, 1957, pp. 284-289 (particularly pp. 10-11 of the reprint).

৪। *A Catalogue of Palmleaf and Selected Paper Mss. belonging to the Durbar Library, Nepal*, Vol. I, pp. 85-86.

৫। *Ibid*, Vol II, p. 249

৬। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২১, পৃঃ ২৭২

৭। Archaeological Discoveries in Lower Gangetic Valley, *Science and Culture,* December 1957 pp. 284-289 (particularly p. 10 of the reprint).

৮। *Ibid*, p. 284-289 (particularly p. 10 of the reprint).

দশরথদেবের নূতন তাম্রশাসন

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

পূর্ব্ব বাংলার দেববংশীয় রাজগণের বিস্তৃত ইতিহাস জানা যায় নাই। ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে এইবংশের অরিবাজচানূরমাধব উপাধিধারী দামোদর নামক জনৈক নরপতির তিনখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। শাসনগুলি ১১৫৬, ১১৫৮ এবং ১১৬৫ শকাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল। এগুলি হইতে জানা যায় যে, রাজা দামোদরদেব ১১৫৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন এবং অন্ততঃ ১১৬৫ শকাব্দ (১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি পুরুষোত্তমের প্রপৌত্র, মধুমথনের পৌত্র এবং বাসুদেবের পুত্র ছিলেন। দামোদরের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্ভবতঃ ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র জনপদের শাসক ছিলেন।

ঢাকা জেলার আদাবাড়ী গ্রামে দেববংশীয় অপর একজন নরপতির একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই রাজার নাম পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ অরিরাজদনুজমাধব দশরথদেব। অত্যন্ত জীর্ণ বলিয়া আদাবাড়ী শাসনের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। কিন্তু শাসনখানি বিক্রমপুর হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহাতে সেনবংশীয় বিশ্বরূপসেনের লিপিমালার রচনার ছাপ সুস্পষ্ট। অধিকন্তু এই শাসনে বলা হইয়াছে যে রাজা দশরথ ভগবান নারায়ণের অনুগ্রহে গৌড়রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং সেনরাজগণের পরে যে তাঁহাদের রাজধানী বিক্রমপুরে দেববংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান ইতিহাসে বিক্রমপুরের অরিরাজ দনুজমাধব দশরথদেব সোণারগাঁয়ের রাজা দনুজরায় নামে অভিহিত হইয়াছেন। ১২৮১ খ্রীস্টাব্দে দনুজরায় অর্থাৎ অরিরাজদনুজমাধব দশরথদেব বাংলার বিদ্রোহী মুসলমান নায়ক তুঘ্রিল খাঁর বিরুদ্ধে দিল্লীর দাসবংশীয় সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন বল্‌বনের সহিত সখ্যবদ্ধ হইয়াছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত History of Bengal সংজ্ঞক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন যে, দামোদর ও দশরথ একই দেববংশের রাজা এবং দশরথ দামোদরের অব্যবহিত পরে কিংবা কিছুকাল পরে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থের কিয়ৎকাল পরে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত মজুমদারের 'বাংলা দেশের ইতিহাসে' বলা হইয়াছে, দামোদর এবং দশরথের বংশ যে "অভিন্ন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।" সম্প্রতি আবিষ্কৃত দশরথদেবের একখানি নূতন তাম্রশাসন হইতে স্পষ্ট জানা গিয়াছে যে, দশরথ দামোদরের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ছিলেন।

ত্রিপুরা জেলার পাকামোড়া নামক গ্রামে এই তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হয়। প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে পূর্বপাকিস্থান পুরাতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত আহমদ হাসান দানী সাহেব লিপিখানির সংবাদ পাইয়া উহা হস্তগত করিতে সমর্থ হন। কিছুকাল হইল, দানীসাহেবের অনুগ্রহে আমি তাম্রশাসনটি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সম্প্রতি তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, আমাদের উভয়ের সম্পাদনায় লিপিখানি প্রকাশ করা যাইতে পারে। কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আমি তাম্র-শাসনটির প্রতি যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতে পারি নাই। অধিকন্তু জীর্ণতা এবং ভ্রমবাহুল্যের জন্য পাকামোড়া শাসনের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ। তাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিটির কতিপয় মূল্যবান অংশের প্রতি পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল।

পাকামোড়া শাসনের রচনায় পদ্যাংশ অধিক। কেবলমাত্র শেষাংশে প্রদত্ত ভূমিখণ্ডসমূহের বর্ণনায় গদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে ; লিপির অপর সমুদয় অংশ পদ্যে লিখিত। প্রথম শ্লোকে ভগবান্ কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া মঙ্গলাচরণ। দ্বিতীয় শ্লোকে দেবরাজবংশের মূলপুরুষ চন্দ্রদেবতার এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে চন্দ্রবংশীয় রাজগণের উল্লেখ দেখা যায়। চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকে এই রাজবংশের শত্রুবিজয়ী নরপতি বাসুদেব এবং তৎপুত্র দামোদরের কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

দামোদরের বর্ণনায় বলা হইয়াছে—

খ্যাতো গৌড়মহীমহোৎসবময়ং চক্রে পুনশ্চ শ্রিয়া ॥

অর্থাৎ—রাজা দামোদর দেশের নষ্টশ্রী পুনরুদ্ধার করিয়া গৌড় দেশের

মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন। দামোদরের নিজের কোন লিপিতে এইরূপ দাবী দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই কৃতিত্ব তাঁহার রাজত্বের শেষ দিকের ঘটনা হইতে পারে। এই দাবি হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, দামোদর শেষ জীবনে গৌড়েশ্বর উপাধিধারী সেনরাজগণের রাজ্য হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু দেববংশের লিপিমালায় সেনবংশীয় গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিবার দাবি দেখিতে পাওয়া যায় না। বলা যাইতে পারে দামোদর ও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা সেনরাজগণের সামন্ত ছিলেন এবং ঘটনাচক্রে সেনরাজ্যে দমোদরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু দামোদরের তাম্রশাসনগুলিতে দেখা যায় যে, তিনি স্বাধীন রাজার ন্যায় শাসন দান করিলেও সম্রাটের উপযুক্ত 'পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ' উপাধিতে ভূষিত হন নাই। সে হিসাবে দশরথের পাকামোড়া শাসনটি তদীয় পিতার শাসনাবলীর অনুরূপ, তাঁহার নিজের আদাবাড়ী শাসনের মত নহে। ইহা হইতে মনে হয় যে, দশরথই রাজ্যারম্ভের কিছুকাল পরে সেনরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া সম্রাটের উপযুক্ত উপাধি ধারণ করিয়া ছিলেন। আদাবাড়ী তাম্রশাসনে তৎকর্ত্তৃক নারারণের প্রসাদে গৌড়রাজ্য লাভের উল্লেখ হইতে এই ধারণা সমর্থিত হয়।

শাসনের পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে দামোদরের পুত্র রাজা দশরথদেবের কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টম শ্লোকে তাঁহার উপাধি দেখা যয় 'অরিরাজদনুজ-মাধব'।—

> অরিরাজ দনুজমাধবশ্রীদশরথদেবঃ শ্রিয়া শ্রিতঃ।
> সততং যশঃ প্রকুরুতে কুরুতেনাজৌ দ্বিষন্মখোত্থেন॥

রাজা দশরথের বর্ণনায় শাসনের সপ্তম শ্লোকে একটি মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্লোকটি এই—

> পূর্ব্ব্যং কুলমচেতনস্য নৃপতের্দোষাৎ পরৈরর্থিতৈ-
> রাক্রান্তং বিকলাস্তদৈব সকলা লোকা ভয়াদাকুলাঃ।
> শ্রীমানস্য মহীপতির্দশরথো দেবো হ্যদেবোপমো
> যৎপাদপ্রণবতাস্তয়প্রমুদিতা ধর্ম্মার্থকামোদিতাঃ॥

অর্থাৎ—অচেতন নৃপতির দোষে নিমন্ত্রিত শত্রুগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বকুল (অথবা পূর্ব্বকালে রাজ্যের নদীতীরবর্ত্তী ভূভাগ) আক্রান্ত হওয়ায় সমস্ত প্রজা বিকল এবং ভয়াকুল হইয়াছিল; পরে শ্রীমান্ রাজা দশরথদেব স্বর্গদেবতার ন্যায়

শোভা পাইলেন এবং প্রজাগণ তাঁহার চরণে প্রণত, শাসন-সংরক্ষণে আনন্দিত এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে সমৃদ্ধ হইল। শ্লোকটির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝা কঠিন। কোন্ অচেতন নৃপতির রাজ্যের কূল শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। অনুমান করা যাইতে পারে, ইনি সেন-বংশের শেষ নরপতি এবং তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে তদীয় রাজ্যের অর্থাৎ পূর্ব্ব বাংলার পূর্ব্বাঞ্চল মুসলমান শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। দামোদর এবং দশরথ শত্রুগণকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধহয় প্রজাগণ তাঁহাদের অনুরক্ত হইয়াছিল এবং এই সূত্রেই পরিণামে সেনরাজ্য দেববংশের করতলগত হইয়াছিল। তবে নূতন প্রমাণাদি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নহে।

দশরথদেবের বর্ণনার শেষ শ্লোকে তাঁহাকে কন্দর্পদেবীর পতিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।—

শ্রীমানস্তু সুখী নৃপো দশরথঃ কন্দর্পদেবীপতিঃ॥

ইহার কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে পাকামোড়া তাম্রশাসনটি রাজা দশরথদেবের মহিষী কন্দর্পদেবী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী শ্লোকটিতে এই কথা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।—

যাসৌ কন্দর্পদেবীতি খ্যাতা তস্য মহীভুজঃ।
প্রিয়া শ্রীমন্মহাদেবী তদ্দত্তং শাসনং শিবম্॥

পাকামোড়া তাম্রশাসনের গ্রহীতা জনৈক ব্রাহ্মণ। তাঁহার নামের প্রথম অক্ষর অস্পষ্ট। বোধহয় নামটি রমাপতি শর্ম্মা। তিনি পরাশর গোত্রীয় এবং সামবেদের কৌথুমশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ব্রাহ্মণকে যে ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল, উহা অনেকগুলি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। ঐ ভূখণ্ডসমূহ অসল্লা বিষয়ের অন্তর্গত কামতা গ্রামে অবস্থিত ছিল। কামতা গ্রাম বর্ত্তমান কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী বড়কান্তা বা বড় কামতা হইতে পারে। তাহা হইলে ঐ গ্রামের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী অঞ্চলের নাম ছিল অসল্লা বিষয়।

উপরে পাকামোড়া শাসনের পঞ্চম ও সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যা সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে ঐতিহাসিক সমাজ মতামত ব্যক্ত করিলে আমরা উপকৃত বোধ করিব।

অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার স্মরণে

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় গত ১৯শে জানুয়ারী তারিখে তাঁহার শ্রীমোহন লেনস্থ বাসভবনে চুরাশী বৎসর বয়সে স্বর্গলাভ করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যে সকল মহাপ্রাণ দেশ-প্রেমিক তাঁহাদের জ্ঞান, সাধনা ও কর্মানুশীলনের দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন চাকলাদার মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার মহাপ্রয়াণে বিগতযুগের এক আদর্শনিষ্ঠ ত্যাগী সুপণ্ডিত অমায়িক জ্ঞানতপস্বী কর্মবীরের তিরোভাব ঘটিল।

হারাণচন্দ্র ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জিলার দক্ষিণপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে তাঁহার বাল্য ও কৈশোর কাল অতিবাহিত হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত শিক্ষালাভ করেন, একং ১৮৯৬ সালে বি, এ এবং পর বৎসর এম্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার প্রথম যৌবনে তিনি দুইজন মহা-পুরুষের সংস্পর্শে আসেন,—একজন সাধক সদ্‌গুরু মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যজন ত্যাগী কর্মবীর যুগপ্রবর্তক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইঁহাদের প্রভাব তাঁহার জীবন ও কর্মে প্রভূত কার্যকরী হইয়াছিল। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের তিনি মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ইঁহার আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হইয়াছিল। আর মহাপ্রাণ সতীশচন্দ্রের দেশোন্নতি-মূলক সুপরিকল্পিত কর্মপ্রচেষ্টাসমূহের প্রারম্ভকাল হইতেই চাকলাদার মহাশয় তাঁহার সহিত মিলিত হন। সতীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'ভাগবত চতুষ্পাঠী'র ও তৎপ্রবর্তিত Dawn পত্রিকার মাধ্যমে যে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সম্যক অনুশীলনের সূত্রপাত হয়, উহাতে প্রথম হইতেই তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। Dawn পত্রিকার প্রকাশকালের প্রথম বৎসর (১৮৯৭) হইতেই তাঁহার বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশ পাইতে থাকে ও ঐগুলি পণ্ডিতসমাজে আদৃত হয়। তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা-

সমূহ তথ্যসমৃদ্ধ ও সুলিখিত ছিল এবং এগুলি তাঁহার উন্নত চিন্তাধারার ও বিশ্লেষণীশক্তির পরিচায়ক ছিল।

হারাণবাবুর কর্মজীবন বৈচিত্র্যময় ছিল। প্রথম জীবনে তিনি কিছুদিন আদর্শ গৃহশিক্ষকের কাজ করেন এবং প্রায় ঐ সময়েই জেনারাল পোষ্ট অফিসে একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হইলে তিনি সরকারী কাজ ছাড়িয়া বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজে অধ্যাপনা সুরু করেন। অল্প কয় বৎসর পরে তিনি এই প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া শিবপুর এইচ. সি. ই. স্কুলে (এখনকার দীনবন্ধু হাই স্কুল) বৎসর দুয়েক প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। তারপর তিনি রিপন কলেজে (কলিকাতা—বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) এবং বিহার ন্যাশানাল কলেজে (পাটনা) কয়েক বৎসর অধ্যাপনা করিয়া ১৯১৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনীষী আশুতোষ প্রবর্তিত স্নাতকোত্তর বিভাগে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। বহুদিন যাবৎ কৃতিত্বের সহিত এই বিভাগে অধ্যাপনা করিবার পর তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে কয়েক বৎসর অধ্যাপনা করেন এবং শেষোক্ত বিভাগের অন্যতম অধ্যাপকরূপেই তিনি ১৯৩৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও বহুদিন যাবৎ তাঁহার জ্ঞানানুসন্ধিৎসা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তিনি সংসারের নানা অভাব ও অনটনের মধ্যেও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ভারততত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে অমূল্য গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করিয়াছিলেন ঐগুলির সদ্ব্যবহারে অবসর যাপন করিতেন।

চাকলাদার মহাশয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে যোগদান করি। তিনি আমা অপেক্ষা বয়সে ও জ্ঞানে অনেক বড়ো ছিলেন, এবং প্রথম হইতেই তিনি আমাকে কনিষ্ঠ সহোদরাধিক স্নেহ করিতেন। আমি তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবেই মিশিয়াছিলাম, এবং আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে এরূপ সহৃদয় আদর্শনিষ্ঠ নিরভিমান ত্যাগী সুপণ্ডিত আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে খুব কমই দেখিয়াছি। Dawn পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার তথ্যবহুল সুলিখিত রচনারাজির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এগুলির মধ্যে কয়েকটি পরবর্তীকালের গবেষকদিগের মার্গপ্রদর্শক হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকাকালেও তাঁহার বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থরাজি প্রকাশিত

হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে কয়েকটীর নামোল্লেখ প্রয়োজন মনে করি : Studies in the Kamasutra of Vatsyayana (Cal. 1925); Social Life in Ancient India (Further Studies in the Kamasatra of Vatsyayana, Cal. 1929 ; Aryan Occupation of Eastern India in Early Vedic Times (Cal. 1925—printed in part); 'Social life in Ancient India' (A big article printed in the Cultural Heritage of India, Vol. III, 1937) ; 'Problems of the Racial Composition of the Indian Peoples' (Address delivered by him as President of the Anthropology Section of the Indore Session of the Indian Science Congress in 1936) ; 'The Pre-historic Culture of India' (several issues of The Man in India) ; etc.

হারাণচন্দ্র বহু ভাষাবিদ হওয়ায় তাঁহার গবেষণার পথ সুগম ছিল। তিনি বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, পালি এবং গুরুমুখী ব্যতীত জার্মান ও ইতালীয়ান ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। জার্মান মনীষী Oldenbergএর "Caste System of India" মূল জার্মান হইতে অনুবাদ করিয়া Indian Antiquaryতে প্রকাশিত করেন। ইতালীয়ান নৃতত্ত্ববিদ V. Giuffrida Ruggeri র Asian Anthropology বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ তৎকর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া Journal of the Department of Letters (Vol. V) এ প্রকাশিত হয়।

চাকলাদার মহাশয়ের তিরোধানে বিদ্বজ্জন সমাজের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়।

কুটনীতিবিদ রাজপুত নারী ঃ কর্মদেবী

নিমাই সাধন বসু

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা অমিতশক্তিশালী বাবরের বিরুদ্ধে রাজপুত তথা সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার শেষ চেষ্টা করেছিলেন মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ। ১৫২৭ সালে খানুয়ার প্রান্তরে মুঘল শক্তি ও সম্মিলিত হিন্দু রাজ্যগুলির মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল তার গুরুত্ব পানিপথের প্রথম যুদ্ধের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এই যুদ্ধে পরাজিত হবার অল্পকালের মধ্যেই রাণা সংগ্রাম বা সঙ্গা মারা যান। রাণা সংগ্রামের মৃত্যুর পর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল তাঁর উত্তরাধিকারিরা মেবারের খ্যাতি, শৌর্য্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে কিনা।

রাণা সংগ্রামের সাত পুত্র এবং চারকন্যা। সাতপুত্র যথাক্রমে—ভোজরাজ, কর্ণসিংহ, রত্নসিংহ, বিক্রমাদিত্য, উদয়সিংহ, পর্বতসিংহ ও কৃষ্ণসিংহ। রাণা সংগ্রামের জীবিতাবস্থায় তাঁর চার পুত্র ভোজরাজ, কর্ণসিংহ, পর্বতসিংহ ও কৃষ্ণসিংহের মৃত্যু হয়।[১] প্রথম দুই পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় মেবারের সিংহাসন লাভ করেন রত্নসিংহ।

রাণা সংগ্রামের বহু পত্নী ছিলেন; কিন্তু তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হলেন কর্মবতী। কর্মবতী বুন্দির হাড়াবংশীয় রাজা নর্বদের কন্যা ও রাওভানের পৌত্রী।[২] বিক্রমাদিত্য ও উদয়সিংহের মাতা ছিলেন কর্মবতী।

কর্মবতী ছিলেন অসামান্যা বুদ্ধিমতী, কূটনীতিবিদ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্না নারী। তিনি বুঝেছিলেন জীবিত জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে রত্নসিংহ রাণা সংগ্রামের সিংহাসন ও সমগ্র মেবার রাজ্য লাভ করবে। কিন্তু তাঁর নিজের দুই পুত্র বিক্রমাদিত্য ও উদয়সিংহ রাজকুমার হয়েও রাজ্যের কোন অংশই পাবে না। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাণা রত্নের মুখাপেক্ষী ও কৃপাপ্রার্থী হয়ে তাদের সারা জীবন কাটাতে হবে। রাণী কর্মবতীর পক্ষে এ চিন্তা ছিল অসহ্য। কর্মবতী এও উপলব্ধি করেছিলেন যে রাণা সংগ্রামের জীবিতকালে প্রধানা মহিষী না হয়েও তিনি যে ক্ষমতা ও প্রাধান্য ভোগ করছেন সতীন-পুত্র রত্নের রাজত্বকালে তাঁর সেই প্রাধান্য ও ক্ষমতাও থাকবে না। কাজেই সংগ্রামের জীবিতাবস্থায় তিনি এর প্রতিকারে সচেষ্ট হলেন।

একদিন রাত্রে কর্মবতী রাণাকে বললেন, "মহারাণা রত্নসিংহ হবে মেবারের রাণা। কিন্তু বিক্রমাদিত্য ও উদয়সিংহও আপনার পুত্র। তারা নাবালক।" রাণীর কথায় প্রখর বুদ্ধিমান সংগ্রামের বুঝতে দেরী হ'লনা যে কর্মবতীর কোন নিবেদন

আছে। সংগ্রাম বললেন, "তোমার কি প্রার্থনা আছে বল।" কর্মবতী বললেন, "আমার দুই পুত্র বিক্রমাদিত্য ও উদয়সিংহের জন্য মহারাণা কোন বন্দোবস্ত করুন এই প্রার্থনা করি।" সংগ্রাম বললেন, "তুমি কি চাও নিঃসঙ্কোচে বল।" কর্মবতী বললেন, "মহারাণা, আপনি রত্নসিংহের সঙ্গে পরামর্শ করে আমার দুই নাবালক পুত্রকে রণথম্ভর দান করুন এবং এদের শিক্ষক ও অভিভাবকরূপে আমার ভ্রাতা হাড়া সুরজমলকে নিযুক্ত করুন এই আমার প্রার্থনা।" রাণা সংগ্রাম প্রিয়তমা মহিষী কর্মবতীর এই প্রার্থনা তখনি মঞ্জুর করবেন বলে স্থির করলেন।

পরের দিন সকালে রাণা সংগ্রাম রত্নসিংহকেডেকে বললেন, "শোন রত্ন, বিক্রমাদিত্য ও উদয়সিংহ তোমার ছোট ভাই। এদের জন্যও কোন একটা ব্যবস্থা করা উচিত বলে আমার মনে হয়।" পিতার কথায় রত্নসিংহ অনুমান করলেন যে বিমাতা কর্মবতী বিক্রম ও উদয়ের জন্য মহারাণার কাছে কোন আর্জি পেশ করেছেন। রত্নসিংহ অন্তরে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুণ্ণ হলেও অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতার সামনে তা প্রকাশ করতে সাহসী হলেন না। তিনি বললেন, "আপনি বিচার করে যে জায়গা উচিত মনে করবেন, সেই জায়গা দেবেন।" সংগ্রাম বললেন, "আমি রণথম্ভর দেব বলে স্থির করেছি।" ক্ষুব্ধ রত্নসিংহের পক্ষে এই কথায় সম্মত হওয়া ছাড়া কোন উপায় রইল না। তখন রাণা সংগ্রাম বিক্রমাদিত্য ও উদয়সিংহকে ডেকে পাঠিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের রণথম্ভর দান করলেন।

ঘটনাচক্রে কর্মবতীর ভ্রাতা, বিক্রম ও উদয়ের মাতুল হাড়া সুরজমলও এই সময় রাজপ্রাসাদে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজসভায় উপস্থিত হলে রাণা সংগ্রাম বললেন, "আমি বিক্রমাদিত্য ও উদয়সিংহকে রণথম্ভর দান করে আমার এই দুই নাবালক পুত্রের সকল দায়িত্ব আজ থেকে তোমায় অর্পণ করলাম।" সুরজমল বললেন, "আমি চিতোরের মহারাণার ভৃত্য মাত্র।" তখন সংগ্রাম সানন্দে বললেন, "তোমার এই দুই ভাগিনেয়ই নাবালক। বুন্দি রণথম্ভরের কাছেই এবং বুন্দির রাজপুতরা উচ্চবংশীয় রাজপুত। আজ তোমার হাতে এদের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।" সুরজমল বললেন, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য। কিন্তু, মহারাণা, আমি এই ভেবে শঙ্কিত হচ্ছি যে আপনার অবর্তমানে রত্নসিংহ আমার জীবননাশের চেষ্টা করবে।" রাণা সংগ্রাম সচকিত হয়ে রত্নের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্রই রত্নসিংহ সুরজমলকে বললেন, "বিক্রম ও উদয় আমার ভাই ও আপনি আমার বন্ধু হবেন। আমি কোনদিনই আপনার শত্রুতা করব না।" তখন সুরজমল রাণা সংগ্রামের অনুরোধ পালনে স্বীকৃত হলেন ও বিক্রমাদিত্য ও উদয় সিংহকে সঙ্গে নিয়ে রণথম্ভর যাত্রা করলেন।[৩]

বিক্রমাদিত্য ও উদয়সিংহের রণথম্ভর লাভ কর্মবতীর কূটনীতির প্রথম সাফল্য। মেবার রাজ্যের শক্তির প্রধান উৎস ছিল চিতোর ও রণথম্ভরের দুর্গ। নিজের দুই

পুত্রের জন্য রণথম্ভর লাভ করে কর্মবতী কার্য্যতঃ মেবারকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন।[৫] এর ফলে কর্মবতীর ইচ্ছা পূর্ণ ও স্বার্থসিদ্ধি হলেও মেবারের স্বার্থ বা ভবিষ্যতের পক্ষে তা মঙ্গলজনক হয়নি। রাণা সংগ্রামের কাছে তিনি যে ভাবে নিজের পুত্রদের স্বার্থের কথা নিবেদন করেছিলেন তা থেকে কর্মবতীর কূটবুদ্ধি সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ঠিক এই সময়েই মেবার প্রাসাদে সুরজমলের উপস্থিতি বোধ হয় আকস্মিক নয়। সুরজমলের সঙ্গে সংগ্রামের যে কথোপকথন হয় তা থেকেও মনে হয় যে কর্মবতী পূর্বাহ্ণেই তাঁর ভ্রাতাকে এ বিষয়ে জানিয়ে রেখেছিলেন।

১৫২৮ সালে সংগ্রামের মৃত্যুর পর রত্নসিংহ মেবারের রাণা হলেন। সিংহাসন লাভের পরই রত্নসিংহের প্রথম চিন্তা হল বিক্রমাদিত্য ও উদয়সিংহের হাত থেকে রণথম্ভর উদ্ধার করা। রত্নসিংহ বুঝেছিলেন যে চিতোর ও রণথম্ভর যদি না তাঁর অধিকারে থাকে তাহলে তাঁর পক্ষে নির্বিঘ্নে ও অপ্রতিহত ক্ষমতায় রাজ্যশাসন করা সম্ভব নয়। রণথম্ভর ফিরে পাবার জন্য রত্নসিংহ বিক্রম ও উদয়ের অভিভাবক সুরজমল ও কর্মবতীর সঙ্গে আলোচনা ও সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। রত্নসিংহ তাঁর দূত পূরণমলকে রণথম্ভরে পাঠালেন রণথম্ভর ফিরিয়ে দেবার দাবী জানিয়ে। এ ছাড়া তিনি আরও দুটি বহু মূল্যবান সামগ্রী বিক্রমাদিত্যের কাছ থেকে দাবী করলেন—একটি সোনার কোমর-পেটি ও আর একটি রত্ন খচিত জরির রাজমুকুট। এই দুটি বহুমূল্য সামগ্রী রাণা সংগ্রাম গুজরাটের সুলতান মামুদকে পরাজিত করে লাভ করেছিলেন। সহজেই অনুমান করা যায় যে যুদ্ধে এই মূল্যবান সামগ্রী দুটি লাভ করার পর রাণা সংগ্রাম এগুলি তাঁর প্রিয়তমা রাণী কর্মবতীকে উপহার দিয়েছিলেন। মেবারের অতীত গৌরবের মূল্যবান স্মৃতিচিহ্নরূপে রত্ন সিংহ ঐ জিনিস দুটি পাওয়ার জন্য ব্যগ্র ছিলেন।

রত্নসিংহের প্রস্তাব শুনে কর্মবতী কৌশলে এই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাইলেন। তিনি বললেন, "স্বর্গীয় মহারাণা দুই নাবালক পুত্রের অভিভাবকরূপে আমার ভ্রাতা সুরজমলকে তাদের সব দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। এ বিষয়ে সকল দায়িত্ব তাঁরই।" দূত যখন রত্নসিংহের প্রস্তাব সুরজমলের কাছে পেশ করলেন, সুরজমল বললেন, "আমি নিজে চিতোর যাব। সেখানে রত্নসিংহের সাক্ষাতে সব কথা বার্তা হবে।"[৬]

দূত পূরণমল ফিরে গিয়ে রত্নসিংহকে সকল কথা জানানর পর রত্নসিংহ বুঝলেন যে একমাত্র যুদ্ধ ছাড়া রণথম্ভর ফিরে পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

রাণা সংগ্রামের কাছ থেকে নিজের পুত্রদের জন্য শুধু রণথম্ভর লাভ করেই কর্মবতী সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁর একান্ত বাসনা ছিল পুত্র বিক্রমাদিত্যকে মেবারের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু সুচতুর বাস্তবজ্ঞানসম্পন্না কর্মদেবী জানতেন যে, শক্তিশালী কোন রাজার সাহায্য ছাড়া তাঁর এই বাসনা পূর্ণ হতে

পারে না। তার জন্য কর্মবতী যাঁর সঙ্গে গোপনে চুক্তি করলেন, তিনি অন্য কেউ নন—স্বয়ং বাবর।

বাবর নিজের আত্মকাহিনীতে কর্মবতীর সঙ্গে তাঁর গোপন চুক্তির ঘটনাবলির কথা লিখে গেছেন। বার্ষিক ৭০ লক্ষ টাকা বৃত্তির বিনিময়ে বিক্রমজিৎ বাবরের প্রভুত্ব স্বীকারের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন। আস্থক নামে বিক্রমজিতের এক বিশ্বস্ত কর্মচারীর মারফৎ এই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। বাবর এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং সেই সঙ্গে প্রস্তাব করেন যে বিক্রমজিৎ রণথম্ভর দুর্গ তাঁর নিকট সমর্পন করবেন ও তার পরিবর্তে বাবর বিক্রমজিতকে বার্ষিক ৭০ লক্ষ টাকা আয় যুক্ত জায়গীর দান করবেন। এ বিষয়ে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার জন্য বাবর বিক্রমজিতের দূতকে তাঁর সঙ্গে কয়েক দিন পরে গোয়ালিয়রে সাক্ষাৎ করতে বলেন। নির্দ্ধারিত তারিখের কয়েকদিন পরে আস্থক গোয়ালিয়রে বাবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইতিমধ্যে আস্থকের সঙ্গে কর্মবতী ও বিক্রমজিতের কথাবার্তা হয় ও তাঁরা নিজেদের বাবরের প্রজারূপে স্বীকার করতে সম্মত হন। রাণা সংগ্রাম সুলতান মামুদের কাছ থেকে যে সোনার কোমর-পেটি ও রত্ন-খচিত জরির মুকুট লাভ করেছিলেন বিক্রমজিৎ সেগুলিও বাবরকে পাঠিয়ে দেন। বিক্রমজিৎ বাবরের কাছে রণথম্ভরের পরিবর্তে বিয়ানা অঞ্চল প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবর বিয়ানার পরিবর্তে সামসাবাদ দিতে সম্মত হন। ঐ দিনই বাবর বিক্রমজিতের দূতকে বেশভূষা ও উপঢৌকন দান করেন এবং স্থির হয় যে নয়দিন পরে বিয়ানাতে উভয়পক্ষের মধ্যে পুনরায় সাক্ষাৎ হবে।[৬]

ঘটনা পরম্পরায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাবর ও বিক্রমজিতের মধ্যে সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়নি। কিছুদিন পরে রণথম্ভর গ্রহণ ও প্রস্তাবিত চুক্তি নিয়মানুযায়ী সম্পন্ন করার জন্য বাবর তাঁর দূত প্রেরণ করেন। দূতকে নির্দেশমত কাজ করা এবং সব ঘটনা ও কথাবার্তা ফিরে এসে সম্রাটের নিকট নিবেদন করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বাবর তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন, "বিক্রমজিৎ যদি নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করে তাহলে আমি তাঁকে কথা দিয়েছি যে আল্লার দোয়ায় আমি তাঁকে তাঁর পিতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে মেবারপতি করে দেব।"[৭]

বাবর কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই চুক্তির সর্ত পালন করতে পারেন নি। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে গুরুতর সমস্যার সমাধানে জড়িয়ে পড়ায় বাবর মেবারের বশ্যতা স্বীকারের এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। কিন্তু মুঘল সম্রাট বাবরের সঙ্গে কর্মবতীর এই গোপন চুক্তি শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী না হলেও কর্মবতীর চরিত্রের কয়েকটি দিক এই ঘটনা থেকে ফুটে ওঠে। কর্মবতীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিজের দুই পুত্র—বিক্রমাদিত্য ও উদয়সিংহের স্বার্থরক্ষা ও বিক্রমাদিত্যকে মেবারের রাণার পদে অভিষিক্ত করা। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তিনি ছল, বল, কৌশল—

যে কোন প্রকার প্রচেষ্টায় কুণ্ঠা বোধ করেননি। সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে বাবরের সঙ্গে প্রস্তাবিত মিতালি ছিল কর্মবতীর এক বিরাট কূটনৈতিক চাল। কেননা, বাবরের সহায়তায় বিক্রমাদিত্যের পক্ষে মেবারের সিংহাসন পাওয়া আদৌ কঠিন হত না। এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন মনে আসে—কর্মবতী কেন বাবরকে সোনার কোমর-পেটি ও রত্নখচিত জরির মুকুট পাঠিয়েছিলেন ? বাবর কি ঐ দুটি জিনিস চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, না কর্মবতী বাবরকে সন্তুষ্ট করার জন্য উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। বাবর নিজে এগুলি চেয়ে পাঠানর কথা লেখেননি। কাজেই মনে হয় যে কর্মবতী উপঢৌকন হিসাবেই এগুলি বাবরকে দিয়েছিলেন। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই ; মেবারের স্বাধীনতার চেয়েও নিজ পুত্রের সিংহাসন লাভ যাঁর কাছে বড়, তাঁর কাছে রাণা সংগ্রাম সিংহের বিজয়-গৌরবের স্মৃতি-চিহ্নের বিশেষ কোন মূল্য ছিল বলে মনে হয় না।

রত্নসিংহ কিন্তু দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে পারেননি। ১৫৩১ সালে শোচনীয় ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। কথিত আছে সুরজমলকে হত্যা করার জন্য রত্নসিংহ এক চক্রান্ত করেন। এই চক্রান্তানুযায়ী বুদ্দিতে এক শিকার অভিযানের আয়োজন করা হয়। এই অভিযানের মধ্যেই রত্নসিংহ ও সুরজমলের মধ্যে এক অসি-যুদ্ধ হয় এবং উভয়েই নিহত হন।[৮]

রাণা রত্নসিংহের কোন পুত্র না থাকায় বিক্রমাদিত্য চিতোরের সিংহাসন লাভ করেন। কর্মবতীর দীর্ঘদিনের বাসনা পূর্ণ হল। রত্নসিংহের শোচনীয় মৃত্যুর পশ্চাতে যে ক্ষুরবুদ্ধিসম্পন্না এই নারীর হাত ছিল সে অনুমান বোধ হয় অবাস্তব নয়।

বিক্রমাদিত্য রাজ্যশাসনে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রতিহিংসাপরায়ণ ও উদ্ধত স্বভাব, অসৎ চরিত্র ও অযোগ্যতা অল্প দিনের মধ্যেই মেবারে দুর্দিন ঘনিয়ে আনলো। রাণা সংগ্রামের আমলের পুরাণো বিশ্বাসী ও নির্ভীক সামন্তদের পর্য্যন্ত অপমান ও লাঞ্ছনা করতে তিনি ইতস্ততঃ করেননি। ফলে অধিকাংশ সামন্তই রাজসংসর্গ ত্যাগ করলেন। দেশের এই আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ নিয়ে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শা চিতোর আক্রমণ করলেন (১৫৩৪ সাল)।

চিতোরের এই মহাসঙ্কটে রাণী কর্মবতী পুনরায় আশ্রয় নিলেন কূটনীতির। কর্মবতী মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের কাছে রাখী পাঠালেন ; ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মুঘল সম্রাটকে আবদ্ধ করলেন। বিপদাপন্ন হয়ে কর্মবতী হুমায়ুনের সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। হুমায়ুন তখন সুদূর বাঙ্গলা দেশে। তিনি কর্মবতীর রাখী উপহার পেয়ে বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন ও কর্মবতীকে 'প্রিয় গুণবতী ভগিনী' বলে সম্বোধন করে চিঠি লিখেছিলেন। কর্মবতীর সাহায্য প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে হুমায়ুন বাহাদুর শা'কে বাধা দেবার জন্য বাঙ্গলা দেশ থেকে এলেন।[৯]

কিন্তু মুঘল সৈন্য বাহিনী যখন চিতোরে প্রবেশোন্মুখ তখন হুমায়ুন বাহাদুর শা'র

এক পত্র পেলেন। এই পত্রে বাহাদুর শা হুমায়ূনকে লিখেছিলেন যে বিধর্মীদের শাস্তি দেবার জন্য তিনি চিতোর অবরোধ করেছেন; চিতোরের পতন আসন্ন। চিতোরের পতন মুসলমান ধর্মের জয় ঘোষণা করবে; কাজেই সুলতান আশা করেন যে মুসলমান ধর্মের অন্যতম রক্ষক হিসাবে হুমায়ূন তাঁর এই অভিযানে বাধা দেবেন না। 'ধর্মপ্রাণ' হুমায়ুন বাহাদুর শার এই অনুরোধ রক্ষা করলেন। বাহাদুর শার চিতোর আক্রমণ তিনি নীরব দর্শকের মত দেখলেন মাত্র; কোনরূপ বাধা দিলেন না।[১০]

হুমায়ূনের কাছে থেকে প্রত্যাশিত সাহায্য না পেয়ে কর্মবতী বাহাদুর শার সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। সন্ধির সর্তানুযায়ী বাহাদুর শা সোনার কোমর-পেটি, রত্নখচিত জরির মুকুট, প্রভূত অর্থ, ১০০টি ঘোড়া ও ১০টি হাতি লাভ করলেন।[১১] সন্ধির পর বাহাদুর শা গুজরাটে প্রত্যাবর্তন করলেন।

অধ্যাপক জি, এন, শর্মার মতে কর্মদেবী হুমায়ূনের সাহায্য প্রার্থনা করে মারাত্মক ভুল করেছিলেন। মুঘলদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করায় মেবারের রাজপুত বীরদের আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল। ফলে, তাঁরা চিতোর রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করেননি।[১২] হুমায়ূনের সাহায্য প্রার্থনা করে কর্মবতী রাজপুত আত্মসম্মান-বোধে হয়ত আঘাত করেছিলেন, কিন্তু কূটনীতির দিক থেকে তিনি কোন ভুল করেছিলেন বলে মনে হয় না। শক্তিশালী সুলতান বাহাদুর শার আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তখন চিতোরের ছিল না, অল্পদিনের মধ্যেই বাহাদুর শার দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণের সময় তা প্রমাণিত হয়েছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে চিতোর তথা মেবারের স্বাধীনতা অপেক্ষা কর্মদেবী নিজের পুত্রের রাজত্ব লাভ ও তার সংরক্ষণের বিষয়ে অধিক সচেতন ছিলেন। এর জন্যে যে কোন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। তিনি পূর্বেই বাবরের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী হয়েছিলেন, কাজেই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য হুমায়ূনের সাহায্য প্রার্থনা বা বশ্যতা স্বীকার করা তিনি অন্যায় মনে করেন নি। বাবরের পুত্র হুমায়ুন রাজপুতানার প্রধান রাজ্য মেবারের বশ্যতা স্বীকারের এই সুবর্ণসুযোগ যে অবহেলা করতে পারেন, এ ছিল অকল্পনীয়। কূটনীতিতেও কর্মবতীর রাজনৈতিক চালে কোন ভুল হয়নি। ভুল হয়েছিল মুঘল সম্রাট হুমায়ূনেরই। কর্মবতীর প্রতি তাঁর কর্তব্য বা প্রতিশ্রুতি পালনের প্রশ্ন বাদ দিলেও নিজের স্বার্থে বাহাদুর শাকে প্রতিরোধ করা হুমায়ূনের উচিত ছিল। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার ও সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য রাজপুতদের সাহায্য যে একান্ত অপরিহার্য ছিল সে বোধশক্তি হুমায়ূনের ছিল না। তা যদি থাকত, তাহলে তাঁর পুত্র আকবরের পূর্বেই হুমায়ুন মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করে তুলতে পারতেন।

বাহাদুর শার আক্রমণের পরেও বিক্রমাদিত্যের চরিত্র বা রাজ্যশাসনের কোন

পরিবর্তন হয়নি। দু' বছর পরে (১৫৩৫) বাহাদুর শা পুনরায় চিতোর আক্রমণ করলেন। রাণা বিক্রমাদিত্য ও উদয়সিংহকে নিরাপত্তার জন্য বুন্দিতে সরিয়ে দিয়ে কর্মবতী স্বয়ং চিতোর রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সকল রাজপুতদের আহ্বান জানিয়ে কর্মবতী আবেদন করলেন, "এতদিন চিতোর ছিল রাজপুতদের। আজ চিতোর হারাবার সময় আসন্ন। আমি চিতোর তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। তোমাদের ইচ্ছা হয় চিতোর রক্ষা কর। আর তোমাদের ইচ্ছা হয়ত শত্রুর হাতে চিতোর তুলে দাও। আমি স্বীকার করি তোমাদের রাজা অযোগ্য। কিন্তু বংশ পরম্পরায় এ রাজ্য তোমাদেরই। এই রাজ্য যদি শত্রুর হস্তগত হয় তো তোমাদেরই হবে দারুন অপমান।" কর্মবতীর এই আবেদনে সকল দেশপ্রেমিক রাজপুত বীর চিতোর রক্ষার জন্য মরণ পণ করে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু মেবারের দেশপ্রেমিকদের সমবেত প্রচেষ্টা ও আত্মাহুতি চিতোর রক্ষা করতে সক্ষম হল না। যুদ্ধে একে একে সব রাজপুত বীর প্রাণ দিলেন। বাহাদুর শা জয়লাভ করলেন। রাণী কর্মবতী অন্যান্য রাজপুত নারীদের সঙ্গে জহর-ব্রত পালন করে প্রাণবিসর্জন দিলেন।[১৩]

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মেবারের সংগ্রাম এক উজ্জল অধ্যায়। দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগোজ্জল বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে কর্মবতীর চরিত্র সত্যই বৈচিত্র্যপূর্ণ। রাণা সংগ্রামসিংহের নিকট থেকে পুত্র বিক্রমাদিত্য ও উদয়সিংহের জন্য রণথম্ভর লাভ, বিক্রমাদিত্যকে রাণা পদাভিষিক্ত করার জন্য বাবরের সঙ্গে গোপন চুক্তি, বাহাদুর শার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য হুমায়ূনকে ভ্রাতৃত্বে বরণ ও তাঁর সাহায্যপ্রার্থনা, আর সবশেষে চিতোর রক্ষার জন্য মেবার-বাসীর নিকট প্রাণস্পর্শী আহ্বানের ভিতর দিয়ে আমরা খুঁজে পাই এক কর্মবতীকে, যিনি বুদ্ধিমতী দুরদৃষ্টিসম্পন্না সাহসী ও সর্বোপরি ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ। কিন্তু মেবারের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বুদ্ধিমতী নারীর সকল চিন্তা ও কৌশল নিয়োজিত হয়েছিল তাঁর পুত্রদের জন্যই। বিক্রমাদিত্য ও উদয়সিংহের স্বার্থ ছিল তাঁর কাছে সব চাইতে বড়। তার জন্য মেবারের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত তিনি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কর্মবতী ছিলেন তাঁর পুত্রদের জননী কিন্তু মেবার-জননী তিনি হতে পারেননি। অন্ধমাতৃস্নেহ তাঁর মনকে করে তুলেছিল সঙ্কীর্ণ, দৃষ্টিকে করেছিল সীমাবদ্ধ। বহুবিবাহ প্রথার কুফল-স্বরূপ অন্তর্বিরোধ রাণা সংগ্রামের মেবারে দেখা দিয়েছিল ও তার স্বাধীনতাকে বিপন্ন করেছিল।

অধ্যাপক শর্মা কর্মবতীকে 'সামান্য' (mediocre) চরিত্র বলে অভিহিত করেছেন।[১৪] কিন্তু কর্মবতীকে 'সামান্য' পর্য্যায়ভুক্ত করলে অন্যায় হবে। স্বাদেশিকতা বা জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে কর্মবতী উচ্চস্থানের অধিকারিণী নন সত্য, কিন্তু রাজনৈতিক দ্যূতক্রীড়ায় তিনি ছিলেন পারদর্শিনী। বাহাদুর শার দ্বিতীয়বার

চিতোর আক্রমণের সময় তিনি যেভাবে চিতোরের সকল অধিবাসীকে দেশরক্ষার সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তার দৃষ্টান্ত যে কোন ইতিহাসে সত্যই বিরল। কর্মবতী যে নিপুণতা, কৌশল ও কূটনৈতিক বুদ্ধি তাঁর পুত্রদের স্বার্থে নিয়োজিত করেছিলেন তা যদি মেবারের জন্য নিয়োজিত হত তাহলে রাণা সংগ্রামের মৃত্যুর পরও তাঁর অসমাপ্ত কার্য্য হয়ত সম্পূর্ণ হত।

১। উদয়পুর রাজ্য কা ইতিহাস, গৌরীশঙ্কর ওঝা, পৃষ্ঠা ৩৮৪—৩৮৫

২। মুহনোত নৈনসী কী খ্যাত, পৃষ্ঠা—৪৭ ; Mewar and Mughal Emperors, by Dr. G. N. Sharma p. 46. fn. রত্নসিংহের মা ছিলেন ধনবাঈ (Mewar and Mughal Emperors) p-46 কর্মবতী, কর্মেতী নামেও পরিচিত। বাবরের আত্মকথায় তিনি ভ্রমক্রমে পদ্মাবতী বলে উল্লেখিত হয়েছেন।

৩। মুহনোত নৈনসী কী খ্যাত, পৃষ্ঠা—৪৭-৪৮

৪। রণথম্ভর ছাড়া বিক্রমাদিত্য ও উদয়সিংহ ৫০।৬০ লক্ষ জায়গিরদারি পেয়েছিলেন Mewar and Mugal Emperors—p, 46

৫। উদয়পুর রাজ্য কা ইতিহাস—পৃষ্ঠা ৩৮৮-৩৮৯

৬। Memoirs of Babur Vol II, tr. by J. Leyden & W Erskine - pp. 341-342.

৭। Memoirs—p, 345

৮। উদয়পুর রাজ্য কা ইতিহাস—পৃষ্ঠা ৩৬২-৩৬৩

৯। Annals and Antiquities of Rajasthan by Tod—Popular Edition. pp. 329—331 হুমায়ুনের কাছে কর্মবতী যে দুত পাঠিয়েছিলেন তার নাম ছিল পদম শা—Mewar and Mughal Emperors, p. 50

১০। Memoirs of Humayun by Jouher. Translated by Charles Stewart, p. 4

১১। উদয়পুর রাজ্য কা ইতিহাস, পৃষ্ঠা—৩৯৬ কর্মবতী সোনার পেটি ও রত্নখচিত জরির মুকুট ইতিমধ্যেই বাবরকে উপঢৌকনরূপে দিয়েছিলেন। কাজেই বাহাদুরকে ঐ একই সামগ্রী কি করে দিলেন বোঝা যায় না। বাবরের কথাই অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়।

১২। Mewar and the Mughal Emperors, পৃঃ ৫১

১৩। উদয়পুর রাজ্য কা ইতিহাস—পৃঃ ৩৯৭—৩৯৯

১৪। ঐ পৃঃ ৫৮

এক সিপাহীর আত্মকথা

শ্রীশোভন বসু

(পূর্বানুবৃত্তি)

একাদশ অধ্যায়

ফিরিঙ্গী সেনাদল একেবারে ধ্বংস হয়েছে—এমন সংবাদ এসে পৌঁছনর পর সহরে আনন্দ উৎসব সুরু হয়ে গেল। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাহ সুজা আমীরের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন; তবুও লোকে তাঁকে সন্দেহ করত। ফিরিঙ্গী সেনাদের ডেকে এনে তিনি দেশের সর্বনাশ করেছেন এবং তাদের সাহায্যে সিংহাসনে বসেছেন—এই সব কারণে দেশের লোক শাহকে ভীষণ ঘৃণা করত। বালহিসারের প্রাসাদে শাহ বাস করছিলেন। তখনও তিনি দেশের রাজা। অল্পদিন পরেই কিন্তু তাঁর রাজত্ব শেষ হল। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সর্দারদের তাঁবু পরিদর্শনে যাবার সময় একদিন কয়েকজন বরকজায়ী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। সর্দার ফতে সিং সিংহাসন অধিকার করলেন। আমীর আকবর খান কিছু সৈন্য নিয়ে তাড়াতাড়ি কাবুলে ফিরে এসে তাঁকে সহর থেকে তাড়িয়ে দিলেন। শোনা যায় তিনি পালিয়ে ইংরাজ সেনাদলে যোগ দিয়েছিলেন; ইংরাজরা তখন আফগানিস্থানের দিকে আসছিল।

কাবুলে যে সব সাহেব বন্দী ছিলেন তাঁদের সঙ্গে আমি কয়েকবার দেখা করতে চেষ্টা করেছিলাম। তাঁদের বড় কড়া পাহারার মধ্যে রাখা হয়েছিল। সহরের একটি ছোট বাড়ীতে একবার মাত্র পাঁচজন সাহেব ও তিনজন মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে পেরেছিলাম। তাদের কোন উপকার অবশ্য করতে পারিনি। তাদের শুধু বলেছিলাম যে লোকের ধারণা ইংরাজ সেনা নাকি সে দেশে এসে পৌঁচেছে। শুনে তাঁরা যেন মনে শান্তি পেলেন। ইংরাজরা এখানে এলে তাদের খবর দেব বললাম। একজন অফিসার বললেন তাদের দেশের বাইরে কোথাও পাঠান হবে, এই বলে প্রায়ই ভয় দেখান হচ্ছে। সেখানে নাকি ক্রীতদাস রূপে তাদের বিক্রি করা হবে। তাঁর ভয় ইংরাজ সেনারা এসে পড়বার আগেই হয়ত এমন করা হবে। সাধারণ লোকেরাও তাদের বড় জ্বালাতন করছে। তারা প্রায়ই সেখানে আসে এবং তাদের গালমন্দ করে। তিনি জেনারেল এলফিনস্টোন সাহেবের খোঁজ করলেন। তিনিও একজন বন্দী। তিনি কোথায় ছিলেন তা কখনও খুঁজে পাইনি। মনে হয় সহরের বাইরে কোথাও তাঁকে আটক্ করা হয়েছিল। আমীর

যেন কিছু তামাক নিয়ে আমাকে সেখানে পাঠিয়েছেন, এমন ভান করে আমি সন্ধ্যাবেলা সাহেবের সঙ্গে এভাবে দেখা করেছিলাম। কিন্তু আমাকে এমন জেরা করা হয় যে আবার সেখানে যেতে সাহস হলনা। একবার যে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি তাই অনেক ভাগ্য।

ইংরাজরা ক্রমেই এগিয়ে আসছে, এ নিয়ে লোকে প্রতিদিন বলাবলি করত। তারা বলত গিরিপথে ইংরাজ সৈন্যদের মোতায়েন করা হয়েছে এবং কয়েক লক্ষ লোক আফগানিস্থান অধিকার করতে আসছে। এখন সবারই মনে ভয় হল। ইংরাজদের হত্যা করার জন্যে তারা অনুতাপ করতে লাগল; গাজীদের উপরেই বেশী দোষ চাপান হয়। ধনী লোকেরা সহর ছেড়ে চলে গেলেন। একদিন বন্দী সাহেবদের সম্বন্ধে আমার মালিককে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করলাম। তাকে বললাম তিনি যদি তাদের কোনভাবে সাহায্য করেন, তাহলে পরে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। উত্তরে তিনি আমাকে গালমন্দ করলেন এবং আগের মত আবার ভয় দেখালেন। আমার পোষাক আফগানদের মত ছিল, গলার স্বর কিন্তু তাদের মত ছিলনা। ইংরাজ অফিসারদের কাছে যেতে ভরসা হলনা। আমার হাতে পয়সা কড়িও ছিলনা, কাজেই কাউকে যে ঘুষ দিয়ে বশ করব তার উপায় নেই। মালিকের বাড়ীতে যে ছেলেটি মাংস দিত তাকে হাত করবার চেষ্টা করলাম। একদিন তাকে বলতে শুনেছিলাম যে তার কলকাতা দেখবার বড় ইচ্ছা; ফিরিঙ্গীদের বিস্ময়কর কাজকর্ম দেখবার ইচ্ছাও সে জানিয়েছিল। হাতে প্রয়োজনমত টাকা জমলেই সে একটি কাফিলার সঙ্গে ভারতে যাবে। ফার্সী অক্ষরে হিন্দি ভাষায় একটি চিঠি লিখে সাহেবদের দেওয়ার জন্য তাকে দিয়েছিলাম। এর পর তাকে আর কখনও দেখতে পাইনি। জানিনা এই চিঠি সে দিয়েছিল কিনা এবং দিলেও এর বক্তব্য সাহেবরা বুঝতে পেরেছিলেন কিনা। এই চিঠিতে জানিয়ে ছিলাম যে খবর পাওয়া গেছে কাবুল থেকে আর দশ দিনের পথ দূরে ইংরাজ সৈন্যরা এসে হাজির হয়েছে। ইংরাজ বাহিনী এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে ভয় বাড়তে লাগল। আমার মালিক স্থির করলেন যে সহর ছেড়ে চলে যাবেন। তাকে বোঝালাম যে ফিরিঙ্গীদের রীতিনীতি আমি জানি; ইংরাজদের বিপক্ষে তিনি কখনও যুদ্ধ করেননি, কাজেই তার উপর কোন অত্যাচার হবেনা। কিন্তু সব বৃথা। তিনি আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। সহর ছেড়ে তিনি চললেন।

আমার উপর এখন কড়া পাহারা বসেছে, পালিয়ে যাবার কোন সুযোগ নেই। মালিক সপরিবারে ইসতালিফের দিকে চললেন। মুক্তির সব আশা ছেড়ে দিয়েছি। এই স্থানটি পাহাড়ের ধারে, চারদিকে গভীর খাদ, তা পার হয়ে সহজে আসা যায় না। পাথরের প্রাচীর ও ছোট ছোট বুরুজ তৈরী করে লোকে স্থানটিকে আরও সুরক্ষিত করেছে। আফগানদের ধারণা ছিল যে কোন আক্রমণের হাত থেকে এ

জায়গাটি তারা রক্ষা করতে পারবে। ইংরাজ ছাড়া আর যে কোনও সেনার বিপক্ষে হয়ত তা করা সম্ভব ছিল।

কিছুদিন পরে শুনলাম ইংরাজরা কাবুল অধিকার করেছে; গজনী এবং কান্দাহারেরও পতন হয়েছে এবং একদল সৈন্য ইসতালিফ আক্রমণ করতে আসছে। আমার মালিক পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আরও দূর দেশে শিরকুদো (Sheer kudo) নামে এক স্থানে চলে গেলেন। পথে শুনলাম ইংরাজরা আফগানদের ইসতালিফ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সহরটি ধ্বংস করেছে। এই যুদ্ধে অনেক লোক মারা গিয়েছিল।

আমার মালিক শিরকুদোয় সাত মাস ছিলেন। আমার মনে সুখ নেই। পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলেও কোন পথে যে যাব কিছু জানিনা। ফার্সীতে বেশ ভাল-ভাবেই লিখতে ও পড়তে শিখেছি; কিন্তু উচ্চারণ ঠিকমত করতে না পারায় নিজেকে আফগান বলে পরিচয় দিতে পারতাম না। অনেকদিন ইংরাজদের কোন খবর না পেয়ে আমি অনেকটা নিরাশ হয়ে পড়লাম। ক্রীতদাস রূপেই জীবন কাটাতে হবে এই ভেবে বড় অস্থির হয়ে উঠি। পুরনো রেজিমেণ্ট ছেড়ে আসার জন্য আমার অনুতাপ হতে লাগল। অবশেষে একদিন এই দূর দেশে খবর এল যে ইংরাজরা সারা কাবুল সহরটি পুড়িয়ে দিয়ে ভারতে ফিরে গেছে।

কয়েকটি আফগান পরিবার নিজেদের বাড়ীতে ফিরে গেলেন। বন্ধুদের কাছে এই খবর সত্যি জেনে আমার মালিকও ফিরে যাবার ব্যবস্থা করলেন। কাবুলে এসে যখন পৌঁছলাম তখন সেখানে তুষারপাত সুরু হয়েছে। সহরটি অবশ্য পোড়ান হয় নি; বাজারটি কেবল একেবারে ধ্বংস হয়েছে। লোকজনের উপর কোন অত্যাচার করা হয়নি, সবাই এতে আশ্চর্য হয়েছিল। অত্যাচারের ভয়েই যাদের সঙ্গতি ছিল তারা সহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

তিন বছরেরও কিছু বেশী এই দেশে আছি। এর মধ্যে বাবা বা বাড়ীর অন্য কারুর কাছ থেকে কোন খবর পাইনি। যদি তাঁরা বেঁচে থাকেন কে তাঁদের দেখাশোনা করছে, আর কি ভাবেই বা তাঁদের দিন কাটছে জানিনা। অনেক রকম ভাবনা হল। মালিক আমার সঙ্গে ভালই ব্যবহার করতেন। তবুও এমন অনেক কাজ আমাকে করতে হত যা আমার জাতে করা বারণ; এতে যে আমার মন বিরূপ হয়ে উঠত, এ তিনি বিবেচনা করে দেখতেন না।

ইংরাজরা এ দেশ থেকে চলে গেছে, কাজেই আমার পালিয়ে যাওয়ার সুযোগও কমে গেছে। আমি একরকম এ আশা ছেড়েই দিয়েছি। কয়েক মাস পরে আমার মালিককে ব্যবসার কাজে একবার গজনী যেতে হয়। আমি একা রইলাম। অনেক দিন নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ জানাইনি বা পালিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে কোন কথা বলিনি, এই কারণে আমার উপর তেমন পাহারা ছিলনা; তখন অনেকটা স্বাধীন-ভাবে ঘোরাফেরা করতাম। আহমদ শা নামে কাফিলার এক সর্দারের সঙ্গে

আমার বন্ধুত্ব হয়। সে প্রতি বছর হিন্দুস্থানে যেত। অযোধ্যার প্রতিটি সহর সে জানে এবং সেখানকার অনেক ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। এই সব দেখে তার কাছে আমি মনের কথা খুলে বলি। বললাম সে যদি আমাকে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে তাহলে ভারতে গিয়ে তাকে অনেক টাকা দেব। অনেক দর কষাকষির পর সে আমাকে চাকর সাজিয়ে নিয়ে যেতে রাজী হল; এর জন্য তাকে পাঁচশ টাকা দিতে হবে। এই চুক্তির কথা কাগজে কলমে আমাকে লিখে দিতে হল। লেখার পর ভয় হল হয়ত সে আমার গুপ্তকথা ফাঁস করে দেবে। কিন্তু এই বলে মনকে প্রবোধ দিলাম যে আমাকে সাহায্য করলে তারই লাভ; আমাকে ঠকিয়ে সে কিই বা লাভ করবে?

কয়েকদিনের মধ্যেই সে যাওয়ার জন্য তৈরী হল। আমি একপ্রস্থ ময়লা জামা কাপড় কিনলাম। মাথার চুল দিয়ে মুখ অনেকটা ঢেকে রেখেছি, যাতে পুশুরিদের মত অনেকটা দেখতে হয়। মালিকের হিসাবপত্রের সব কাগজ এবং তার দেওয়া কাপড় জামাও সব রেখে দিলাম; কেবল একটি ছোরা সঙ্গে নিয়েছিলাম। একশ পঁচাত্তরটি উটের একটি কাফিলার সঙ্গে একদিন প্রত্যুষে কাবুল ত্যাগ করলাম। শীঘ্রই বুঝতে পারলাম এই দলের সঙ্গে চাকর হয়ে যাওয়া, যদিও সেজে আছি মাত্র, কি কষ্টের। আহমদ শা খুব রাগী মানুষ, হিন্দিতে আমাকে সে বড় গালাগালি দিত। সব সময় তা সহ্য করা যেত না। আমাকে উট তদারক করতে হত, তাদের চরাতে নিয়ে যেতে হত। আসলে উটের রাখালগিরি পুরোপুরি আমাকেই করতে হত। মুখবুজে সব করে যেতাম। কাবুল থেকে যত দূরে আসছি মুক্তির আশায় মন আনন্দে নেচে উঠছে। এই সময় হঠাৎ খবর পাওয়া গেল দেশে বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য পাঞ্জাবের উত্তরাঞ্চল দিয়ে যাওয়া খুব বিপজ্জনক। এ ছাড়া সেখানে অনেক রকম শুল্ক দিতে হবে এবং এই শুল্কের পরিমাণও খুব বেশী। আহমদ শা ডেরা ইসমাইল-খানের পথে যাওয়াই স্থির করলেন। আমরা গজনীর পথ ধরে চলেছি। হয়ত সেখানে আমার মালিকের সঙ্গে দেখা হতে পারে এবং দেখা হলে তিনি আমাকে ফেরৎ চাইবেন এই ভেবে আমার খুব ভয় হল। শুনেছিলাম আমার মালিক দস্যুর ভয়ে কয়েকজন সওয়ার সঙ্গে নিয়ে গজনী গেছেন। কাজেই আমাদের পাশ দিয়ে কোন দল যখন সওয়ার সঙ্গে যেত তাদের ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখতাম।

গজনী পৌঁছতে আর দুদিন বাকী। এমন সময় ওসমান বেগ সদলে আমাদের কাফিলার পাশ দিয়ে চলে গেলেন। দূর থেকে তাকে দেখে স্থির করলাম যে ধরা পড়ার আগে পিস্তলের গুলিতে হয় তাকে মারব, নয় নিজে মরব। আমাকে এ সময় একটি পিস্তল দেওয়া হয়েছিল। কি সঙ্কটজনক মুহূর্ত! একটু ভুল হলেই নিশ্চিত ধরা পড়ব। যে ধার দিয়ে তিনি যাবেন ঠিক সেদিকেই আমি উটের দলের

সঙ্গে ছিলাম। তাকে দেখে অন্য ধারে গেলাম এবং জোরে শব্দ করতে লাগলাম— উঠ তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় আফগানরা যেরকম শব্দ করে। হিন্দুস্থানের লোকেরা কিন্তু ঠিক এ ধরণের আওয়াজ করত না। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার মালিক জানতে চাইলেন যে এ কাফিলা কাদের এবং কতদিন আগে আমরা কাবুল ত্যাগ করেছি। সৌভাগ্যক্রমে আমার পিছনের লোকটি উত্তর দিল; আমাকে আর কোন কথা বলতে হলনা। হলে নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যেতাম। আমাকে লক্ষ্য না করেই ওসমান বেগের দল চলে গেল। এবার আমার মুক্তির আশা আরও প্রবল হয়ে উঠল। ওসমান বেগের রক্ষীদের বর্শার ফলক ক্রমেই দূরে মিলিয়ে গেল; তা দেখে কি স্বস্তি আমার। বুন্দেলখণ্ডে কবর থেকে পিণ্ডারীদের দূরে চলে যেতে দেখেও এমন স্বস্তি বোধ করিনি। জীবনে দু'দুবার এরকম বিপদে খুব কম লোকেই পড়েছে।

গজনী থেকে কাফিলা পূর্বদিকে চলল; পাহাড়ী লোকদের টাকা দিয়ে আমরা ডেরা-ইসমাইল-খানে এসে পৌঁছলাম। পথে কেউ আমাদের উপর কোন অত্যাচার করেনি। ডেরা-ইসমাইল-খান তখন শিখদের দখলে। সেখান থেকে যাওয়ার আগে কাফিলাকে অনেক টাকা শুল্ক দিতে হল। এখনও আমি নিজের দেশে হাজির হইনি; তবুও আফগানদের জঘন্য দেশ ছেড়ে এসেছি এবং সিন্ধু নদ পার হয়ে আবার এদেশে এসেছি, এই ভেবে মনে বড় আনন্দ হল। ডেরা-ইসমাইল-খানে শুনলাম ইংরাজরা সিন্ধুদেশে যুদ্ধ করছে। আহমদ শাকে কাফিলা নিয়ে সেই দিকে যেতে বললাম। কিন্তু সে সোজা ফিরোজপুর যাওয়া স্থির করল। শিখেরা নানাভাবে আমাদের জ্বালাতন করতে লাগল; তারা কাফিলার কাছে অনেক রকম শুল্ক দাবী করত। যাই হোক ১৮৪৩ সালের অক্টোবর মাসে আমরা ফিরোজপুরে এসে পৌঁছলাম।

ক্যাণ্টনমেণ্টের বাড়ীঘর দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রেজিমেণ্টের ড্রাম ও বিউগিলের শব্দও শোনা গেল। এই সব দেখে শুনে আমার বড় আনন্দ হল। কিন্তু আহমদ শা আমাকে একলা ক্যাণ্টনমেণ্টে যেতে দিতে রাজী হল না। আগে সে সরাইখানায় নিজের থাকার ব্যবস্থা করবে; তারপর সেও আমার সঙ্গে যাবে। এক মুহূর্তও সে আমাকে চোখের আড়াল করতে রাজী নয়। উটের পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে তাদিকে খাওয়াতে নিয়ে যাওয়া হল; তারপর আমরা দুজনে ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে চললাম। মেজর সাহেবের কাছে যেতে তিনি বললেন যে তাঁর ফলের[১] দরকার নেই এবং আমরা যেন সেখান থেকে চলে যাই। সাহেবের আর্দালীর সঙ্গে আলাপ করে তাকে আমাদের অবস্থা বুঝিয়ে বললাম যে সাহেবের সঙ্গে যেন একবার

১। আফগানরা সাধারণতঃ ক্যাণ্টনমেণ্টে সাহেবদের বাড়ী ফল, বাদাম ইত্যাদি বিক্রি করতে যেত।

আমাদের দেখা হয়। দেখা হয়েও কোন লাভ হল না। তিনি আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। পরে বললেন যদি আমার কথা সত্যিও হয়, সরকার আমার মুক্তিপণ বাবদ পাঁচশ টাকা বা অন্য কিছু দেবেন বলে তিনি মনে করেন না।

তারপর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে তাঁকে সব কথা বললাম। অনুরোধ করলাম এই ক্রীতদাস অবস্থা থেকে তিনি যেন আমাকে উদ্ধার করেন। আমি টাকা সহজে সংগ্রহ করতে পারব না, এই ভেবে 'আমি তার ক্রীতদাস'—এই কথা আহমদ শা জোর গলায় বলে বেড়াতে লাগল। সাহেব প্রথমে আমার কোন কথা শুনতে রাজি হলেন না; পরে যখন দেখলেন কয়েকটি রেজিমেণ্টের সমস্ত অফিসারের নাম আমি জানি, তখন আমার কথায় মন দিলেন। সব শুনেও তিনি কিছু টাকা দিলেন না। তিনিও বললেন সরকার কিছু দেবেন না।

শেষ চেষ্টা হিসাবে আমি একেবারে বড় কমিশনার সাহেবের কাছে গেলাম। ভাগ্যক্রমে দেখি আমাদের রেজিমেণ্টের একজন সুবাদার সেখানে পাহারা দিচ্ছেন; অন্য একটি সেনাদলে তখন তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। তাঁর কাছে আমার পরিচয় দিলাম। হিন্দিতে কথা না বলা পর্যন্ত তিনিও আমার কাহিনী বিশ্বাস করলেন না। এমন সব ঘটনা তাঁকে বলি যাতে তাঁর সব সন্দেহ দূর হয়। আমাকে তিনি কমিশনার সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। কমিশনার সাহেব মন দিয়ে সব শুনলেন; কাবুলের সেনাদল সম্বন্ধে হাজার রকম প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তিনিও বললেন সরকার আমার মুক্তিপণ দেবেন না। যাই হোক সুবাদার আড়াইশ' টাকা দিতে রাজী হলেন এবং অযোধ্যায় আমাদের পরিবারের লোকজনকে তিনি ভালভাবে জানেন-এ কথা বলার পর বড় সাহেব বাকী টাকা আগাম দিলেন। একটি খাতায় সব লেখা হল এবং সেখানে আমাকে দস্তখৎ করতে হল। এতদিনে আমি মুক্তি পেলাম। কিন্তু আমার হাতে একটি পয়সা নেই, নোংরা আফগান জামাকাপড় ছাড়া আমার সঙ্গে আর কিছু নেই। রেজিমেণ্টের 'লাইনে' গিয়ে সিপাহীদের কাছে নিজের পরিচয় দিলাম। আমার কথা শুনে তারা সবাই বলে উঠল আমি অশুচি এবং আমার জাত নষ্ট হয়েছে; কেউ কেউ আবার বলল আমাকে নাকি মুসলমান করা হয়েছে। কাজেই জাতে না ওঠা পর্যন্ত নিজের স্বজাতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না; এতে মনে বড় দুঃখ হল। এর চেয়ে কাবুলে থাকা দেখছি অনেক ভাল ছিল; সেখানে আর যাই হোক এমন খারাপ ব্যবহার কেউ করেনি।

মন খারাপ করে ব্রিগেড মেজর সাহেবের কাছে ফিরে এলাম। বড় সাহেব আমার মুক্তিপণ বাবদ কিছু টাকা দিয়েছেন, এ কথা তাঁকে বলার পর তিনি আমাকে ব্রিগেডিয়ার সাহেবের কাছে নিয়ে যাবেন বললেন। ব্রিগেডিয়ার সাহেব আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেন। তিনি আমাদের পুরনো রেজিমেণ্টকে জানতেন।

বললেন সেই রেজিমেণ্ট এখন দিল্লীতে আছে। আমাকে তিনি কিছু টাকা দিলেন এবং তাঁর বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে বাস করতেন বললেন। পুরনো রেজিমেণ্টে যাতে আমি আবার কাজে বহাল হতে পারি সেজন্য তিনি এ্যাডজুটেণ্ট সাহেবকে একটি চিঠি লিখলেন। আফগান পোষাক খুবে ফেলে দিলাম, এক বছর সাত মাস ঐ এক পোষাক পরে আছি। চুল ছাঁটা এবং দাড়ি কামানর পর আমাকে অনেকটা সিপাহীর মত দেখতে হল। এখনও স্বজাতের লোকেরা আমায় ঘৃণায় এড়িয়ে চলে; তাদের কাছে আমি পতিত। ব্রিগেডিয়ার সাহেব প্রায়ই তাঁর বারান্দায় আমাকে ডেকে বসিয়ে আমার মুখে কাবুলের গল্প শুনতেন। তিনি আমার খুব খোঁজ খবর রাখতেন। ভবিষ্যতে আমি যে সরকার বাহাদুরের সুনজরে পড়েছিলাম এ শুধু তাঁরই দয়া ও অনুগ্রহে।

কিছুদিন পরে আমার উপর হুকুম হল দিল্লীতে পুরনো রেজিমেণ্টে যোগ দিতে হবে। কয়েকজন অফিসার আমার উপর খুব সদয় ছিলেন; তাদের সাহায্যে রাহাখরচ সংগ্রহ করে দিল্লী পৌঁছে কর্ণেল সাহেবকে আমার আসার খবর দিলাম। কর্ণেল সাহেব আমাকে দেখে খুব খুশী; মনে হল তিনি আমার কোর্টমার্শালের কথা সব ভুলে গেছেন। কিছুদিন সেনাদলে আমি বাড়তি সিপাহী হিসাবে রইলাম। পরে একটি চাকরি খালি হওয়া মাত্রই রেজিমেণ্টে হাবিলদারের পদে আবার বহাল হলাম।

ইতিমধ্যে আমি বাড়ীতে যে চিঠি লিখেছিলাম, এখানে তার উত্তর এল। আমার প্রথমা স্ত্রী, মা ও বন্ধু পণ্ডিতজী মারা গিয়েছেন। বাবার ইচ্ছা আমি যেন বাড়ী যাই; তিনি আমাকে হুণ্ডিতে আড়াইশ টাকা পাঠাবেন লিখেছিলেন। ব্রাহ্মণরা এই সময় আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন যেন আমি জাতে পতিত হয়েছি। কেবল মুসলমানদের সঙ্গে ও খ্রীষ্টান বাজনদার ও গাইয়েদের সঙ্গে আমি মেলামেশা করতাম; একমাত্র এরাই আমার সঙ্গে কথা বলত। অফিসাররা এ সব জানতেন; তাঁরা আমার উপর খুব সদয় ছিলেন। আমার হাতে পয়সা নেই, কাজেই তাড়াতাড়ি জাতে ওঠার কোন ব্যবস্থা করতে পারলাম না।

বছরের শেষে ছুটি নিয়ে বাড়ী এসে দেখি অনেক কিছু বদলে গেছে। বাবা বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, এখন আমার ছোট ভাই বাড়ীর সব কাজ করে। আমি যে কাবুলে চাকর ছিলাম এ খবর গ্রামের লোক পেয়েছিল; সেজন্য আমাকে বাড়ীতে থাকতে দেওয়া হল না। নিজের ভাই এখন আমার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে ভেবেছিল অনেক আগেই আমার মৃত্যু হয়েছে; কাজেই সব সম্পত্তি সে একাই ভোগ করবে। আমার শুদ্ধির জন্য বাবা টাকা দিলেন। এবার অবশ্য বেশী খরচ হল না। আমার স্ত্রীর—রাজপুত ঠাকুরাণীর—কোন খবর কেউ জানে না; এজন্য আমার মনে সুখ ছিল না। আমাদের পুরনো রেজিমেণ্টের সঙ্গে তিনি কিছুদিন ছিলেন, তারপর

হঠাৎ কোথায় চলে যান। কেউ বলল তিনি তার নিজের দেশে ফিরে গেছেন; কেউ বা বলল অন্য এক সিপাহীর সঙ্গে তিনি চলে গেছেন। আমার ছেলে অন্য রেজিমেণ্টে বদলী হয়েছে; সেই রেজিমেণ্ট তখন সিন্ধুদেশে। প্রায় দু'বছর তার কোন খবর পাওয়া যায়নি। আমার পূর্বের স্ত্রীর গচ্ছিত কিছু টাকা পেলাম; এই থেকে সুবাদার কুশল দুবের ঋণ শোধ করে দিলাম।

চাকরি ছেড়ে বাড়ীতে থাকার জন্য বাবা ভীষণভাবে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমার মন তখন স্ত্রী ও ছেলের জন্য ব্যাকুল; জানি বাড়ীতে থাকলে কোন দিনই তাদের দেখা পাবনা। স্ত্রীর খোঁজে বুন্দেলখণ্ডে যাওয়া স্থির করলাম। যে গ্রামে তার এক ভাই বাস করত একেবারে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে এই রাজপুত ভদ্রলোকটি বড় অহংকারী; বেশ কিছু সম্পত্তির তিনি মালিক। জাতে বড় না হলেও আমার চেয়ে তাঁর পদগৌরব অনেক বেশী। কাজেই তিনি কি ভাবে আমাকে গ্রহণ করবেন বুঝতে পারছি না। মনে মনে বেশ ভয় হল। যাই হোক শেষ পর্যন্ত মন স্থির করে তাঁকে নির্ভয়ে বললাম যে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে এসেছি। আমার স্ত্রী তখন তাঁর এই ভাইএর কাছে ছিলেন। তাকে দেখে কি আনন্দই যে আমার হল।

স্ত্রীকে বাড়ীতে নিয়ে এলাম; এতে কেউ বাধা দিল না। বাবার কাছে তাকে রেখে দিল্লীতে রেজিমেণ্টে ফিরে চললাম। এখন আর আমার মনে কোন উৎসাহ নেই, জীবনে বিতৃষ্ণা এসেছে। কাবুলে যখন ছিলাম তখন কবে মুক্তি পাব—এই আশাই আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিল। কি ভাবে যে সেখান থেকে পালাব প্রতিদিন সে কথা ভাবতাম। এখন ত নিজের দেশে ফিরে এসেছি। কিন্তু কি পেলাম? এত যে কষ্ট স্বীকার করেছি তার জন্য চাকরিতে কোন উন্নতি হয় নি; কোন পুরস্কারও পাইনি। ছ'মাসের মাইনে আমার পাওনা আছে, তা পাব বলে ত মনে হয় না। দাসত্ব থেকে মুক্তি এবং জাতে ওঠার জন্য আমার অনেক টাকা খরচ হয়েছে; এ ছাড়া সাহেবের ঋণ শোধ করতে হবে। এই রকম নানা দুশ্চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং বেশ কিছুদিন শয্যাগত থাকতে হয়।

এই সময়ে আমার আবেদনপত্র সরকারের কাছে পেশ করবার জন্য কর্ণেল সাহেবকে অনুরোধ করি; এবং তিনি আমার কথায় রাজী হন। আবেদনপত্রে সব কথা খুলে লিখলাম—কতদিন সরকারের চাকরি করছি, কোন কোন যুদ্ধে যোগ দিয়েছি, কতবার যুদ্ধে আহত হয়েছি, এবং আমাদের সেনাদলের একজন অফিসারের নির্দেশেই শাহর সেনাদলে যোগ দিয়েছি; শাহর সেনাদলে আমাদের চাকরিতে উন্নতি ও মাইনে বাড়বে বলা হয়েছিল। এর পর লিখলাম যে চাকরিতে আমার কোন উন্নতি হয়নি, ছ মাসের মাইনে আমার পাওনা আছে, আহত অবস্থায় আমি শত্রুর হাতে ধরা পড়ি এবং তারা আমাকে দাস রূপে বিক্রি করে দেয়; পাঁচশ

টাকা দিয়ে কোন মতে আমি সেখান থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছি; এবং এই এক বছর সাত মাস বোধ হয় আমার পেনসন-এর হিসাব থেকে বাদ যাবে। সব শেষে আমার এই আবেদন পত্র অনুগ্রহ করে বিবেচনা করবার জন্য সরকারের কাছে প্রার্থনা জানালাম।

ছ'মাস অপেক্ষার পর কর্ণেল সাহেব বললেন যে সরকার আমার মুক্তিপণ বাবদ টাকা দেবেন; এবং আমার বা শাহর সেনাদলের অন্য কোন সিপাহীর কত মাইনে পাওনা আছে তার কোন হিসাবপত্র না থাকায় সে টাকা পাওয়া যাবে না। তবে যদি আমাদের পুরনো রেজিমেণ্টের কোন অফিসার কাবুল থেকে ইংরাজ বাহিনী পিছিয়ে আসার সময় আমাদের কতদিনের মাইনে বাকী ছিল বলতে পারেন তবে সে টাকা আমাদের দেওয়া হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

কাবুলে যেদিন গোরা সৈন্যদলে যোগ দিই সেই দিনই আমাদের রেজিমেণ্টের অফিসারদের শেষবারের মত দেখেছিলাম। ভাবলাম ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই তাদের মৃত্যু হয়েছে। যাদের নাম মনে পড়ল তাদের কথা কর্ণেল সাহেবকে বললাম; কিন্তু তিনি তাঁরা কে কোথায় আছেন বলতে পারলেন না। সরকারের কাছ থেকে মুক্তিপণ পেয়েছি এই আমার পরম সৌভাগ্য। এ সবই কর্ণেল সাহেবের দয়া। তিনি আমার পিতৃতুল্য। তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া এ আমি কখনই পেতাম না। এখন আমি আবার জাতে উঠেছি এবং অফিসাররা আমাকে ভালচোখে দেখেন। এ সত্বেও রেজিমেণ্টের অন্য সিপাহীরা আমাকে ঈর্ষা করত। রেজিমেণ্টে ফিরে আসার পর আমি একজন নায়েক ও এক সিপাহীর চাকরির উন্নতিতে বাধা দিয়েছিলাম। কাবুলে থাকার সময় আমি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছি এবং গোরা সৈন্যদের সঙ্গে গরুর মাংস খেয়েছি এই রকম নানা কথা আমাকে লক্ষ্য করে তারা বলত।

আফগানিস্থানে সরকারের বিপর্য্যয়ের কথা সারা ভারতের লোকে বলাবলি করতে লাগল, অনেকেই বলতে লাগল ইংরাজদের সে যুদ্ধে কখনই হারান যাবেনা এমন মনে করা ভুল। বিশেষ করে দিল্লীর লোকেরা এই রকমই ভাবত। আমার মনে হয় এই সময় থেকে মুসলমানদেরও ধারণা হল যে তারাও ভবিষ্যতে একদিন ইংরাজদের এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। সিপাহীরাও খুব অসন্তুষ্ট; তাদের ভয় আবার হয়ত যে কোন সময় সিন্ধু নদ পার হয়ে অন্য দেশে যাবার আদেশ হবে। তারা অভিযোগ করল যে-সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার তাদের আফগানিস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন তার কোনটিই পালন করা হয় নি। এখন তারা নিজের দেশে ফিরে এসেছে; কিন্তু কিছুই তাদের লাভ হয় নি—না চাকরিতে কোন উন্নতি, না কোন 'ইনাম' (পুরস্কার)। মুসলমানেরা

বড়াই করত যে তারা আসলে কাবুল এবং পারস্য দেশ থেকে এসেছে, এবং ইংরাজ সরকার ও আফগান দু'পক্ষকেই তারা যুদ্ধে হারাতে পারে। দিল্লীর বাদশাহর দরবার থেকে কয়েকজন আমাদের 'লাইনে' এসে সিপাহীদের মনোভাব বোঝবার চেষ্টা করে। কত সহজে ইংরাজ সরকার কাবুল পুনরধিকার করেছেন সিপাহীদের মুখে এই কথা শুনে তারা বলেছিল ফিরিঙ্গী সেনারা যদি এমন তাড়াতাড়ি না গিয়ে পড়ত তাহলে দ্বিতীয় সেনাদলটিও—প্রথম দলটির মতই—ঐ ভীষণ শীতে সহজে ধ্বংস হত। আগেই বলেছি রেজিমেণ্টের লোকে আমাকে সন্দেহ করত। এই বিষয়ে আমি নিজে তাই কোন কথা বলিনি; তা নিয়ে লোকে প্রকাশ্যে বলাবলি করত শুনতাম।

কোয়ার্টার মাস্টার সাহেবকে এই কথা বলায় তিনি তা হেসে উড়িয়ে দিলেন। কর্ণেল সাহেবকে সব বললাম; তিনি আমার কথা মন দিয়ে শুনলেন। তাঁর ধারণা বিদ্বেষবশতঃ রেজিমেণ্টের বিরুদ্ধে এই সব কথা আমি বলছি। আমাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন এমন কোন কথা তাঁকে যেন আর কখনও না বলি। এ ভাবে তিরস্কারের পর নিজের ক্ষতি হতে পারে ভেবে আর কোন সাহেবকে কিছু বললাম না।

আফগান যুদ্ধ ও সিন্ধু অভিযানের পর দিল্লী থেকে ফিরোজপুর পর্য্যন্ত সর্বত্র সরকারের রেজিমেণ্টের সিপাহীরা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু সরকারের সৌভাগ্যক্রমে কাজে কিছুই হল না। সিপাহীরা অভিযোগ করল সিন্ধু গেলে বেশী টাকা দেওয়া হবে বলা হয়েছিল; কিন্তু সেখানে যাবার পর জানান হয় তা ভুলক্রমে বলা হয়েছিল; কিম্বা তা দেবার ক্ষমতা অফিসারদের নেই। কম্যাণ্ডিং অফিসাররা অবশ্য বলেছিলেন যে নিশ্চয়ই তাদের তা দেওয়া হবে। হুজুর, সেই সময় আপনি ভারতে ছিলেন, আপনি ত জানেন কয়েকটি রেজিমেণ্টে সত্যিই বিদ্রোহ হয়েছিল। চার পাঁচটি রেজিমেণ্টে প্রকাশ্য বিদ্রোহ হয়; কিন্তু প্রত্যেকটি সেনাদলেই গভীর অসন্তোষ বর্তমান। অনেকেই ভেবেছিলেন হয়ত সারা সেনাদলেই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়বে। সব ঘাঁটিতেই মুসলমান চরেরা লোককে উত্তেজিত করতে লাগল। আফগান পারসিক ও অন্যান্য চরেরা বলতে লাগল যদি সিপাহীরা বিদ্রোহ করে তাহলে কাবুল যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য তাদের দেশের লোকেরাও ফিরিঙ্গীদের বিপক্ষে সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দেবে। তারা আরও বলল যে তারা দিল্লীর বাদশাহকে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে বসাবে। প্রত্যেক রাজা এবং নবাবের কাছে লোক পাঠান হয়েছিল। তাদের বলা হয় এই প্রস্তাবে সায় দিলে ইংরাজদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তাদের সাহায্য করা হবে।

ইংরাজের বিরুদ্ধে অনেকেরই এমন অভিযোগের যে কারণ ছিল তা স্বীকার করতেই হবে। আমাকেও ত চাকরিতে উন্নতি ও বেশী মাইনের আশা দেওয়া

হয়েছিল; তার কোনটিই আমি পাইনি। সরকার অবশ্য দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য আমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন; সে কথা কোনদিন আমি ভুলব না।

সেই বছর সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষের আর কোন চিহ্ন দেখা গেল না। আফগান যুদ্ধের সময় সরকার নিজে ভয় পেয়েছিলেন তা দিল্লীর সবাই জানত। লোকের কাছে ক্ষমতা দেখানর জন্য তখন সরকার অকারণে বহুবার কামান ছোঁড়ার হুকুম দিয়েছিলেন। এতদিন প্রায়ই বলা হত যে যুদ্ধে সরকারকে হারান যাবে না, সে কথা যে কত ভুল তা কাবুলের বিপর্য্যয়ের পর ভালভাবেই প্রমাণ হল। লোকে আর পূর্বের মত ইংরাজদের ভয় করত না।

আরও একটি বছর কেটে গেল। এর মধ্যে সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ ও উত্তেজনার খবর ক্রমশঃ চাপা পড়ে যায়। এই সময় শোনা গেল সরকারের সঙ্গে শিখদের যুদ্ধ বাধবে। শিখদের তখন বিরাট সেনাদল, সেনারা সব সুশিক্ষিত এবং তাদের বিশ্বাস নিশ্চয়ই তারা 'আংরেজি' সেনাদের যুদ্ধে পরাস্ত করবে। আম্বালা ও লুধিয়ানায় সরকারের সিপাহীদের পাঠান হল; তারা সেখানে কিছুদিন ছাউনি করে রইল।

মনে হয় ইংরাজ অফিসাররা ভেবেছিলেন শিখেরা কখনও শতদ্রু নদী পার হয়ে এপারে আসতে সাহস করবে না, ওপারে দাঁড়িয়েই যত তর্জন গর্জন করবে। দেখা গেল তাদের অনেকে নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে আছে; তখনও পর্য্যন্ত কেউ এপারে আসেনি। অবশেষে একদিন হরিপত্তন নামে এক জায়গায় শিখ সওয়াররা শতদ্রু পার হয়ে এসে একদল ঘেসেড়াকে কেটে ফেলে ও সরকারের কিছু জিনিসপত্র লুট করে। ইংরাজের বিরুদ্ধে শিখদের বিরূপ মনোভাবের এই প্রথম প্রকাশ। তখনও সরকারের অফিসারদের ধারণা ছিল যে শিখেরা কখনও হিন্দুস্থান আক্রমণ করবে না।

ফিরোজপুরে আরও সৈন্য পাঠান হল। আমাদের রেজিমেণ্টের উপরে হুকুম এল সেখানে যেতে হবে। চারদিন কুচ করার পর আমরা সেখানে হাজির হলাম।

খালসা সেনাদের খুব নাম ডাক। ফরাসী সাহেবরা তাদের যুদ্ধ বিদ্যা শিখিয়েছেন, সরকারের সেনাদলের মত তাদেরও বন্দুক আছে, অনেক কামানও তাদের আছে। অধিকাংশ সিপাহীই শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ভয় পেল। সরকারে সেনাদলে কয়েকটি রেজিমেণ্ট ইউরোপীয় সৈন্য ছিল; তাদের দেখে সিপাহীদের মনে ভরসা হল। কিছুদিন পরে ফিরোজপুরে কয়েকজন সওয়ার ছুটে এসে খবর দিল যে প্রায় পাঁচ লক্ষ খালসা সৈন্য শতদ্রু নদী পার হয়ে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। কয়েকজন অফিসারকে তা দেখবার জন্য পাঠান হয়। তারা দেখে এসে বললেন যে খবরটি সত্য, তবে তাদের দলে কুড়ি হাজারের বেশী লোক নেই। ফিরোজপুরে সে সময় মাত্র সাত আটটি রেজিমেণ্ট সৈন্য ছিল; তাদের নিয়েই জেনারেল লিটলার

সাহেব শিখদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। শিখেরা কিন্তু ফিরোজপুরে না এসে সেখান থেকে পিছু হটে চলে গেল। এই দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। পরে শোনা গেল তারা নাকি ভেবেছিল সারা ক্যান্টনমেণ্টে 'মাইন' পাতা রয়েছে; সেখানে আক্রমণ করলে তারা সবাই উড়ে যাবে। এজন্য তারা সরকারের সঙ্গে সমতলদেশে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে ফিরোজপুর থেকে অল্পদূরে ভয়ানক গুলি গোলা ছোঁড়ার শব্দ পাওয়া গেল। সন্ধ্যায় শুনলাম সেখানে একটি যুদ্ধ হয়ে গেছে। কেউ বলল সরকারের সেনাদের হার হয়েছে এবং তারা আমাদের এই ঘাঁটির দিকে আসছে, কেউ বলল শিখেরাই পরাজিত হয়েছে এবং তাদের সব সৈন্য ধ্বংস হয়েছে। আবার একদল বলল কোন পক্ষই জয়লাভ করেনি; দুদলই যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। যাই হোক সন্ধ্যার সময় কয়েকজন অফিসার এলেন এবং তাঁদের কাছে জানা গেল যে সরকারের জয় হয়েছে এবং শিখদের অনেকগুলি কামান আমাদের হস্তগত হয়েছে।

ফিরোজপুরের সব সিপাহীকে এই সেনাদলে যোগ দিতে আদেশ হল। শিখদের চোখ এড়িয়ে আমরা রাত্রে ঘুরপথে কুচ করে চললাম; তারা তখন রাস্তার ধারে আমাদের উপর চড়াও হবার জন্যে তৈরী হয়ে বসেছিল। দীর্ঘ পথ কুচ করার পর পরের দিন দুপুর বারোটার সময় আমরা সরকারের সেই সেনাদলের সঙ্গে এসে যোগ দিলাম। তৃষ্ণায় সবার খুব কষ্ট হচ্ছে, পানীয় জলের বড় অভাব। পথশ্রমে সবাই ক্লান্ত, এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে লড়াই করা সম্ভব ছিল না। এ সত্ত্বেও তক্ষুনি হুকুম হল যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে হবে। শত্রু সৈন্যের গতিবিধি ঠিক মত বুঝতে না পারায় যুদ্ধ আরম্ভ হতে অনেক দেরী হল। এদিকে তখন দিনের শেষে চারদিকে সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসছে।

এবার লড়াই শুরু হল—যাকে বলে সত্যিকারের লড়াই। এর আগে এমন যুদ্ধ কখনও দেখিনি। খুব কাছ থেকে আমরা কামান ছুঁড়ছি; তার উত্তরে শত্রুরাও সমানে আমাদের উপর গোলা ছুঁড়ছে। এর পুর্বে সব যুদ্ধে দেখেছি কাছ থেকে দু একবার কামান ছোঁড়া হলেই সরকারের শত্রুরা পিছু হটে যেত। কিন্তু এই শিখ সৈন্যরা গোলার উত্তরে গোলা ছুঁড়ে চলল এবং প্রাণনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত কামান ছোঁড়া বন্ধ করত না। শত্রুপক্ষের রেজিমেণ্টের সামনে ও পিছনে দুদিকেই কামান; এমন প্রচণ্ড কামান আক্রমণের সামনে আমাদের সিপাহীরা এর আগে কখনও দাঁড়ায়নি। সরকারের কামানের আওয়াজ আর তেমন শোনা যাচ্ছে না এবং আমাদের বারুদের গাড়ীও সব উড়ে গেছে। দু তিনটি ইউরোপীয় রেজিমেণ্ট শত্রুর কামানের আক্রমণে পর্য্যুদস্ত হয়ে পিছিয়ে এল দেখলাম। যেন বর্ষার বৃষ্টিধারার মত অবিরাম গোলা বর্ষণ হচ্ছে। ইউরোপীয় সেনারা বিভ্রান্ত হয়ে

পড়েছিল। কয়েকদল সিপাহীও এভাবে পিছিয়ে এসেছিল। একটি ইউরোপীয় রেজিমেণ্ট ত একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মনে হল সরকার বুঝি আবার যুদ্ধে হেরে যাবেন। আমাদের অনেকেই বেশ ভয় পেয়েছিল।

অন্ধকার ক্রমেই গভীর হয়ে আসছে; এমন সময় ভীষণ চীৎকার শোনা গেল। শিখদের চীৎকার বলে ত মনে হল না। পরমুহূর্তেই দ্রুতবেগে সওয়ারদের ছুটে আসার শব্দ শুনতে পেলাম—৩নং Dragoons সরাসরি শত্রুব্যূহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের গোলন্দাজদের হত্যা করল। অত অল্প সময়ের মধ্যে এ সব ঘটল এবং সওয়ারদের গোলন্দাজদের উপর আক্রমণ করতে দেখে, যা এর পূর্বে কেউ কখনও শোনেনি, শিখেরা কামান ছেড়ে কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এখন চারিদিকে গভীর অন্ধকার, সরকারের সেনারা সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ করেছে। কিন্তু আমাদের শিবিরে আলো লক্ষ্য করে শিখ সৈন্যরা তখনও গোলা ছুঁড়ে চলেছে। আমাদের রেজিমেণ্টের নেতা ছিলেন জেনারেল লিটলার সাহেব। রাত্রের অন্ধকারে আমাদের পথ ভুল হল। পাছে আমরা শিখদের ছাউনিতে হাজির হই সেজন্য মাটিতে শুয়ে পড়তে বলা হল। কাবুল যুদ্ধের সময় রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে—সেদিনের মত আজ রাত্রেও আমাদের চারদিকে বিপদ। আলো জ্বালাতে সাহস হয় না, পাছে শত্রু গুলি ছোঁড়ে। পানীয় জল সহজে পাওয়া যায় না, কয়েকজনের কাছে সামান্য কয়েকটি চাপাটি ছিল; তা ছাড়া খাওয়ার আর কিছু নেই—সবাই মিলে তাই ভাগ করে নিলাম। সাহেবরা বললেন এই হচ্ছে আসল যুদ্ধ এবং শিখেরা বীর শত্রু। পরদিন সকালে কি ঘটবে তা ভেবে তাঁরাও খুব চিন্তিত। রাত্রে ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছে; ক্ষিদের জ্বালায় দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে; এ ছাড়া আমরা একেবারে চুপ করে আছি।

বেশ মনে আছে এই রাত্রে আমাদের পাশের রেজিমেণ্টের এক সাহেব গান গাইতে গাইতে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন; অন্য অফিসাররা বাধা দিলেও তিনি কিছুতেই নিরস্ত হলেন না। তিনি যে মদ খেয়ে উন্মত্ত ছিলেন তা নয়; এভাবে ফাঁকা জায়গায় একটু আরাম লাভের চেষ্টা করছিলেন। কি ভীষণ বিপদের মাঝে যে আমরা সেই রাত কাটিয়েছি। ইংরাজরা যুদ্ধ ক্ষেত্রেই দাঁড়িয়ে ছিল এবং শিখেরাও নিজেদের ঘাঁটি আগলে ছিল—জয় পরাজয়ের কোন মীমাংসা হয়নি।

সকাল বেলা ইংরাজ সেনারা আবার যুদ্ধের জন্য তৈরী হল; এবার শিখদের ঘাঁটি আক্রমণ করা হবে। রাত্রে যে রেজিমেণ্ট থেকে আমাদের দলটি পৃথক হয়ে পড়েছিল তার সঙ্গে পুনরায় আমরা মিলিত হলাম। গভর্ণর জেনারেল সাহেব নিজে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ানর সময় গোরা সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন এবং তাঁর দেহরক্ষীকে আমাদের বলতে বললেন আমরা যেন মরদের মত যুদ্ধ করি; জয় আমাদের হবেই।

গভর্ণর জেনারেল সাহেব এ সময়ে কেন যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন বুঝতে পারলুম না। কেউ বলল গভর্ণর জেনারেল সাহেবের ওপরওয়ালা হল জঙ্গী লাটসাহেব বা প্রধান সেনাপতি। তাঁরা দুজনেই এই যুদ্ধে উপস্থিত আছেন এবং গভর্ণর জেনারেল সাহেব প্রধান সেনাপতির আদেশমত কাজ করেছেন। শুনলাম গভর্ণর জেনারেল সাহেব বিলাতে একজন বড় জেনারেল ছিলেন এবং অনেক যুদ্ধে তিনি যোগ দিয়েছেন। এই রকম এক যুদ্ধে তাঁর একটি হাত নষ্ট হয়েছে। লর্ড গাউ (Gough) সাহেব গোরা লোকদের খুব প্রিয় ছিলেন। তিনি রেজিমেণ্টের কাছে এলেই তাঁকে দেখে সৈন্যরা আনন্দে চীৎকার করে উঠত।

ইউরোপীয় সৈন্যরা শত্রুর কামানের দিকে এগিয়ে যেতেই তারা সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। তারপর আমাদের গোলন্দাজ সৈন্যরা কাছে এগিয়ে গিয়ে শত্রুর উপর গোলা ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও খাদ্য অভাবে ইংরাজ সৈন্যরা ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; তারা শত্রুর পিছনে আর ছুটে যেতে পারল না। খালসা সৈন্যরা এক জায়গায় হেঁটে নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেল। তাদের তাঁবুর সব জিনিসপত্র ও একশটি কামান আমাদের দখলে এল। কিন্তু তাঁবুগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল; ফলে নানা জায়গায় বারুদ জ্বলে গিয়ে বিস্ফোরণ হতে থাকে। এই বিস্ফোরণে লুট করার সময় কয়েকজন লোক মারা যায়। যাই হোক লুট করে অনেক কিছু পাওয়া গেল—সর্দারদের রেশমী জামা কাপড় ও শাল এবং নানা রকমের সব অস্ত্রশস্ত্র। আগুনের হাত থেকে তাঁবুগুলিকে বাঁচাতে গিয়ে আমাদের অনেকে ভীষণভাবে পুড়ে গিয়েছিল।

এই ভীষণ যুদ্ধের পর ইংরাজ সৈন্যরা সব খাবার তৈরী করছে, এমন সময় বিপদের সঙ্কেত-বাঁশী বেজে উঠল। খবর এল শিখ সওয়ারদের সারা দলটি আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম আর নতুন সেনাদল আমাদের দিকে ছুটে আসছে। আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল। আমাদের বারুদ সব ফুরিয়ে গেছে। কাজেই কামানগুলি সব অকেজো হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু সরকারের কি পরম সৌভাগ্য! কি কারণে ঠিক বোঝা গেলনা শিখেরা হঠাৎ পিছিয়ে চলে গেল। এই দেখে আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম। কেউ বলল তারা নাকি হঠাৎ শুনেছিল যে তাদের পিছনে আবার একদল ইংরাজ সৈন্য আছে। যে কারণেই হোক না কেন কয়েক ঝাঁক গুলি ছোঁড়ার পরেই তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পালিয়ে যায়। বন্দুকের নাগালের মধ্যে না আসায় ইংরাজ সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করতে পারেনি। মনে হয় এই দলে প্রায় একলক্ষ সওয়ার ছিল; অনায়াসেই তারা আমাদের ঘিরে ফেলে একেবারে ধ্বংস করতে পারত। কেউ বলল সর্দার তেজ সিং যুদ্ধ করতে ভয় পেয়েছেন। সাহেবরাও আমাদের মতই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। খালসা সৈন্যদের এভাবে পিছিয়ে যেতে দেখে সিপাহীদের

মনোবল ফিরে এল ; তারা ভাবল সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস শিখদের আর নেই।

চারদিকে পরিখা খুঁড়ে ইংরাজ সৈন্যরা এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করল। তারা বড় কামানগুলি আসার অপেক্ষায় ছিল। শিখ সেনাদের পিছনেই একটি ইংরাজ বাহিনীছিল ; মনে হল তারাও এখন বহুদূরে—কারণ দশ দিন তাদের কোন খবরই পাওয়া গেলনা। কিছু দিনের মধ্যেই শুনলাম লুধিয়ানার কাছে একটি যুদ্ধ হয়েছে, সরকার পক্ষের তাঁবু ও কয়েকটি কামান শত্রুরা অধিকার করেছে। আরও একটি যুদ্ধের খবর পাওয়া গেল, তাতে নাকি শত্রুরা পরাজিত হয়েছে এবং আমাদের যে সব জিনিসপত্র তারা লুট করেছিল সেগুলি আবার পাওয়া গেছে। পরে দেখা গেল এই খবরটি সত্য।

মাসের প্রথম দিকে সমস্ত সরকারী সৈন্যরা এসে জমায়েৎ হল, বড় কামানগুলিও তখন এসে পোঁচেছে। এখন দলটি খুব বড়—ভারতে এর আগে এত বড় সেনাদল কেউ দেখেনি। শিখ সৈন্যদলেও প্রায় ষাট হাজার সিপাহী ও চারশ কামান আছে শুনলাম।

শিখ সৈন্যরা সোব্রাওনে কুচ করে গিয়েছে ; সেখানে একশটি কামান দিয়ে তারা তাদের ঘাঁটি আগলে বসে আছে। রাত্রে ইংরাজরা অগ্রসর হল এবং প্রত্যুষেই তারা শত্রুর ঘাঁটির কাছে হাজির হল। মনে হয় তারা আমাদের গতিবিধি টের পায়নি। তাদের শিবিরে খুব হৈ চৈ, বিশৃঙ্খলা সুরু হল এবং বিপদের সঙ্কেত বাঁশী বেজে উঠল। গোলন্দাজ সৈন্যরাই প্রথমে যুদ্ধ করে ; প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ হতে লাগল। শিখ সেনাদলের একটি অংশ নদীর ওপারে তাদের নিজেদের দেশে রয়েছে, আর একটি অংশ সরকারের রাজ্যের সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে ; নদীর উপরে তারা একটি নৌকার পুল তৈরী করেছিল। তিনঘণ্টা এভাবে যুদ্ধ চলার পর হুকুম হল শত্রুর কামানগুলি আক্রমণ করতে হবে। ফিরোজপুরের চেয়েও এখানে তারা প্রচণ্ড বেগে কামান ছুঁড়তে থাকে। তাদের আক্রমণে কয়েক দল ইংরাজ সৈন্য ত একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। এ সত্বেও অন্য সৈন্যরা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকে। কয়েকদল ইউরোপীয় সৈন্য কামানের দিকে ছুটে গেল ; তাদের পিছনে পিছনে কয়েকদল সিপাহীও গেল। খালসা সৈন্যরা আমাদের সিপাহীদের চেয়েও বলশালী বলে সিপাহীরা খালসাদের ভীষণ ভয় করত ; এ জানা সত্বেও অফিসাররা সিপাহীদের নিয়ে শত্রুর দিকে এগিয়ে চললেন। যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলির ধোঁয়ার মধ্যে আবার ৩নং Dragoons এর খোলা তলোয়ার ও শিরস্ত্রাণের চকমকানি দেখা গেল ; তারা আবার শত্রুর কামানের ঘাঁটির উপর আক্রমণ করেছে। ভারতে এর আগে এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর কখনও হয়নি।

অবশেষে একটি ভীষণ চীৎকার কানে এল। তা শুনে সরকারী সেনাদের মনে

হল পুলের উপর দিয়ে শিখ সৈন্যরা পশ্চাৎ অপসরণ করছে। পুলের দুদিকেই তারা কামান বসিয়েছিল। পাছে নিজেদের লোকের মৃত্যু হয় এজন্যে তারা এখন পুলের অপর দিক থেকে কামান ছুঁড়তে সাহস করল না। ভাগ ভাগ হয়ে তারা পুলের কাছে এগিয়ে চলল এবং অনেকগুলি রেজিমেণ্ট পুল পার হয়ে নিজের দেশে চলে গেল। সরকারের গোলন্দাজরা পুলের কাছে এগিয়ে এসে কামান ছুঁড়তে লাগল; ফলে শত শত লোক মারা পড়তে থাকে। পদাতিক সৈন্যরাও পুলের কাছে এসে গুলি ছুঁড়তে সুরু করে। খালসা সৈন্যরা কিন্তু এর জবাবে কোন গোলাগুলি না ছুঁড়ে নিজের দেশের দিকে এগিয়ে চলল। তাদের একজনও আমাদের কাছে এসে প্রাণভিক্ষা করেনি। পুলটির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সৈন্যরা এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় তা ভেঙ্গে পড়ল; হাজার হাজার শিখ সৈন্য নদীতে পড়ে গেল; নদীও সেখানে বেশ গভীর। পাছে স্রোতের টানে নৌকাগুলি ইংরাজদের দিকে হাজির হয় সেজন্যে অনেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। এমন মর্মন্তুদ মৃত্যুদৃশ্য আমি কখনও দেখিনি। নদীর জলে বাঁচার আশায় শত শত মানুষ একে অপরকে জড়িয়ে ধরছে, কেউ কেউ বা স্রোতের টানে একেবারে জলের নীচে তলিয়ে যাচ্ছে; আর উঠছে না।

এই পুলের কাছে অল্পের জন্য আমার প্রাণ রক্ষা হয়। আমাদের কোম্পানীর মাথার উপর একটি বড় গোলা ছুটে আসছে দেখে আমি চীৎকার করে সঙ্গীদের সাবধান করে দিই, গোলার আঘাত থেকে প্রাণ রক্ষার জন্যে যেখান থেকে আমরা সরে আসি গোলাটি ঠিক সেখানে এসেই পড়ে। ফলে পাঁচজন সিপাহী ও একজন হাবিলদার মারা যায়। হাবিলদারের মৃতদেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক সিপাহীর বন্দুক আমার বুকে এসে লাগে এবং আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। জ্ঞান ফিরে দেখি আমাদের রেজিমেণ্ট তখন সেখান থেকে চলে গেছে, আমার নড়বার ক্ষমতা নেই। সৌভাগ্যক্রমে একদল লোক আমাকে উদ্ধার করে; তারা আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে সেখানে এসেছিল।

এই যুদ্ধে সরকারের সেনাদল ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। একজন জেনারেল সাহেব মারা গিয়েছিলেন এবং প্রায় একশ' অফিসার হতাহত হয়েছিলেন। শিখ সৈন্যদের সমস্ত জিনিসপত্র আমরা অধিকার করেছিলাম এবং লুটতরাজও খুব হয়েছিল। শিখদের মাথায় লম্বা চুলের মধ্যে প্রায়ই টাকা লুকনো থাকত। কোন কোন সিপাহী এক একটি মৃতদেহ থেকে একশ' নানকসাহী[1] টাকা পেয়েছিল।

*১ এই টাকা শিখ সরকার চালু করেছিলেন। এই টাকার দাম কোম্পানীর টাকার চেয়ে কিছু বেশী ছিল।

এই সময় নদীতে হঠাৎ জোয়ার আসে। জোয়ার না এলে সরকারের সৈন্যরা আরও শত্রু নিপাত করত, কারণ এই সময় নদী পার হওয়া খুব কষ্টসাধ্য ছিল না। পুল ভেঙ্গে পড়ার পর জোয়ারের টানে নৌকাগুলি কয়েক মাইল দূর পর্য্যন্ত ভেসে যায়; এবং যেগুলি কাছাকাছি ছিল তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাই হোক দু এক দিনের মধ্যে আরও নৌকা সংগ্রহ করা হয় এবং আমাদের সৈন্যরা শতদ্রু নদী পার হয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশ করল।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক পরিচয়

ইতিহাস-চর্চ্চায় বিনয় সরকার—হরিদাস মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী, চাটার্জি এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। দাম দুই টাকা।

বিনয় সরকার মহাশয়ের বহুমুখী প্রতিভা ও মৌলিক চিন্তা দেশের কাছে যোগ্য স্বীকৃতি পায় নি এ অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার কথা। এ দুঃখ ও লজ্জার কিছুটা লাঘব করেছেন অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায়। "বিনয় সরকারের বৈঠকে"র সংকলনের পর "ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার" নামক পুস্তিকায় তিনি এই মনীষীর একদিককার সৃষ্টিমাহাত্ম্যের বিশদ আলোচনা করেছেন। ইতিহাসের রাষ্ট্রপঞ্জী থেকে সমাজবিশ্লেষণে উত্তরণ, ইতিহাসের গতিতে বহুবিধ প্রেরণার স্বীকৃতি, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার "সমরনিষ্ঠ, সংসারনিষ্ঠ, রাষ্ট্রনিষ্ঠ, হিংসানিষ্ঠ, শক্তিনিষ্ঠ" রূপায়ণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের অভিন্নতা নির্ণয়, ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের তথাকথিত জাতীয় ঐক্যের ধারণা খণ্ডন, রাষ্ট্রে জাতিগত ও ভাষাগত ঐক্যের অপ্রয়োজনীয়তা, বঙ্গ সংস্কৃতির অনার্য সত্তা ও লোকবৃত্তের উপর গুরুত্ব দান, ইত্যাদি বহু মৌলিক অবদানে বিনয় সরকারের ইতিহাসবেদ সমৃদ্ধ। তাঁর ঐতিহাসিক রচনা ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের পরিচয়-পুস্তিকাটি পড়লে বোঝা যায় কত দিককার কত রকমের তত্ত্ব ও তথ্য আয়ত্ত হলে তবে ঐতিহাসিকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় স্বদেশীযুগের ওপর গবেষণা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও বিশ্লেষণ শক্তির গুণে আলোচ্য বইটিও মূল্যবান হয়েছে সন্দেহ নেই। একটি মাত্র অভিযোগ, কোথাও কোথাও ভাষার দোষ পীড়া দেয়। বই-এর ভূমিকায় ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাভাষার আদ্যশ্রাদ্ধ করেছেন। যেমন: "কলিকাতার রাস্তায় বাঘ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে কিনা এবং সাপ দলে দলে তথায় বেড়াচ্ছে কিনা, ইহার জবাবদিহি করিতে আমাদের তৎকালে বিদেশে প্রাণান্ত হতে হতো।" লেখকের উক্তিও কোথাও কোথাও সংশোধনসাপেক্ষ, যেমন "অর্থশাস্ত্রীরূপে সমঝিতে অভ্যস্ত," "ভারতের প্রাক্-বৃটিশ জাতীয় আন্দোলনের যুগে," "গ্রন্থে উক্ত মত খোদাই করা আছে"—ইত্যাদি। বিনয় সরকার মহাশয় কোথাও কোথাও বাংলা ভাষার ওপর একটু বেশী জবরদস্তি করেছেন। সেটুকুর অনুকরণ না করলেই ভাল।

পরিশেষে একটি জিজ্ঞাসা আছে। লেখক বলেছেন নীট্‌শের দর্শন মনুসংহিতা দ্বারা প্রভাবিত। এ সম্বন্ধে তিনি ইতিহাসের পাতায় আলোকপাত করলে সুখী হব।

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বসু

রাজা গণেশের আমল—শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—শৈলশ্রী, ১।১।১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩৲ টাকা।

মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে রাজা গণেশ ছিলেন এক কীর্তিমান পুরুষ। লেখকের ভাষায়ঃ "একক কৃতিত্বের দিক দিয়ে গণেশের সঙ্গে খুব কম লোকেরই তুলনা চলত পারে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ছিল মুসলমানদের অধিকারে। এর মধ্যে কোন কোন সময় অঞ্চলবিশেষে হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু সমগ্র বাংলার সিংহাসন অধিকার এই একটিমাত্র হিন্দুর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গণেশ বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মত আবির্ভূত হয়ে অসাধ্যসাধন করেছিলেন; প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির বাধাকে জয় করে বাংলায় হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গণেশের কীর্তির অসামান্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত নাই।"

এই কীর্তিমান পুরুষের জীবনী ও কৃতিত্বের সামগ্রিক আলোচনা পূর্বে সম্ভব হয়নি। তথ্যের অপ্রচুরতা তার একমাত্র কারণ নয়। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবও তার জন্য দায়ী বলা যেতে পারে। সম্প্রতি রাজা গণেশ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব তথ্যের আবিষ্কারে গণেশের জীবনী আলোচনার পথ সুগম হয়েছে সন্দেহ নাই। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা তথ্যের বিচার ও বিশ্লেষণ করে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় রাজা গণেশ ও তাঁর আমলের যে বিবরণ দিয়েছেন, জ্ঞাত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তা সম্পূর্ণ বলে মনে করা যেতে পারে। বিনয় সহকারে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় পূর্বাচার্যদের ঋণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন তথ্যের আলোচনায় শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় যে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণীশক্তি প্রয়োগ করেছেন, তা তাঁর একান্ত নিজস্ব বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

পুস্তিকাখানি কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ বলে পুস্তিকাখানির অখণ্ড সামগ্রিকতার দাবী অস্বীকার করা চলে না। রাজা গণেশের মত কীর্তিমান পুরুষ, আর তাঁর আমলের কয়েকজন মহামনীষি পণ্ডিতের যথাযথ পরিচয় প্রবন্ধগুলিতে দেওয়া হয়েছে। লেখক সার্থকও হয়েছেন সে পরিচয়

প্রদানে। বাংলার রাজনৈতিক গগনে গণেশের ক্রমবর্দ্ধমান প্রাধান্য ও তাঁর একক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লেখকের আলোচনা (পৃ ৭-১৪) রীতিমত বিজ্ঞানসম্মত। লেখকের মত ঐতিহাসিকদের গ্রহণীয় হবে বলেই বিশ্বাস। গৌড়ের রাজদরবার কর্তৃক কবি ও পণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষকতার সূচনা রাজাগণেশের সময়েই হয় (পৃঃ ৪২) লেখকের এ সিদ্ধান্তও সার্থক। চীনা বিবরণীর সাহায্যে বাংলার সমসাময়িক ইতিহাসে নূতন আলোকপাত এ পুস্তিকাখানির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই বিবরণীর সাহায্যে চীন ও বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে লেখকের আলোচনা পুস্তিকা-খানির মূল্য বিশেষভাবে বর্দ্ধিত করেছে। কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয় সম্পর্কে চীনা বিবরণীর প্রমাণ ও লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। পুস্তিকাখানির সর্বত্র লেখকের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির স্বাক্ষর বিদ্যমান। অধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লেখক বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত এক অবহট্ট পদের অবলম্বনে মিথিলারাজ দেবসিংহ ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দের চৈত্রমাসের কৃষ্ণাষষ্ঠী তিথিতে (২৩শে মার্চ, ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে) পরলোক গমন ক'রেছিলেন বলে অনুমান করেছিলেন। পদটী জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেকারণে শুদ্ধিপত্রে তিনি এই পাদটীকা আর তৎসংশ্লিষ্ট ভুমিকার মন্তব্য বাতিল করে মন্তব্য করেছেন "দেবসিংহ ১৪১৩ খৃষ্টাব্দের পরেও যে বেঁচেছিলেন তার একাধিক প্রমাণ আমরা পেয়েছি।" এশিয়াটিক সোসাইটির একখানি পুথি (নং ৪৭৩৮) ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে (১৪১২-১৩) শিবসিংহের রাজত্ব কালে লিখিত হয়েছিল বলে আমাদের জানা আছে। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অসমীচিন নয় যে ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দের পূর্বেই দেবসিংহের মৃত্যু হয়েছিল। সেকারণে ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দের (২৯৩ লক্ষ্মণাব্দের) পরেও দেবসিংহ বেঁচেছিলেন লেখকের এ মন্তব্যের সমর্থক প্রমাণের উল্লেখ ও বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক বলে আমাদের মনে হয়।

পুস্তিকাখানিতে কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশই শুদ্ধিপত্রে সংশোধিত হয়েছে। অনবধানতাবশতঃ কয়েকটি প্রমাদ লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এইরূপ দুটী প্রমাদ সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। ১২৩ পৃষ্ঠার ২ পংক্তিতে "ত্রয়োদশ" স্থলে "চতুর্দশ" হইবে; আর ১৩৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় "১৪০৭-৮" এই তারিখটি "১৩০৭-৮" হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

মধ্যযুগের বাংলাদেশের এক গৌরবময় ইতিহাস পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট করে লেখক বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। পুস্তিকাখানি বাঙ্গালী পাঠকের নিকট যথাযোগ্য সমাদর পাবে এ আশা নিরর্থক নয়।

শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী

আচার্য যদুনাথের মহাপ্রয়াণে শোকসভা

গত সোমবার, ১৯শে মে, আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। ২২শে মে শ্রীযুক্ত সুশোভন সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদে অনুষ্ঠিত শোকসভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

"বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের এই সভা আচার্য যদুনাথ সরকারের মহাপ্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। আচার্য যদুনাথ ভারতের অগ্রগণ্য ঐতিহাসিক। ইতিহাস সাধনায় তিনি যে একাগ্র নিষ্ঠা, অসাধারণ শ্রমশক্তি, অনমনীয় ধৈর্য ও অপরিমেয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত অজ্ঞাত সব গ্রন্থ, দলিল ও চিঠিপত্র হইতে তথ্য সন্ধান করিয়া তিনি ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস—বিশেষতঃ মোগল ও মারাঠা ইতিহাস—সযত্নে রচনা করিয়াছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিরন্তর গবেষণায় রত থাকিয়া আচার্য যদুনাথ ইতিহাসপ্রেমীদের সমক্ষে এক মহান আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস পরিষদের প্রথম দিন হইতেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। তাঁহার তিরোধানে আমরা তাই আত্মীয়বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি। তাঁহার আত্মা সাধনোচিত-ধামে শান্তিলাভ করুক, ভগবানের কাছে আমাদের ইহাই প্রার্থনা।"

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের ৮নং ফরম অনুযায়ী বিবৃতি—

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা—বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ, ৪৭।এ একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

২। প্রকাশের কাল—ত্রৈমাসিক ; ভাদ্র হইতে বর্ষ আরম্ভ।

৩। মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীমুরারিমোহন কুমার ; ভারতীয় ; শতাব্দী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ৮০ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪

৪। প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ ; ভারতীয় ; ৪৭।এ একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

৫। সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ; ভারতীয় ; ৪ বিপিন পাল রোড, কলিকাতা-২৬ ; শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ ; ভারতীয় ; ৪৭।এ একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ, ৪৭।এ একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

আমি, শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর—**শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ**

তারিখ—২৬-৫-৫৮

প্রকাশক—'ইতিহাস'
ত্রৈমাসিক পত্রিকা

অষ্টম খণ্ড চতুর্থ সংখ্যা ১৩৬৪-৬৫

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

ইতিহাস

সম্পাদকঃ

শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রী নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ

৪৭-এ, একডালিয়া রোড :: কলিকাতা-১৯

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ

কর্মকর্তামণ্ডলী

সূচীপত্র

ঐতিহাস

অষ্টম খণ্ড] জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, ১৩৬৫ [চতুর্থ সংখ্যা

আচার্য যদুনাথ সরকার

নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর রাজশাহী জেলার অন্তর্গত করচমারিয়া গ্রামে আচার্য যদুনাথ সরকার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজকুমার সরকার ছিলেন জমিদার; শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। নিজ গৃহে রাজকুমারের একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থাগার ছিল, ইতিহাস ও সাহিত্যের অনেক বই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। সে সময় যে সব ইংরেজ সিভিলিয়ান্ মফঃস্বল শহরে কাজে নিযুক্ত হতেন, তাঁরা সাধারণতঃ নিজেদের সঙ্গে অনেক বই নিয়ে যেতেন। কাজের পর গ্রন্থপাঠই ছিল তাঁদের অবসর বিনোদনের উপায়। Clarendon, Robertson, Hume, Gibbon, Macaulay, Carlyle, Motley, Froude, Lecky, Green প্রভৃতি ঐতিহাসিকের গ্রন্থ ছিল তাঁদের প্রিয়পাঠ্য। সে সময় ইতিহাস ছিল সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত; ইতিহাস পৃথক ভাবে পাঠ করা হত না। কাজ থেকে অবসর গ্রহণ বা ছুটিতে যাওয়ার সময় এই সব সিভিলিয়ানরা কখনও কখনও নিজেদের বই বিক্রি করে দিতেন। এই সুযোগে রাজকুমার ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস এবং এমন কি যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। রাজকুমারের এই গ্রন্থাগার উত্তরকালে তাঁর পুত্রের জীবন ও মননকে যে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে যদুনাথের বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজী ও ইতিহাসে প্রথম

শ্রেণীতে অনার্স সহ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ কলেজ থেকেই তিনি ইংরেজী সাহিত্যে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কলেজের ছাত্রাবস্থায় তাঁর মনে অধ্যয়নের প্রতি গভীর অনুরাগ দেখা দেয়। ছুটিতে বাড়ীতে থাকার সময় পিতার গ্রন্থাগারে যদুনাথ মনোযোগ সহকারে ইতিহাসের বই পড়তেন। এই গ্রন্থাগারেই যদুনাথের মনে ইতিহাস-প্রীতির বীজ উপ্ত হয়। বি. এ. পরীক্ষার পর যদুনাথ টিপু সুলতান সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করেন। ইতিহাস রচনায় ইহাই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। সে সময় ইংরেজী ভাষায় লেখা বই ছাড়া আর কোনরূপ আকর-গ্রন্থ ছিল না। শুধুমাত্র এইরূপ গ্রন্থের তথ্যের উপর নির্ভর করে যদুনাথ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংরেজীর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে ইংরেজীর পরিবর্তে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপনা সুরু করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যদুনাথ প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পর ১৯২৬ থেকে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত—এই দীর্ঘ সময়ের ভারতের ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন। মুঘল-যুগ সম্বন্ধে তাঁর প্রথম গ্রন্থ India of Aurangzib ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে Fall of the Mughal Empire গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে মুঘল যুগ সম্বন্ধে যদুনাথের গবেষণা শেষ হয়, প্রায় দু'শতাব্দী ব্যাপী ভারত-ইতিহাসের অজ্ঞাত ও দুর্লভ তথ্য ও উপকরণ তিনি ফার্সী পুঁথি-পত্র, রাজস্থানী নথিপত্র, পর্তুগীজ দলিল, ইংরাজ-কুঠির নথিপত্র, মারাঠী বখর ও পত্রাবলী, ফরাসী ভাষায় লেখা ব্যক্তিগত স্মৃতিচিত্র, প্যারিসের Bibliotheque Nationale ও ভারতের সরকারী মহাফেজ-খানায় রক্ষিত দলিলপত্র সমূহ থেকে সংগ্রহ করেছেন। বস্তুতঃ কোন সিদ্ধান্তে আসবার পুর্বে তিনি প্রতিটি মুলগ্রন্থ পাঠ ও নথি-পত্রের তথ্য ভাল রূপে বিচারবিশ্লেষণ করে দেখেছেন। কি অসীম ধৈর্য, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে তাঁকে উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। এই সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

'আলমগীরনামা' নামে ফার্সী ভাষায় লেখা একটী গ্রন্থে মীর্জা রাজা

জয়সিংহের পুরন্দর অভিযানের কাহিনীর বিবরণ আছে। পুরন্দরে শিবাজীর পরাজয় সম্বন্ধে অবশ্য অনেক মারাঠী কাহিনী আছে। কিন্তু সে সবই পরবর্তী কালের রচনা; কাজেই তা তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। মারাঠা ইতিহাস রচনা করবার সময় যদুনাথের মনে হয় যে নিশ্চয়ই এ দু'য়ের মাঝে কিছু অজানা তথ্য আছে, তা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর মন শান্ত হয়নি। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্যারিসে Bibliotheque Nationale এ ফার্সী ভাষায় লেখা একটি পুঁথির সন্ধান পান। তাতে জয়সিংহের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়েছিল তা পাওয়া যায়। কিন্তু পুরন্দর অভিযানের কথা সুরু হওয়ার পরেই আর কোন চিঠির উল্লেখ নেই। জয়পুরে সরকারী পুঁথিশালাতেও এই পত্রাবলীর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। জয়সিংহের চিঠিপত্র তাঁর কর্মসচিব উদিরাজ মুন্সীর কাছে গচ্ছিত ছিল। উদিরাজ জয়সিংহের মৃত্যুর পর মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। উদিরাজের পুত্র পত্র-রচনার আদর্শ রূপে এই চিঠিগুলি *Insha-i-Haft Anjuman* নামে একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পরেও কোথাও সেই গ্রন্থটি পাওয়া গেলনা। যদুনাথ কিন্তু নিরাশ হন নি। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেনারসে এই পুঁথির একটি প্রতিলিপি উদ্ধার করেন। দুপাশে মলাটের মাঝে চাপ পড়ে পাতাগুলি সব জুড়ে গিয়ে পুঁথিটি একটি কার্ড-বোর্ড বাক্সের আকার ধারণ করেছিল। পাতাগুলি খুলতে তাঁর অনেক সময় লেগেছিল। এই ভাবে দীর্ঘকাল ধৈর্যসহকারে অনুসন্ধানের পর যদুনাথ জয় সিংহের জন্যে লেখা উদিরাজ মুন্সির চিঠিগুলির উদ্ধার সাধন করেন। পরে অবশ্য লক্ষ্ণৌএ এই পুঁথির একটি প্রতিলিপি আরও ভাল অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

আচার্য যদুনাথের লেখা গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—History of Aurangzeb ১ম-৫ম খণ্ড; Studies in Aurangzeb's reign; Shivaji and his Times; House of Shivaji; Fall of the Mughal Empire ১ম-৪র্থ খণ্ড; History of Bengal. ২য় খণ্ড (১৫৫৫ খৃঃ হইতে ১৭৫৭ খৃঃ পর্যন্ত অধ্যায়টি যদুনাথের রচনা)। তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী Modern Review, প্রবাসী, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Proceedings of the Indian Historical Records Commission, Bengal Past and Present,

Journal of Bihar and Orissa Research Society, Islamic Culture এবং ইতিহাস প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন।

আচার্য যদুনাথ ভারতীয় গবেষকদের অধ্যাপক Buryর সম্পাদিত Gibbon-এর Fall of the Roman Empire গ্রন্থটি পাঠ করতে উপদেশ দিয়েছেন। গিবনের মূল গ্রন্থটির রচনাকাল ১৭৭৬-৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। অধ্যাপক Buryর সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই দুটি সংস্করণ তিনি ভালভাবে মিলিয়ে পাঠ করতে বলেছেন। গিবনের লেখার পর একশ' বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল। এই সময়ে রোম সাম্রাজ্য সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্বেও অধ্যাপক Bury এমন কোন নতুন তথ্য খুঁজে পাননি, যা গিবন উল্লেখ করেননি। কিন্তু এ বিচার পদ্ধতিতে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। অধ্যাপক Buryর সিদ্ধান্ত অনেকাংশে শুধুমাত্র ইউরোপীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে রোমের সম্পর্ক সম্বন্ধে সত্য। আরবী ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত Stanley Lanepool দেখিয়েছেন যে গিবনের গ্রন্থে ইসলাম সম্পর্কীয় অধ্যায় গুলিতে অনেক তথ্যগত ভুল রয়েছে। ইসলাম সম্বন্ধে সঠিক বিচার করতে হলে আরবী বা ফার্সী ভাষা জানা একান্ত দরকার। গিবন এর কোনটিই জানতেন না। ইসলাম সম্বন্ধে গিবন কেবলমাত্র ল্যাটিন, ফরাসী বা ইংরেজী ভাষায় লেখা খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের রচনা পাঠ করেছেন। আকর-গ্রন্থ পাঠের সুযোগ না পাওয়ায় গিবনের পক্ষে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনায় তাঁর বিদ্যাবত্তার সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি। আচার্য যদুনাথ গবেষণার ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি—মূল গ্রন্থ পাঠ করে তথ্য বিচার—অনুসরণ করতে উপদেশ দিয়েছেন।

জাতীয় ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করার সময় যদুনাথ William Irvine এর নিকট নির্দেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন Irvineএর অনুরক্ত; Irvineএর নীতি ছিল যে কোন ঐতিহাসিক সমস্যা বা সিদ্ধান্ত সবদিক থেকে তথ্যসংগ্রহ করে বিচার করে দেখা। কিন্তু Irvine এর সঙ্গে যদুনাথের পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। যদুনাথের বিশ্বাস ছিল যে ইতিহাস কেবলমাত্র বিভিন্ন ঘটনার তথ্যপঞ্জী নয়; তথ্য যেমন

নির্ভুল হওয়া দরকার, তেমনি তাকে মনোজ্ঞ করে প্রকাশ করতে হবে। স্বভাবতই যতুনাথের রচনারীতি ছিল অতি প্রাঞ্জল। Irvine নিজেও যতুনাথের রচনার প্রসাদগুণ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। আওরঙ্গজেব গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে Irvine লিখেছেন, "বইটির রচনা শৈলী আমার ভাল লেগেছে। একদিকে আমার Later Mughals গ্রন্থের তথ্যভারাক্রান্ত নীরস রচনা ও অন্যদিকে সাংবাদিক সুলভ চটুল প্রকাশভঙ্গী, এ তুয়ের মধ্যপথ তিনি গ্রহণ করেছেন; কিন্তু কোথাও তথ্যের বিকৃতি ঘটেনি।" গজনী থেকে চাটগাঁ এবং কাশ্মীর থেকে কর্ণাটক পর্যন্ত এই বিশাল জনপদের ১৬৫৮ হইতে ১৭০৭ খৃঃ পর্যন্ত অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী সময়ের সমগ্র ইতিহাস আচার্য যতুনাথ সবিস্তারে রচনা করেছেন। শুধু ঘটনার বিচিত্র গতি প্রবাহ নয়—তাহার অন্তরালে এই ইতিহাসের নায়ক নায়িকাদের আশা, আশঙ্কা, কর্মনীতি ও নিয়তির সম্পূর্ণ চিত্র তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কুশলী নাট্যকারের মত ঐতিহাসিক যতুনাথ আওরঙ্গজেবের জীবনের করুণ পরিণতির ইতিহাস রচনা করেছেন। যতুনাথের রচনায় ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ও রচনাশৈলী—এই তু'য়ের অপূর্ব মিলন আমরা লক্ষ্য করি।

যতুনাথের বিশ্বাস ছিল যে ইতিহাসের ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে না দেখা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। মুঘল ও মারাঠা ইতিহাসের সমস্ত ঘটনা তিনি সযত্নে ও সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন; সামান্য ঘটনা পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু এরূপ বর্ণনাই তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় নয়। তাঁর বইগুলি পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায় যে কি গভীর নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে আচার্য যতুনাথ একের পর এক সমস্ত ঘটনা সাজিয়েছেন, একটি বিষয়ে মতামত দেওয়ার পূর্বে তাঁকে কত পুঁথিপত্র পাঠ করতে হয়েছে এবং এমন কি কোন একটি স্থানের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করবার জন্যে তাঁকে কতবার Survey of Indiaর বিভিন্ন মানচিত্র পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে। Fall of the Mughal Empire এর তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "এই গ্রন্থের একটি মাত্র পৃষ্ঠা লেখার পূর্বে আমাকে মারাঠা দরবারের শত সহস্র কাগজ ও চিঠিপত্রের তারিখ সঠিক ভাবে নির্দ্ধারণ, ও ফার্সী পুঁথিগুলির পাঠোদ্ধার ও সেগুলিকে কালানুক্রমে সাজিয়ে নিতে হয়েছে।" কিন্তু এমন ঘটনার ভীড়ে তাঁর

রচনা-শৈলী কোথাও ব্যাহত হয়নি। কলস্বনা তটিনীর মত তা সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলেছে। মুঘল-যুগের একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আওরঙ্গজেবের রাজত্ব কালের আকর-গ্রন্থ সমূহ পাঠ করে মন্তব্য করেছেন যে তিনি এই সময়ের এমন কোন ঘটনা লক্ষ্য করেন নি যা যদুনাথের দৃষ্টি এড়িয়েছে।

Fall of the Mughal Empire এর দ্বিতীয় খণ্ড উত্তর ভারতে আফগান মারাঠা সংঘর্ষের ইতিহাস। রণনীতি ও রণকৌশল সম্বন্ধে যদুনাথের যে কি গভীর জ্ঞান ছিল তা এই বইটি পাঠ করলে জানা যায়। সাধারণতঃ বড় বড় ঘটনার ভীড়ে ছোট ছোট কাহিনীর বৈচিত্র সহজে আমাদের চোখে পড়েনা। ঐতিহাসিক যদুনাথ সম্ভবতঃ Clausewitzএর নীতি অনুসরণ করেছেন। Clausewitz-এর মতে যুদ্ধ কোন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পৃথিবীর আর সব ঘটনা যেমন একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে, তেমনি সমস্ত ঘটনার সঙ্গেই আবার যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। কোন একটি ঘটনা তা সে যত সামান্যই হোক না কেন, সমগ্র কাজটির উপর তার প্রভাব আমরা লক্ষ্য করে থাকি। পাণিপথের যুদ্ধ বর্ণনা করার সময় যদুনাথ যুদ্ধের পূর্বেকার সমস্ত ঘটনা এবং প্রতিটি ঘটনার সকল দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এ রকম ভাবে যুদ্ধের ইতিহাস বিচার ভারতবর্ষে যদুনাথই প্রথম করেছেন।

কিন্তু একথা মনে করা ভুল যে আচার্য যদুনাথ কেবল মাত্র শাহজাহান থেকে শাহ আলমের রাজত্বকাল পর্যন্ত দিল্লীর বাদশাহী আমলের ইতিহাস রচনা করেছেন। যদুনাথ মারাঠা জাতির ইতিহাস—প্রথমে শিবাজী ও তাঁর বংশধরগণের কথা (১৬২৬—১৭০৭), পরে পেশোয়াদের কাহিনী (১৭৪০—১৮০৩) সযত্নে রচনা করেছেন। শিবাজীর জীবনী লেখবার পূর্বে তাঁকে আটটি বিভিন্ন ভাষায় লেখা বই ও দলিল পত্র সব পাঠ করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। শিবাজীর 'হিন্দ স্বরাজের' স্বরূপ তিনি ব্যাখা করেছেন। শিবাজীকে তিনি স্বদেশ প্রেমিক দেশনায়কের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মহারাষ্ট্র দেশের ঐতিহাসিকগণ সাধারণতঃ কেবল তথ্য সংগ্রহেই কালাতিপাত করেছেন; কয়েকজন আবার Grant Duffএর গ্রন্থের শত সহস্র ভুল নির্দেশ করাই তাঁদের কাজ বলে মনে করেন। যদুনাথই

প্রথম শিবাজী চরিত্রের মহিমা ও মারাঠা জাতির এই গৌরবময় কীর্তির সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক অতীত কাহিনীতে প্রাণসঞ্চার করে তাকে সঞ্জীবিত করে তোলেন। ইতিহাসের নায়ক নায়িকাদের, আশা, আশঙ্কা, ও কার্যকলাপের কাহিনীকে প্রাণময় ও বৈচিত্র্যময় করে তোলা ঐতিহাসিকের কর্তব্য ; যাতে আমরা ঘটনার গতি পরিণতি সম্যক-রূপে উপলব্ধি করতে পারি। এমনি প্রাণময় করেই যত্নাথ মারাঠা ইতিহাসের শত শত কাহিনী বর্ণনা করেছেন—মাহাজদী সিন্ধিয়ার আর্থিক সঙ্কট, তুকোজী হোলকারের বিরুদ্ধাচরণ, নানা ফড়নবীশের শঠতা, ইসমাইল বেগের বীরত্ব, দৌলত রাও সিন্ধিয়ার উচ্ছৃঙ্খলতা ও অস্থিরতা, যশোবন্ত রাও হোলকারের প্রতিহিংসা এবং উচ্চাভিলাষ, বাজীরাওএর নৃশংসতা রঘুজী ভোঁসলার ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা, পেরণের কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতা, শাহ আলমের লোভ ও অনাচার। স্বাধীন মারাঠা শক্তির শেষ দশ বছরের ইতিহাস শুধু গৃহযুদ্ধের কাহিনী—দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও লাখওয়া দাদার মধ্যে স্বার্থসংঘাত ; দৌলতরাও ও যশোবন্তরাওএর মধ্যে নেওরি ও সাতওয়াসের যুদ্ধ, উজ্জয়িনী ও ইন্দোরের যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘর্ষ ; বারমতি ও হাদাসপুরে যশোবন্তরাও হোলকার ও দ্বিতীয় বাজীরাও এর মধ্যে যুদ্ধ। এই গৃহযুদ্ধের পরিণতি হল মারাঠাজাতির স্বাধীনতা বিসর্জন। যত্নাথ সবিস্তারে মারাঠা জাতির উত্থান ও পতনের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

আচার্য যত্নাথ একবার বলেছিলেন যে ‘ইতিহাসে গবেষণার উদ্দেশ্যই হ'ল অগ্রগতি।’ তিনি একেবারে আকর-গ্রন্থ ও নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিটি ঘটনা ও সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তথ্য যাতে নির্ভুল হয় সে বিষয়ে তিনি সদা সতর্ক ছিলেন ; এই কারণে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে ভারত-ইতিহাসের মুঘল ও মারাঠা যুগের গবেষণা ক্ষেত্রে আচার্য যত্নাথ আপন আসনে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত থাকবেন। জমি থেকে শস্য সংগ্রহের পরেও অনেক সময় কিছু শস্য-কণা পড়ে থাকে। সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দীর যে রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস তিনি লিখেছেন তাতে তাঁর পরে তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রে সামান্য কিছু সংগ্রহের অবকাশ মাত্র তিনি রেখেছেন ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য।

* **Bengal Past & Present, January to June, 1958,** সংখ্যা থেকে শোভন বসু এই অনুবাদ করেছেন।

আচার্য যদুনাথের রচনাপঞ্জী

স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত,

বাংলা গ্রন্থাবলী

১। সিয়ার-উল্-মুতাখ্খরীন্ : অনুবাদক গৌরসুন্দর মিত্র (সম্পাদিত)। কার্তিক ১৩২২ (ইং ১৯১৫)। পৃ ৪০—অসম্পূর্ণ।

২। শিবাজী, (নভেম্বর ১৯২৯)। পৃ ২৬৪।

৩। মারাঠা জাতীয় বিকাশ (সরল কাহিনী)। আষাঢ় ১৩৪৩ (ইং ১৯৩৬)। পৃঃ ৪৮। সূচী : মারাঠা জাতির অভ্যুদয়, শিবাজী, শিবাজীর পর মারাঠা ইতিহাসের ধারা। মহারাষ্ট্রে সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনী।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা রচনা

১৩০২, বৈশাখ	··· 'সুহৃদ্'	···	হরিদ্বার ও কুম্ভমেলা ৮১ বৎসর পূর্বে
১৩১১, কার্তিক	··· 'প্রবাসী'	···	আওরাঙ্গজিবের আদি লীলা
১৩১২, আষাঢ়	··· 'নবনূর'	···	সাধু-বচন
অগ্রহায়ণ	··· 'প্রবাসী'	···	কবি-বচন-সুধা
পৌষ	··· ঐ	···	চাটগাঁ ও জলদস্যুগণ
মাঘ	··· 'নবনূর'	···	একজন বাঙ্গালী মুসলমান বীর
১৩১৩, জ্যৈষ্ঠ	··· 'প্রবাসী'	···	শায়েস্তা খাঁর চাটগাঁ অধিকার
অগ্রহায়ণ	··· ঐ	···	শাহজাহানের রাজ্যনাশ
		···	"সোনার তরী"র ব্যাখ্যা
১৩১৪, আষাঢ়	··· 'ভারত-মহিলা'	···	সতি-উন্-নিসা
ভাদ্র	··· 'প্রবাসী'		দুই রকম কবি—হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ
১৩১৫, ভাদ্র	··· ঐ	···	সিয়ার-উল-মুতাখ্খরীন্
আশ্বিন	··· ঐ	···	খুদাবক্স খাঁ বাহাদুর
১৩১৬, ফাল্গুন	··· ঐ	···	মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ
		···	বঙ্গভাষীদের জন্য বিহারে কলেজ স্থাপন (মথুরানাথ সিংহের নামে প্রকাশিত)

ফাল্গুন···ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ—মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ

* শ্রীপুলিনবিহারী সেন ব্রজেন্দ্রনাথের পুস্তিকাটি সংগ্রহে সাহায্য করেন।

১৩১৭, মাঘ ··· 'প্রবাসী' ··· বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য
২য় সংখ্যা ··· 'রঙ্গপুর সাহিত্য···মালদহ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির ভাষণ
পরিষৎ পত্রিকা'

১৩১৮, আশ্বিন ··· 'প্রবাসী' ··· বাদশাহী গল্প
অগ্রহায়ণ ··· 'জাহ্নবী' ··· ৺রজনীকান্ত সেন

১৩২০, শ্রাবণ ··· 'প্রবাসী' ··· পূর্ব-বঙ্গ (সমালোচনা)

১৩২১ কার্তিক ··· ঐ ··· মুর্শিদ কুলী খাঁর অভ্যুদয়

১৩২২, বৈশাখ ··· ঐ ··· বর্দ্ধমান বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে ইতিহাস-শাখার সভাপতির ভাষণ (১৩৫৫, আশ্বিন 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত)
শ্রাবণ ··· ঐ ··· বাঙ্গালার ইতিহাস (সমালোচনা)

১৩২৩, বৈশাখ ···'মানসী ও মর্ম্মবাণী'··· আওরাংজীবের পরিবারবর্গ
আষাঢ়-শ্রাবণ··· 'ভারতবর্ষ' ··· উইলিয়ম আর্ভিন, আই. সি. এস.
মাঘ ··· 'প্রবাসী' ··· পাটনার প্রাচীন চিত্র
ফাল্গুন ··· 'ভারতবর্ষ' ··· পাটনার কথা

১৩২৪, আষাঢ় ··· 'প্রবাসী' ··· প্রবাসী বাঙ্গালী ও বঙ্গ-সাহিত্য
শ্রাবণ ··· ঐ ··· বিশ্ব-বিদ্যা সংগ্রহ
ভাদ্র ··· 'ভারতবর্ষ' ··· 'বাঙ্গলার বেগম' ২য় সংস্করণ (সমালোচনা)

১৩২৬, আশ্বিন ··· 'প্রবাসী' ··· প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ (১৩৫৫, আষাঢ়ের 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত)
কার্তিক ··· ঐ ··· মুসলমান আমলের ভারতশিল্প
অগ্রহায়ণ ··· 'ভারতবর্ষ ··· রামমোহন রায়ের কীর্তি
চৈত্র ··· ঐ ··· মুঘল ভারতেতিহাসের লুপ্ত উপাদান

১৩২৭, কার্তিক ··· 'প্রবাসী' ··· প্রতাপাদিত্যের পতন (১৩৫৫, জ্যৈষ্ঠ 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত)
নিদাঘ সংখ্যা··· 'প্রভাতী' ··· নূতনের মধ্যে পুরাতনের প্রকাশ

১৩২৮, বৈশাখ … 'ভারতবর্ষ' … অরাজক দিল্লী (১৭৪৯-৮৮)
আষাঢ় … 'প্রবাসী' … প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রীষ্টান পাদ্‌রী (১৩৫৫, 'আষাঢ় শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত)
শ্রাবণ … ঐ … বোকাইনগর কেল্লা ও উস্‌মান
আশ্বিন … ঐ … আওরংজীব ও মন্দিরধ্বংস ঐতিহাসিক সত্য কি?
… কেজো রসায়নের ওয়ার্কশপ
১৩২৮, অগ্রহায়ণ … 'প্রবাসী' … বঙ্গের শেষ পাঠান বীর
মাঘ … 'শিক্ষক' … শিক্ষার আলোচনা কেন আবশ্যক?
নিদাঘ সংখ্যা… 'প্রভাতী' … দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা
শীত সংখ্যা … ঐ … আওরংজীবের রাজত্বের হিন্দু ঐতিহাসিক
১৩২৯, বৈশাখ … 'প্রভাতী' … বাঙ্গলার একখানি প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার
আষাঢ় … 'ভারতবর্ষ' … আওরংজীবের সাতারা-অবরোধ
ভাদ্র … 'প্রবাসী' … বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন
ভাদ্র … 'প্রভাতী' … ভারতের ঐশ্বর্য্য
পৌষ … ঐ … ঐতিহাসিক ভীমসেন
ফাল্গুন … 'প্রবাসী' … বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গী
১৩৩০, পৌষ … 'প্রভাতী' … সম্রাট শাহ্‌জাহানের দৈনন্দিন জীবন
মাঘ … ঐ … মুঘল শাহ্‌জাদার শিক্ষা
১৩৩৩, বৈশাখ … 'প্রবাসী' … কুমার দারার বেদান্ত চর্চা
১৩৩৫, চৈত্র … ঐ … মহারাষ্ট্র দেশ বা মারাঠা জাতি
১৩৩৬, অগ্রহায়ণ-পৌষ 'প্রবাসী' … পিতাপুত্রে
১৩৩৭, বৈশাখ … ঐ … আওরংজীবের জীবননাট্য
শ্রাবণ … ঐ … নাদির শাহের অভ্যুদয়
আশ্বিন … ঐ … ভারতে মুসলমান
চৈত্র … ঐ … বঙ্গে বর্গী
১৩৩৮, বৈশাখ-আষাঢ় ঐ … বর্গীর হাঙ্গামা
জ্যৈষ্ঠ … 'ভারতবর্ষ' … বিদ্যাসাগর
১৩৩৯, আশ্বিন … 'হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা' ২য় খণ্ড…শিবাজী ও জয়সিংহ

১৩৩৯, পৌষ ··· 'ভারতবর্ষ' ··· 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (সমালোচনা)

মাঘ ··· 'বঙ্গশ্রী' ··· মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস

চৈত্র ··· ঐ ··· মারাঠা সৌভাগ্য-সূর্য্যের অবসান

১৩৪০, শ্রাবণ ··· 'ভারতবর্ষ' ··· নবীন বঙ্গের জীবন-প্রভাতের দৃশ্য ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ডের সমালোচনা)

১৩৪১, জ্যৈষ্ঠ ··· ঐ ··· জাতীয় নাটকের বিকাশ (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে'র সমালোচনা)

কার্তিক-পৌষ ··· 'বুলবুল' ··· ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব (কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের ১২শ অধিবেশনে ইতিহাস-শাখার উদ্বোধন-বক্তৃতা)—১৩৫৫, আশ্বিন 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত

১৩৪২, জুন ··· 'রজত জয়ন্তী' ··· আধুনিক ভারতে ইতিহাসের বিকাশ ভারত সাম্রাজ্যের ২৫ বৎসর

পৌষ ··· 'ভারতবর্ষ' ··· 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ৩য় খণ্ড (সমালোচনা)

১৯৩৬, ২৪ জানুয়ারী 'নূতন পত্রিকা' ··· ইসলামি সভ্যতার স্বরূপ কি?

'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'···বঙ্গে মুঘল পাঠান সংঘর্ষ, ১৫৭৫ খ্রীঃ

১৩৪৩, ৩০ আশ্বিন 'এডুকেশান গেজেট' বঙ্গের বাহিরে শক্তিপূজা

চন্দননগর সাহিত্য-সম্মেলনের কার্য্যবিবরণ···ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণ (৯ ফাল্গুন ১৩৪৩)

১৩৪৪, আষাঢ় ··· 'ভারতবর্ষ' ··· বেকার

১৩৪৫, আষাঢ় ··· 'মাসিক বসুমতী'···বঙ্কিমচন্দ্র ও ইসলামীয় সমাজ

১৩৪৫, আষাঢ় 'শনিবারের চিঠি'···বঙ্কিম প্রতিভা

আশ্বিন 'অলকা' ··· যুগধর্ম্ম ও সাহিত্য

২য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'···মুঘল ভারতের ঐতিহাসিকগণ

১ম সংখ্যা ঐ ··· মুসলমান-যুগে ভারতের ঐতিহাসিকগণ

১৩৪৬, ২য় সংখ্যা ঐ ··· ঐ

১৩৪৭, ১ম সংখ্যা ··· সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা···রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা
৪র্থ সংখ্যা ··· ঐ ··· মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের মশলা
১৩৪৮, আশ্বিন ··· 'শনিবারের চিঠি'···রবীন্দ্রনাথের একটি দান
পৌষ ··· 'প্রবাসী' ··· মোহিনীমোহন চক্রবর্তী স্মৃতি
১৩৪৯, ১ম সংখ্যা ··· 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ··· হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩৫০, ৩য় সংখ্যা ··· ঐ ··· দুর্গেশনন্দিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি
১৩৫১, ১ম সংখ্যা ··· ঐ ··· নাট্য-সাহিত্য কোথায় গেল?
চৈত্র ··· 'প্রবাসী' ··· আকবরের আমল
১৩৫২, মাঘ ··· ঐ ··· আর্য্যা নিবেদিতার আদর্শ গবেষণার প্রণালী
১৩৫২, ফাল্গুন-চৈত্র ··· ঐ ··· পত্রাবলী
১৩৫৪, আশ্বিন ঐ ··· স্বাধীনতার উষায় চিন্তা (১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭)
১৩৫৫, আশ্বিন ··· ঐ ··· দেশের ভবিষ্যৎ
কার্তিক ··· 'প্রাচী' (শান্তিপুর) ··· বাহিরের জগৎকে বাঙ্গলার দান
পৌষ ··· 'প্রবাসী' ··· আমার জীবনের তন্ত্র

যদুনাথ-লিখিত বাংলা ভূমিকা

প্রাচীন ইতিহাসের গল্প ··· প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ··· পৌষ ১৩১৯
প্রতাপসিংহ (৩য় সং) ··· সতীশচন্দ্র মিত্র ··· মে ১৯১৭
মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা ··· শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ··· আষাঢ় ১৩২৬
জহান্-আরা ··· ঐ ··· জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭
শিবাজী মহারাজ ··· ঐ ··· ফাল্গুন ১৩৩৫
ওমর খৈয়াম ··· শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী ··· ভাদ্র ১৩৩৬
আনন্দমঠ ··· পরিষৎ-সংস্করণ ··· আষাঢ় ১৩৪৫
দুর্গেশনন্দিনী ··· " ··· পৌষ ১৩৪৫
দেবী চৌধুরাণী ··· " ··· ভাদ্র ১৩৪৬
রাজসিংহ ··· " ··· শ্রাবণ ১৩৪৭
সীতারাম (২য় সং) ··· " ··· ফাল্গুন ১৩৫২
বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ···রেজাউল করিম ··· মে ১৯৪৪
ছেলেদের বাবর ··· শ্রীবাণীগুপ্ত ··· বৈশাখ ১৩৫২

ইংরেজী গ্রন্থাবলী

1. India of Aurangzib. Topography, Statistics and Roads. ... 1901
2. Economics of British India. ... 1909, Mar.
3. History of Aurangzib :

Vol.		
I	...	July 1912
II	...	"
III	...	1916
IV	...	Nov. 1919
V	...	Dec. 1924

4. Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays. 1912, Nov.

১৯২৫, জুলাই মাসে ইহার ২য় সংস্করণ Anecdotes of Aurangzib নামে প্রকাশিত হয় : একমাত্র Life of Aurangzib ছাড়া প্রথম বারের সকল প্রবন্ধই এই সংস্করণে বর্জিত হইয়াছে।

5. Chaitanya, his Pilgrimages and Teachings (afterwards Chaitanya's Life and Teachings, 1922) ... 1913
6. Shivaji and His Times. ... 1919, July
7. Studies in Mughal India ... 1919, Oct.

(Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays পুস্তকের ১০টি ও নূতন ১২টি প্রবন্ধের সমষ্টি)

8. Mughal Administration.

1st series	...	Cal, 1920
2nd series	...	1925 (Patna Univ.)
Combined Volume		1924

9. Later Mughals, 1707—1739 :
   By Wm. Irvine. ed. and continued by J. N. Sarkar.
   Vol. I—II ... 1922
10. India Through the Ages ... 1928
11. Short History of Aurangzib ... 1930
12. Bihar and Orissa during the fall of the Mughal Empire. ... 1932
13. Fall of the Mughal Empire :

Vol.		
I	...	1932
II	...	1934, Sep.
III	...	1938. Nov.
IV	...	1950, May

14. Studies in Aurangzib's Reign ··· 1933
15. House of Shivaji. ··· 1940, May
16. Maasir-i-Alamgiri (Bib. Indica)
    Eng. trans by J. N. S. ··· 1947, Oct.
17. Poona Residency Corrspondence (Edited):
    Vol. I ··· 1936
    Vol. VIII ··· 1945
    Vol. XIV ··· 1951
18. Ain-i-Akbari, Bib. Ind. (Edited):
    Vol. III, Eng. tr. by Jarret. ··· 1948
    Vol. II Do in the Press.

ইহা ছাড়া Cambridge History of India (Vol. IV, 1937) গ্রন্থের ৮, ১০-১৯ ও ১৩শ অধ্যায় যদুনাথের লিখিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত History of Bengal (Vol II, May 1948) গ্রন্থখানি তিনি কেবলমাত্র সম্পাদনই করেন নাই, ইহার দুই শতাধিক পৃষ্ঠা নিজে লিখিয়া দিয়াছেন।

19. Delhi News for Poona, 1756-1788 (Bombay Govt.) 1952
20. Bengal Nawabs (Asiatic Society Calcutta) 1952

যদুনাথ লিখিত ইংরেজী ভূমিকা

1. History of the Jats: K. R. Qanungo 1925, Aug.
2. Begum Samru: Brajendra Nath Banerjee 1925, Sept.
3. Mirat-i-Ahmadi ed. by. S. Nawab Ali 1927
4. Aitihasik Patren Yadi Wagaire Lekh (2nd ed):
   G. S. Sardesai 1930, June
5. Tarikh-i-Mubarakshahi, Eng. trans.
   by K. K. Basu 1932
6. The First two Nawabs of Oudh:
   Ashirvadi Lal Srivastav 1933
7. Malik Ambar: Jogendra Nath Chowdhuri 1934, Feb.
8. Shindeshahichin Rajakaranen
   Vol. I (Satara 1934)
   Vol. II (Satara 1940)
9. Malwa in Transition: Raghubir Singh 1936
10. Historical Papers relating to Mahadji Sindhia:
    ed. by G. S. Sardesai 1937, Dec.

11. Badshah Begam : Md. Taqi Ahmed 1938
12. Bibliography of Mughol India : (1526-1707 A. D.) : Sri Ram Sharma 1939
13. History of the Sikhs, 1739-'68 : Hari Ram Gupta 1939
14. History of Medieval Vaishnavism in Orissa : Pravat Mukherjee 1940
25. Marathi Riyasat Vol. 5, Baji Rao : Sardesai 1942
16. Begams of Bengal : Brajendra Nath Bsnerjee 1942, Oct.
17. Peshwa Baji Rao I : V. G. Dighe 1944
18. Sardar Sakharam Hari : Y. R. Gupte 1946
19. Humayun in Persia : Sukumar Roy 1948

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ইংরেজী রচনা

সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় যদুনাথের ইংরেজী রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইহার অতি অল্প অংশই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই সকল রচনার নির্ভরযোগ্য তালিকা সংকলন করা সম্ভবপর নহে বলিয়া আমরা কেবলমাত্র কতকগুলি পত্রিকার নামোল্লেখ করিতেছি :—

Military History of India, (4 chap. Published up to Aug. 1952. in Hindhusthan Standard), Calcutta University Magazine, Modern Review, Bihar & Orissa Research Socy's Journal, Bengal Past and Present, Journal of the Asiatic Socy. of Bengal, Islamic Culture (Hyderabad), Muslim Review, Indan Historical Quarterly, Hyderabad Arch. Socy's Journal, Hindusthan Review, Indian Review, Ravenshavian (Cuttack), Presidency College Magazine, Prabuddha Bharat, Bombay University Journal, Times of India, Science and Calture, Patna College Magazine, Calcutta Municipal Gazette.

ইহা ছাড়া Proceedings of the Indian Historical Records Commission, B. C. Law Commemoration Vol., Sardesai Commemoration Vol (1933), Birla Park Annual প্রভৃতিতে তাঁহার রচনার সন্ধান মিলিবে।

প্যান্ ইসলাম আন্দোলন ও ভারতবর্ষ

বিপিন চন্দ্র পাল

গত বল্কান যুদ্ধে তুরস্কের ভাগ্যবিপর্যয় প্যান্ ইস্লামিজমের অর্থাৎ সমস্ত জগতের মুসলমানদের একত্রিত করিয়া এক অখণ্ড রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে অদম্য আকাংখা বর্তমানে মুসলমানদের মনে দেখা দিয়াছে তাহা মুল কারণ হইলেও, একদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই আন্দোলনের গোড়াপত্তন ভারতবর্ষের মাটিতেই। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে জালালুদ্দিন নামে এক মুসলমান ভদ্রলোক আফগানিস্থান হইতে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল এইদেশের জনসাধারণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্যান্ ইসলামের আদর্শ প্রচার করা। মুসলিম জনসমাজকে তাহাদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলা এবং এক নিখিল বিশ্ব মুসলিম সাম্রাজ্যের আকাংখা তাহাদের মনে গড়িয়া তোলাই জালালুদ্দিনের ভারতবর্ষ ভ্রমণের আসল উদ্দেশ্য ছিল। প্যান্ ইসলামের এই আদর্শ প্রচারের জন্য ঐ ভদ্রলোক অতঃপর মিশর এবং তুরস্কে গমন করেন। কিন্তু যে বিষবৃক্ষের বীজ তিনি এইদেশের মাটিতে বপন করিয়া যান তাহা ধীরে ধীরে অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরিত হইতে থাকে। এই প্রচারের ফলে ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন একদিকে দেখা দিল নুতম আত্মসচেনতা এবং নুতনভাবে বাঁচিয়া উঠিবার প্রেরণা তেমনি অপর দিকে ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি এবং ধর্ম্মীয় অসহিষ্ণুতা যাহা প্রাচীন ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাও দেখা দিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতীয় মুসলমানদের এই প্যান্ ইসলামীয় মনোভাবের প্রসারকে আমাদের দেশে সম্যক দৃষ্টিভংগীর দ্বারা বিচার করা হয় নাই। ইহার ফল হইল এই যে হিন্দু এবং মুসলমান

(আলোচ্য প্রবন্ধটি ১৯১৩ সালে প্রকাশিত বিপিনচন্দ্র পালের Nationality and the Empire গ্রন্থের Pan-Islamism নামক প্রবন্ধের সংক্ষেপিত অনুবাদ)

—অনুবাদ : শিবনাথ রায়

সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধকে চাকুরী বাকুরী এবং অন্যান্য সুবিধার জন্য লড়াই হিসাবে দেখা হইল। ইসলামের আক্রমণাত্মক মনোভাবকেও অনুরূপভাবে ভুল বিশ্লেষণ করা হইল—মনে করা হইল ইসলামের অনুসারীগণ বুঝি আসলে ইসলামের প্রাচীন আদর্শগুলি ও ধর্মের প্রাচীন মূল্যবোধগুলিকেই পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং ঐস্লামিক জগতের এই ভাবচাঞ্চল্য আসলে আসন্ন আত্মপ্রচারের ও আত্মপ্রসারের যাত্রা সূচনা করিতেছে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বোঝা যাইত ভারতীয় মুসলমান সমাজের চিন্তাধারায় যে পরিবর্তন সুরু হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে এক সর্বনাশা ধ্বংসের বীজ। জালালুদ্দিন কলিকাতায় এবং ভারতবর্ষের অন্যত্র মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সহিত গোপন বৈঠকে যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন প্যান্ ইসলাম আন্দোলন তাহারই অবশ্যম্ভাবী এবং স্বাভাবিক পরিণতি।

ঠিক সেই একই সময়ে না হইলেও প্যান্ ইসলাম আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্র এবং ইহার আসল উদ্দেশ্য জনসমক্ষে বেশীদিন গোপন থাকে নাই। ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের প্রতি মুসলিম সমাজের দৃষ্টিভংগী অত্যন্ত সুবিদিত। ইহার জন্য প্যান্ ইসলামের প্রচার অনেকটা পরিমাণে দায়ী। প্রথমে কংগ্রেস এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়া যে স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হয় আমাদের দেশে তাহার ফলে হিন্দুসমাজ নবচেতনায় জাগিয়া উঠিলেও স্বদেশী আন্দোলনের অত্যুগ্র হিন্দু চরিত্রের জন্য এই দেশের মুসলমান নেতারা বেশ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের এই ভয় নিতান্ত অমূলক না হইলেও প্রকৃত রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি থাকিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে দেশের সমস্ত জনসমাজ, শ্রেণী ও সম্প্রদায় এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব কোন বিশেষ শ্রেণী অথবা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিত না। ইহা প্রকৃতই সমস্ত জাতির অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পরিণত হইত। কিন্তু মুসলিম সমাজ এই আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া থাকিবার ফলে এই আন্দোলনে হিন্দু প্রভাবই সর্বাপেক্ষা বেশী পড়িল এবং স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দু আধিপত্যই হইল ইহার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি মুসলিম সমাজের বিমুখতা জাতীয় আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক ব্যাপার নহে। আমার মনে হয়

জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাহাদের বিরোধিতাই সমধিক দুঃখের ব্যাপার। স্বদেশসেবার ব্যাপারে যে তাহাদের হিন্দুসমাজের আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা কোনদিন ছিল না। স্বরাজ-লাভকে যদি তাঁহারা নিজেদের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিতেন এবং সেই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহাদের ধর্ম এবং ঐতিহ্য সমর্থিত বিশেষ কোন উপায়ের সন্ধান করিতেন তাহা হইলে আক্ষেপের বিশেষ কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু প্যান্ ইসলামের শিক্ষা হইল এই যে মুসলিম জগতের প্রতি আনুগত্যের বন্ধন জাতীয়তা এবং স্বাদেশিকতার দাবী অপেক্ষাও শক্তিশালী। এই সর্বনাশা শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতীয় মুসলিমরা কেবল যে দেশের মঙ্গলের জন্য এবং আমাদের ও তাহাদের উভয়ের স্বার্থের জন্য যাহা করা উচিত ছিল তাহা তো করেই নাই, উপরন্তু তাহারা গোপনে গোপনে দেশের অসন্তোষে ইন্ধন জোগাইয়াছে যাহাতে প্যান্ ইসলামের লক্ষ্য সহজে সিদ্ধ হয়। লর্ড মিণ্টোও প্যান্ ইসলামপন্থীদের প্রকৃত অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন নাই ; তাই তিনি সহজেই তাহাদের খপ্পরে পড়েন।

প্যান্ ইসলামপন্থীরা প্রচার করিয়া থাকেন যে বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে যে ঐক্যের বন্ধন রহিয়াছে তাহা কেবলমাত্র ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বন্ধনই নহে, একই সঙ্গে ইহা রাজনৈতিক বন্ধনও বটে। অথচ ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্যরূপ। মুসলিম ঐক্য রাজনৈতিক বন্ধনের উপর যে প্রতিষ্ঠিত নহে তাহার সাক্ষ্য এই দেশ এবং অন্য দেশের ইতিহাসে রহিয়াছে। তাই একটি মুসলিম রাষ্ট্রের সহিত অপর একটি মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধ হইলেও এই ঐক্যবন্ধন শিথিল হয় নাই। তুরস্কের গোড়াপত্তন তো এই ধরণের এক মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আত্মকলহের ফলে সম্ভব হইয়াছিল। আমাদের দেশেও মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় অন্যান্য মুসলিম শক্তিকে দমন করিয়া, এমন কি তুরস্কের সম্রাটগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পক্ষেও মোগল সম্রাটদের কোন ধর্মগত বাধা ছিল না। বল্কান যুদ্ধে তুরস্ককে সমর্থন জানানোর কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা মুসলমানদের ছিল না। ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা থাকিলে তুরস্ককে কেবলমাত্র মৌখিক সমর্থন জানাইলেই তাহাদের কর্তব্য শেষ হইত না। মুসলিম তীর্থস্থানগুলি আক্রান্ত হইলে এবং তুরস্ক সেইগুলি রক্ষার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করা

প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হইত। কিন্তু নিছক তর্কের খাতিরেও কেহ স্বীকার করিবেন না যে ট্রিপোলী, টিউনিস, আড্রিয়ানপোল এবং ইস্তাম্বুল মুসলমানদের তীর্থস্থান। অতএব এই অঞ্চলগুলি রক্ষার জন্য লড়াই ধর্মের লড়াই একথাও স্বীকার করা চলেনা। কাজেই বল্কান যুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের নিকট তুরস্ক যে সাহায্যের আবেদন করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে করিয়াছিল—ইসলাম ধর্ম বাঁচানোর জন্য সে আবেদন করে নাই এবং এই আন্দোলনের পিছনে যে নীতি কাজ করিতেছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে প্যান্ ইসলামের নীতি।

প্যান্ ইসলাম সম্পর্কে আমার যে ব্যাখ্যা তাহা মনগড়া অথবা কাল্পনিক নহে। ইহার সম্পর্কে পরিষ্কার একটি ধারণা পাওয়া যায় অধুনা প্রকাশিত জালাল নুরীর 'ইত্তেহাদ-ই-ইসলাম্' গ্রন্থে 'জমিদার' পত্রিকার সম্পাদক জাফর আলি খান লিখিত 'ভারতীয় মুসলমান ও প্যান্ ইসলাম্' নামক প্রবন্ধে। তাঁহার মতে 'প্যান্ ইসলামের আদর্শ অতি প্রাচীন আদর্শ এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তি পবিত্র কোরাণের সেই সুবিদিত উক্তি, যেখানে বলা হইয়াছে প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভ্রাতা। পয়গম্বরের প্রদত্ত প্যান্ ইসলামের এই সংজ্ঞা কোনদিন পুরাতন হইবে না। উপরন্তু ইসলামের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভ্রাতৃত্ব মুলতঃ এক আত্মিক বন্ধন যাহা বিশ্বের মুসলিম সমাজকে একতাবদ্ধ করিয়াছে। ইহার তুলনা অন্য কোন ধর্ম অথবা সমাজব্যবস্থায় পাওয়া যাইবে না। প্যান্-শ্লাভিজম অথবা প্যান্ জার্মানিজম্ যেখানে গড়িয়া উঠিয়াছে বিশেষ অঞ্চল অথবা বিশেষ গোষ্ঠীর আনুগত্যকে কেন্দ্র করিয়া, সেখানে ঐস্লামিক ভ্রাতৃত্ব সংকীর্ণ দেশানুগত্য, জাতি অথবা গোষ্ঠীগত বন্ধনের ঐক্যকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই আত্মিক একতাবোধই মুসলিম আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি। বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র এবং বিশেষ করিয়া তুরস্ক এই মুসলিম স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতন রহিয়াছে। ভারতীয় মুসলমানরা যেমন অনুভব করেন মুসলমান হিসাবে তাঁহাদের প্রধান পরিচয় এবং ভারতীয় হিসাবে গৌণ তেমনি তুরস্কের মুসলমানরাও মনে করেন মুসলমান হিসাবেই তাঁহাদের বড় পরিচয় তুরস্কের অটোমান হিসাবে নহে। মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের এই বিশ্ব-জনীনতার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে প্যান্ ইসলামের আসল শক্তি। ভারতীয় মুসলমানরা এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে দেরী করে নাই। ইসলামের

প্রাচীন মহিমার যে স্বল্প অংশ আজও বজায় আছে তুরস্ক তাহা আজ পর্যন্ত এককভাবে পশ্চিমের আক্রমণের বিরুদ্ধে আঁকড়াইয়া আছে। কিন্তু তুরস্কের উপর ইউরোপের আক্রমণ ভারতবর্ষের মুসলমানরা কিছুতেই সহ্য করিবে না। তাহার এই চরম বিপদের দিনে তাহারা সকল শক্তি লইয়া দাঁড়াইবে কেননা তাহারা জানে তুরস্কের ধ্বংস সূচনা করিবে সমগ্র মুসলিম জগতের পরাজয় এবং ঐস্লামিক আদর্শের অনিবার্য ধ্বংস। রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা প্যান ইসলামের আসল লক্ষ্য নহে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য মুসলিমদের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন। কামানের বিস্ফোরণের মধ্য দিয়া নহে, ব্যাঙ্ক এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ঘোষিত হইবে ইসলামের জয়যাত্রা। ইহাই হইল প্যান্ ইসলামের ভাবী লক্ষ্য এবং আল্লার কৃপায় এই মহান আদর্শ জয়যুক্ত হইবে।"

উপরোক্ত ব্যাখ্যায় প্যান্ ইসলাম আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের তুলনায় ধর্মের অনুল্লেখ লক্ষ্যণীয়। প্যান্ ইসলামের একটি প্রধান যুক্তি, ইহা কোন বিশেষ দেশের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে। ইহার ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন দেশ ও জাতীয়তার সীমানাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। একদিক দিয়া সকল ধর্ম সম্বন্ধেই কি অনুরূপ দাবী করা চলেনা? আর যদিবা ইসলাম অথবা খ্রীস্টান কোন ধর্মমতের পক্ষে এই জাতীয়তার গণ্ডী ছাড়াইয়া যাওয়া সম্ভব হয়, সেই যুক্তিতে আজকের দিনে কি ইসলাম কি খ্রীস্টান ধর্মের পক্ষে extra-territorial চরিত্র দাবী করা চিন্তার দিক হইতে অযৌক্তিক এবং যুক্তির দিক হইতে কি একেবারে উদ্ভট নহে? মুসলমানেরা কোনদিনই একই নেশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, একমাত্র মদিনায় যখন খলিফার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই কয়েক বৎসর ছাড়া। কাজেই বিশ্বের মুসলিম সমাজ যে বরাবর একই নেশনের অন্তর্গত এই উদ্ভট দাবীর অন্ততঃ ইতিহাসে কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। নেশনবোধ ধর্মীয় কোন চেতনার উপর গড়িয়া ওঠে না। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বাস করিবার ফলে এবং একই রাষ্ট্রীয় জীবন যাপন করিলে নেশন বোধের চেতনা জাগ্রত হইতে থাকে। ইহা ছাড়া কোন জাতীয়তা বোধই গড়িয়া উঠিতে পারে না, এমন কি ইসলামীয় জাতীয়তাও নহে। প্যান্ ইসলাম হইল প্রকৃতপক্ষে এক ধর্মীয় ভ্রাতৃসংঘ। এই ধরণের প্রতিষ্ঠান আরো রহিয়াছে যথা, খ্রীস্টান অথবা বৌদ্ধ ভ্রাতৃসংঘ।

কিন্তু ইহাদের লইয়া যেমন কখনও একটি অখণ্ড খ্রীস্টান নেশন বা বৌদ্ধ নেশন গড়িয়া উঠিতে পারেনা তেমনি এক অখণ্ড মুসলমান নেশন বোধের কথাও অবাস্তব। প্যান্ ইসলাম আন্দোলনের মূল লক্ষ্য যে কেবল ইসলামের রক্ষণ এবং পরিবর্ধন নহে তাহা পরিষ্কাররূপে বোঝা যায় জাফর আলি খাঁনের এই উক্তি হইতে যে "ইসলাম কাহারো বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মকভাব পোষণ করে না, প্যান্ ইসলামপন্থীদের একমাত্র লক্ষ্য হইল ইসলামের বিগত ঐশ্বর্যের যেটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে তাহাই বজায় রাখা।"

পশ্চিমী সভ্যতার আক্রমণ হইতে ঐস্লামিক সমাজ এবং ধর্ম ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার জন্য এক আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বজোড়া সংঘের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্য লইয়া প্যান্ ইসলাম আন্দোলন গড়িয়া উঠিলে কোন আপত্তির কারণ থাকিত না। অথবা ইহা যে এক প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন তাহাও ভাবা চলিত না। ইসলাম এখনও একটি প্রাণবন্ত গতিশীল ধর্ম—ইহার মধ্যে রহিয়াছে অনন্ত সম্ভাবনা যাহার সাফল্যে বিশ্বসভ্যতা বিশেষ ভাবে উপকৃত হইবে এবং সর্বাপেক্ষা বেশী লাভ হইবে খ্রীস্টান জগতের তথা পশ্চিমী দেশগুলির। ইসলাম হইল একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ইহার অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামই হইল একমাত্র ধর্মমত যেখানে সন্ন্যাসের কোন শুষ্ক আদর্শ স্থান পায় নাই অথচ যেখানে ভোগের মধ্য দিয়া সংযম এবং নির্লিপ্ততার শিক্ষা পাওয়া যায়। ইসলামের এই আদর্শগুলি হইতে শিক্ষা করার অনেক আছে। অন্যান্য উন্নত সভ্যতাগুলির সমপর্যায়ে উঠিতে হইলে এবং পূর্বের গৌরবের উপযুক্ত হইতে হইলে ইসলামকে তাহার বর্তমান দৈন্য এবং অধঃপতনের উর্ধে উঠিতে হইবে। এইজন্য প্রথমতঃ আফ্রিকা এবং এশিয়ার মুসলিম দেশগুলিকে বৈদেশিক অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই রাষ্ট্রগুলিকে সম্পূর্ণভাবে আধুনিক ভাবধারা গ্রহণ করিতে হইবে। জনসাধারণকে দিতে হইবে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং দেশ জুড়িয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। সংগে সংগে সকল প্রকার কারিগরি, বৈজ্ঞানিক এবং সাধারণ শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর্থিক এবং সামরিক দিক হইতে যাহাতে এই রাষ্ট্রগুলি স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারে তাহাও দেখিতে হইবে। এইগুলির অত্যন্ত প্রয়োজন রহিয়াছে যেমন ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তেমনি আজিকার সার্বজনীন মানবসভ্যতাকে সার্থকতার পথে লইয়া

যাইবার জন্যও বটে। ইসলামের ঐক্যসূত্র মূলতঃ এক আত্মিক এবং সামাজিক বন্ধন। ঐস্লামিক বিশ্বভ্রাতৃত্ব যে কেবল জাতীয়তার দাবীকেই উপেক্ষা করে তাহা নহে—ইহা রাজনীতির কোন লক্ষ্যকেই স্বীকার করিয়া চলিতে পারে না।

কিন্তু এ পর্যন্ত প্যান্ ইসলামের যে লক্ষ্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা মূলতঃ রাজনৈতিক। ইসলামধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কিছুদিন পর্যন্ত ইহার ধর্মীয় সংগঠন বজায় রাখিবার জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য কিছু পরিমাণে রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। কতকগুলি বাহিরের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার বিশেষ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজন, যে প্রযোজনের তাগিদে দেশজয়ের আকাঙ্খা ইসলামের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল তাহা এখন আর নাই। তাই সেই কারণে প্রাচীন ঐস্লামিক সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবনের কথা বর্তমানে বলা হইলে এক অমার্জনীয় অজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হইবে। ইতিহাসে তো বহু প্রাচীন সাম্রাজ্যগঠনের নজীর পাওয়া যায়। প্রাচীন হেলেনিজ ও রোমানদের একদা বিশ্বজোড়া বিশাল সাম্রাজ্য ছিল। মোগলরা ভারতবর্ষে মধ্যযুগে তাহাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং ফরাসীরা ইউরোপে। কিন্তু এইসব জাতিগুলি ক্রমে পৃথিবীর সর্বত্র বিক্ষিপ্ত-ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং অন্যান্য জাতিসমূহের সহিত সংমিশ্রণে নূতন নূতন জাতি গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহারা যদি আবার পূর্ব সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হয় তাহা হইলে বিশ্বশান্তি যে বিপদের সম্মুখীন হইবে তাহা অপেক্ষাও গুরুতর বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইবে যদি প্যান্ ইসলামের রাজনৈতিক প্রভুত্ব এবং বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্য গড়ার আকাঙ্খাকে বাধা না দেওয়া হয়।

প্যান্ ইসলাম আন্দোলনের প্রসারে সবচেয়ে ভয়ের কথা এই যে সকল অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয় এবং যে সকল রাষ্ট্রের কর্ণধাররা মুসলিম নহে, প্যান্ ইসলাম আন্দোলনের ফলে এই সকল রাষ্ট্রে দারুণ বিপর্যয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে। যে সকল অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানরা বাস করে সেই সকল দেশে রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য সম্পূর্ণ অস্বীকার না করিয়া কখনও প্যান্ ইসলামের রাজনৈতিক

লক্ষ্য পূর্ণ হইতে পারে না, তাহা ভারতবর্ষেই হউক বা অন্যত্রই হউক। অবশ্য প্যান্ ইসলামপন্থীরা বলিতে পারেন যে তাঁহারা শান্তিপূর্ণ উপায় তাঁহাদের লক্ষ্যে পৌঁছিবেন এবং এজন্য তাঁহারা অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উপর বিশেষ ঝোঁক দিবেন। সামরিক দিকের কথা তাঁহারা অস্বীকার করিলেও আমরা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারি সুশিক্ষিত সৈন্যদল এবং আধুনিক মারণাস্ত্র ছাড়া কোন রাষ্ট্রই বর্তমানে টিকিতে পারে না। সামরিক শক্তিবৃদ্ধির দিকে তাই তাঁহাদের বিশেষ নজর দিতে হইবে। ইহা ছাড়াও এই রাজনৈতিক প্যান্ ইসলামিজমের লক্ষ্য হইবে প্রথমতঃ ধর্মীয় আবেদনের মারফৎ বিশ্বের মুসলমানদের মনে এক প্যান্ ঐস্লামিক মনোভাব সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়তঃ সামরিক এবং রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই রাষ্ট্রগুলিতে আধুনিক শিক্ষা এবং সামরিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। তৃতীয়তঃ এই সব মুসলিম রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া না ওঠা পর্যন্ত অন্যান্য অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম অধিবাসীদের নৈতিক সমর্থনে টিকাইয়া রাখা। চতুর্থতঃ মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সহিত এই সকল অমুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধ সুরু হইলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অথবা সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা এই সকল অমুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে ব্যতিব্যস্ত করা হইবে এবং সম্ভব হইলে এই রাষ্ট্রগুলিকে ধ্বংস করা হইবে। এইভাবেই প্যান্ ইসলামের বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল হইতে পারে। সুতরাং ইহা স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে এই প্যান্ ইসলাম নীতি একদিকে বিশ্বশান্তি ও মানব সভ্যতার পরিপন্থী, অপরদিকে ইহা সেই সকল রাষ্ট্রগুলিকে ঘোর দুর্যোগের দিকে টানিতেছে ভারতবর্ষের ন্যায় যে দেশগুলি হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের আবাসভূমি।

ভারতবর্ষের পক্ষে এই রাজনৈতিক সংকট নিতান্ত কাল্পনিক নয়, উপরন্তু ইহা ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছে। এইদেশে হিন্দু মুসলিম বিরোধের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় ইহার জন্য প্যান্ ইসলাম আন্দোলন বহুল পরিমাণে দায়ী। ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় বহুদিন পূর্ব হইতেই এক সম্প্রীতির বন্ধনকে হয়তো বা আপনার অজ্ঞাতসারে স্বীকার করিয়া নিয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে এক সময় হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রীতি ছিল তাহা ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহার জন্য প্যান্ ইসলামিজমের বিভেদমূলক প্রচার বহুল

পরিমাণে দায়ী। ইসলামের এই গোঁড়ামি এবং আক্রমণাত্মক মনোভাবের জন্য প্যান্ ইসলামের প্রসার সঠিক কি পরিমাণ দায়ী তাহা পরিমাপ করা সম্ভব না হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জালালুদ্দিনের ভারতবর্ষ ভ্রমণের অব্যবহিত পরেই হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের প্রমাণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে থাকে। যে স্যার সৈয়দ আহম্মদ একসময়ে হিন্দু এবং মুসলমানকে মানব দেহের হস্ত এবং চক্ষুর সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে এই উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ অভিন্ন এবং আশা আকাঙ্খা এক, তিনিও কংগ্রেসের নেতৃত্বে চালিত ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করিতে থাকেন। এক সময়ে আমরা হিন্দু মুসলমান বিরোধের জন্য আমলাতান্ত্রিক বিভেদমূলক নীতিকেই দায়ী করিয়াছিলাম; কিন্তু এই বিভেদমূলক নীতির দ্বারাই হিন্দু মুসলিম বিরোধকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। বর্তমানে সাম্প্রদায়িক সমস্যার জন্য প্যান্ ইসলামের উগ্রপন্থী প্রচার যে কিছু পরিমাণে দায়ী তাহা অস্বীকার করা কঠিন।

প্যান্ ইসলাম আন্দোলন যে রাস্তায় বর্তমানে চলিয়াছে তাহাতে মনে হয় জাতীয়তাবাদের আদর্শের সংঘাত ভবিষ্যতে ইতিহাসে জটিলতার সৃষ্টি করিবে। মুসলিম প্রধান দেশে অবশ্য এই সংঘাতের সম্ভাবনা অল্প; কেননা এই সকল দেশে প্যান্ ইসলামের সহিত জাতীয়তাবাদের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থা ভিন্ন ধরণের বলিয়া এই দেশে প্যান্ ইসলাম আন্দোলনের প্রসার দারুণ জটিলতা এবং বিপদের সৃষ্টি করিবে। মুসলিম নেতারা জানেন যে ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজকে সর্বাঙ্গীন বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইলেও এই দেশে কখনই মুসলমানগণ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে যে প্রধান্য প্রতিষ্ঠা করিতেছেন তাহা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন না। তাহা ছাড়াও এদেশের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের সুবিধার জন্য প্যান্ ইসলাম আন্দোলনে সহায়তা করিতেছেন যাহার ফলে মুসলমানরা কিছুতেই তাহাদের বিগত আধিপত্যের কথা বিস্মৃত হইতে পারিতেছে না এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি এবং সম্প্রদায়ের সহিত নিঃসঙ্কোচে মিশিয়া গিয়া একটি বিশাল ভারতীয় মহাজাতি গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না। মুসলমান সমাজের এই অহমিকা বোধের জন্য অনেক পরিমানে ইংরাজ ঐতিহাসিক প্রচারিত ভুল ইতিহাস দায়ী। তাহারাই এই কথা প্রচার করে যে ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা ইংরাজরা মোগলদের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছিল।

কিন্তু আমরা জানি ইতিহাসের সাক্ষ্য ভিন্ন ধরণের। মোগলদের নিকট হইতে ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা ইংরাজরা গ্রহণ করে নাই। মোগলদের দুর্বল হস্ত হইতে ইংরাজরা আসিবার বহু পুর্বে যে রাজদণ্ড খসিয়া পড়িয়াছিল তাহা ভারতবর্ষের এক প্রান্তে শিখগণ এবং অন্য অঞ্চলে মারাঠাগণ কুড়াইয়া লইয়াছিল। সেই সময় ইংরাজরা এই দেশে না আসিলে এদেশের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লিখিত হইত—এই ঐতিহাসিক তথ্য সুবিধামত অনেকেই ভুলিয়া যান। ইতিহাসের আসল তথ্য মুসলমানদের অবজ্ঞা করিতে শিখাইয়া এবং মর্লি-মিণ্টো প্রবর্তিত নূতন শাসন সংস্কার ব্যবস্থায় মুসলমান-দের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া শাসকগোষ্ঠী মুসলমানদের মনে এই অহমিকা বোধকে জিয়াইয়া রাখিতেছেন এবং প্যান্ ইসলাম আন্দোলনকে সহায়তা করিতেছেন।

শাসক শ্রেণীর বিভেদমুলক নীতি এবং প্যান্ ইসলাম আন্দোলনের প্রসার যতখানি এই দেশের মুসলমানদের মধ্যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিবার জন্য দায়ী অনুরূপ ভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিস্তারও এই সমস্যার জন্য সমভাবে দায়ী। একটি পরাধীন জাতিকে আশা এবং আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য হিন্দু ঐতিহাসিকগণ পুরাতন হিন্দু প্রাধান্যের গৌরবকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ফলে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভাবিতে সুরু করিল স্বাধীন ভারতবর্ষে হিন্দু রাজত্ব কায়েম হইবে এবং তাহাদের নিকট স্বরাজের দ্বিতীয় অর্থ হইল হিন্দু রাজ। ইহার উত্তর স্বরূপ মুসলমানরাও সমান ভাবে মুসলিম আধিপত্যের দিনগুলি পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একাংশ আবার জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং নিজেদের অজ্ঞাতসারেই অনেকে হিন্দুরাজের বিরোধী আদর্শ হিসাবে প্যান্ ইসলামের সংকীর্ণ আদর্শকে সমর্থন করিতে সুরু করিলেন। এইভাবেই আমাদের দেশে প্যান্ ইসলাম আন্দোলনের প্রসার হইয়াছে।

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য এই যে প্যান্ ইসলামের উৎপত্তির ঐতিহাসিক যে কোন কারণ এবং ইহার স্বপক্ষে বলিবার যাহা কিছুই থাকুক না কেন আমাদের দেশের সাধারণের স্বার্থে প্যান্ ইসলামবাদের সর্বনাশা রূপটিকে জনসমক্ষে তুলিয়া ধরা উচিত। কেননা আমাদের দেশে জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে প্যান্ ইসলাম আন্দোলন বিশেষ বিপদের সৃষ্টি করিবে। তাহার

প্রধান কারণ এই যে ভারতের জাতীয় জীবনের আদর্শ এবং প্যান ইসলামের আদর্শ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং পরস্পর বিরোধী। মিঃ জাফর আলি খান এবং স্যার সৈয়দ আহম্মদের উক্তি হইতে এই কথাটাই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে এদেশের প্রত্যেক মুসলমান "প্রথমে মুসলমান ও পরে ভারতীয়।" সাধারণতঃ চিন্তার দারুণ দৈন্য হইতে অথবা কোন গূঢ় অভিসন্ধি হইতে এই ধরণের প্রলাপোক্তি করা হয় কেন না মুসলমান বলিতে কোন ব্যক্তিবিশেষের ধর্মমত কি এইটুকু মাত্র বোঝায়, কোন বিশেষ দেশের সেই ব্যক্তি অধিবাসী অথবা কোন দেশের রাজনৈতিক অধিকার সে ভোগ করে তাহা কিছুই বোঝা যায় না। অতএব যদি কোন মুসলমান দাবী করে যে সে প্রথমে মুসলমান এবং পরে ভারতীয় তাহা হইলে ইহাই বোঝাইবে যে সে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যের উপরেও সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মীয় কর্তব্যকে স্থান দেয়। ইহাই হইল মিঃ জাফর আলি খান, সৈয়দ আহম্মদ এবং মুসলিম লীগের প্রচারিত প্যান্ ইসলামিজমের ব্যাখা এবং এই প্যান ইসলামিজমই হইল সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান শত্রু—যে জাতীয়তাবাদ হিন্দু জাতীয়তাবাদও নহে, মুসলিম জাতীয়তাবাদও নহে।

আহোম-নাগা সম্পর্ক

শ্রীদেবব্রত দত্ত

স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকারকে ছোট বড় নানা রকম আভ্যন্তরীণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এই সব সমস্যার মধ্যে পূর্বভারতে নাগা পাহাড়ের গণ্ডগোলকে অন্যতম বলা চলে। নাগা পাহাড়টি দৈর্ঘ্যে ৯০ মাইল, প্রস্থে ৪০ মাইল, এবং ইহার দুর্গমতা সমতলবাসীর নিকট অকল্পনীয়। ভারত সরকার তো এই নাগা সমস্যা লইয়া রীতিমত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নাগাদের উৎপাত যে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত হইয়াছে ইহা বলা চলে না, কেন না, এখনও মধ্যে মধ্যে দুষ্কৃতকারীদের অপকর্মের সংবাদ পাওয়া যায়। বর্তমানে নাগাপাহাড়ে সরকার-বিরোধীদের সংখ্যা কত ইহা কেহই সঠিক ভাবে বলিতে পারেন না; তবে ইহা সত্য যে পাহাড়ের দুর্গমতার সুযোগ লইয়া মুষ্টিমেয় লোকও দীর্ঘকাল সরকার-বিরোধী কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতে পারে। নাগা দৌরাত্মের কাহিনী নূতন নহে। ইংরেজকেও নাগা দমন করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে, ইংরেজ-পূর্ব আহোমগণকেও এই জাতির হস্তে কম ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় নাই।

আহোমদের উপজাতি নীতির সঙ্গে ইংরেজ বা বর্তমান ভারত সরকারের উপজাতি নীতির একটা মূলগত পার্থক্য আছে। ইংরেজ সমগ্র দেশের উপর সার্বভৌমত্ব দাবী করিত এবং এই দাবী কার্যকরীও করিয়া গিয়াছে। বর্তমানে ভারত সরকারও সমগ্র দেশের রাজনৈতিক ঐক্য অটুট রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এই ঐক্য বিনষ্টকারী কোন আন্দোলনই—সে সমতল অঞ্চলেই হউক আর দুর্গম পর্বতেই হউক—সহ্য করিতে রাজী নহে। আহোমদের নীতি কিন্তু ভিন্নরূপ ছিল। তাহারা সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ব্যাপিয়া নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু কখনও পার্বত্য উপজাতিদের বাসভূমি দুর্গম অঞ্চল সমূহের উপর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে নাই। সেই যুগের অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যে দুর্গম পাহাড়-পর্বত জয় করা সম্ভবপর ছিল না এই বাস্তব বুদ্ধি আহোমদের

ছিল। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে একজন বুড়াগোঁহাইন[১] দুর্ধর্ষ পার্বত্য দফলাদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'হাতীর যদি ইঁদুরের গর্তে প্রবেশ সম্ভবপর হয় তবেই শুধু দুষ্কৃতকারী দফলাদের পার্বত্য অঞ্চল হইতে বন্দী করিয়া আনা সম্ভবপর হইবে'।[২] পার্বত্য জাতি সম্পর্কে এই জ্ঞান আহোমদের কখনও নষ্ট হয় নাই, ফলে সুদীর্ঘ পাঁচশত বৎসর রাজত্বের মধ্যে তাহারা কখনও অস্ত্রবলে কোন পার্বত্য অঞ্চল জয়ে প্রয়াসী হয় নাই। তবে এই কারণে যে তাহাদিগকে পার্বত্য উপজাতি সমূহের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয় নাই এমন নহে, বরং উপজাতি সমস্যা তাহাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল। আহোম আমলের উপজাতি সমূহের মধ্যে নাগারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাগাদের সঙ্গে আহোমদের সবিরাম সংঘর্ষের কাহিনী আহোম আমলের বুরঞ্জীগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে।

নাগা পাহাড়ের সংলগ্ন সমতলভুমিসমূহে যে সব নাগা বসবাস করিত তাহাদের সঙ্গেই আহোমদের যুদ্ধ-বিগ্রহ হইত। এই নাগা অধ্যুষিত অঞ্চল বর্তমানে লক্ষীমপুর ও শিবসাগর জেলায় অবস্থিত ছিল। মোটামুটিভাবে পূর্বে বুড়িডিহিং এবং পশ্চিমে কপিলি নদী ছিল নাগা অধিকৃত অঞ্চলের সীমানা। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপনে প্রয়াসী না হইলেও আহোমগণ পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত সমতল অঞ্চলসমুহের উপর কর্তৃত্ব দাবী করিত। কর্তৃত্বের চিহ্ন স্বরূপ আহোমরাজ সমতল অঞ্চলের নাগাদের নিকট হইতে হাতীর দাঁত, তুলা, বর্শা প্রভৃতি অন্যান্য জিনিস খাজনা স্বরূপ আদায় করিতেন। নাগাদের সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য রাজা আহোম অভিজাত সম্প্রদায়ের লোককে যে ভাবে জায়গীর দিতেন, নাগা সর্দারগণকেও সেইভাবে জায়গীর প্রদান করিতেন। আহোম রাজ্যের আইন-কানুন নাগাদের মধ্যে চালু করিবার কোন চেষ্টা করা হইত না, কেবল শান্তি রক্ষাকল্পে নাগাদের মধ্যে রাজার একজন প্রতিনিধি থাকিতেন। সমগ্র নাগা অধ্যুষিত সমতল অঞ্চলকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। এই খণ্ডগুলি 'নাগাখাট' নামে পরিচিত ছিল। এক একটি নাগাখাটে এক একজন রাজপ্রতিনিধি থাকিতেন; তাঁহার উপাধি ছিল 'নাগাকটকী'।

১। আহোমরাজের প্রধান তিন মন্ত্রীর অন্যতম।

২। Anglo-Assamese Relation by Dr S. K. Bhuyan.

নাগাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রায় হস্তক্ষেপ না করিয়াও আহোমগণ নাগাদিগকে বশীভূত রাখিতে পারে নাই। নানা কারণে তাহারা প্রায়ই বিদ্রোহী হইয়া রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দৌরাত্ম্য করিত। বিশ্লেষণ করিলে নাগাদের পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহী হওয়ার কয়েকটি কারণ দেখা যায়। প্রথমতঃ, নিজেদের মধ্যে লোকসংখ্যার অভাববশতঃ তাহারা আহোম রাজার অন্যজাতীয় প্রজাদিগকে ধরিয়া নিয়া দাসরূপে খাটাইত। দ্বিতীয়তঃ, নুন-কূপের (salt mines) অধিকার লইয়া প্রায়ই তাহাদের বিরোধ বাধিত। নাগা অধ্যুষিত অঞ্চলে অনেকগুলি নুন-কূপ ছিল তাহারা অন্য কাহাকেও এইসব কূপের নুন ব্যবহার করিতে দিতে রাজী হইত না। অন্য জায়গায় নুনের অভাব হইলে রাজাগণকে বাধ্য হইয়া নাগাদের কূপ হইতে নুন সংগ্রহ করিতে হইত, এবং ইহার ফলে নাগাদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিত। সর্বশেষ আহোমরাজ পুরন্দরসিংহকেও নুন কূপের জন্য নাগাদের সঙ্গে লড়িতে হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, প্রকৃতিগত দুর্ধর্ষতা হেতু অনেক সময় তাহারা অকারণ রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দৌরাত্ম্য করিত। কোন রাজশক্তির নিকট স্থায়ীভাবে নতি স্বীকার করিয়া থাকা নাগা চরিত্র-বিরোধী। তবে বর্তমান শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার পরিবর্তনে তাহাদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে।

বুরঞ্জীগুলিতে রাজা চুকাফা (সর্বপ্রথম রাজা ১২২৯-৬৮), চুচেনফা (১৪৩৯-৮৮), চুহনেফা (১৪৮৮-৯৩), চুপিমফা (১৪৯৩-৯৭), চুহুংমুং (১৪৯৭-১৫৩৯), চুপাতফা (১৬৮১-৯৫) চুখ্রাংফা (১৬৯৫-১৭১৪), চুরমফা (১৭৫১-৬৯), চুহিতপঙ্গফা (১৭৮০-৯৫) কমলেশ্বর সিংহ (১৭৯৫-১৮১০) ও সর্বশেষ রাজা পুরন্দর সিংহের আমলে নাগা বিদ্রোহ ও দৌরাত্ম্যের কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজাদের সুদীর্ঘ তালিকা হইয়া নাগা সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে মনে কোন সন্দেহ থাকে না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বুরঞ্জীগুলিতে বর্তমানে নাগাদের যে সব শাখা আছে—যথা, অঙ্গামি, সেমা, আও, লোটা, রেংমা—সেগুলির নামের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বুরঞ্জী লেখকগণ নাগা শাখা উপশাখার নাম না দিয়া সব সময়ই নাগা গ্রামগুলির উল্লেখ করিয়াছেন।

বুরঞ্জীগুলিতে দেখা যায় বিদ্রোহ দমনকল্পে আহোমসৈন্য বিদ্রোহীদের গ্রাম ধ্বংস করিয়া দিত। নাগাদের যুদ্ধ-পদ্ধতির বিশদ কোন বিবরণ

বুরঞ্জীতে পাওয়া যায় না। এক জায়গায় 'জাটি বর্চাদা'[১]-য়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্চা অর্থাৎ বর্শা নাগাদের একটি প্রধান অস্ত্র এবং নাগা বর্শার খ্যাতি বহুল প্রচলিত। শত্রুকে বিপর্যস্ত করিবার নাগাদের অন্য উপায় ছিল পর্বতের উপর হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করা। আহোমরাজা রাজেশ্বর সিংহের আমলে বর্মী আক্রমণে বিতাড়িত হইয়া মণিপুররাজ জয়সিংহ আহোমরাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আহোমরাজ জয়সিংহকে নিজ রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে সেনাপতি হরনাথ ফুকনের নেতৃত্বে একদল সৈন্য মণিপুরের দিকে প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল নাগা পাহাড়ের ভিতর দিয়া মণিপুরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, কিন্তু পথের দুর্গমতা ও নাগাদের দৌরাত্ম্যে সৈন্যদল অর্দ্ধেক পথ হইতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। হরনাথ নাগাদের সম্বন্ধে রাজার নিকট বলিয়াছিলেন, 'The Nagas have killed many of our men……The Nagas did not allow us passage ; they used to roll down stones from hill-tops and kill our men by that method.'[২]

নাগারা পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহী হইলেও আহোমরাজগণ তাহাদের প্রতি নরম-গরম-নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভৌগোলিক কারণে কেবলমাত্র কঠোর নীতি গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল। বিদ্রোহী নাগারা অবস্থা বেগতিক দেখিলেই দুর্গম পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আহোম সৈন্যের আওতার বাহিরে চলিয়া যাইত। নাগাদের গ্রামে এমন কিছু সম্পত্তি থাকিত না যাহার আকর্ষণে তাহাদের আহোমদের নিকট চিরতরে নতি স্বীকার করিয়া থাকিবার প্রয়োজন ছিল। সাধারণ সভ্য মানুষ হইতেও তাহাদের প্রাণের মায়া কম। ধন-প্রাণের মায়া যাহাদের নিকট কম অস্ত্রবলে তাহাদিগকে বশীভূত রাখা সম্ভবপর নহে। আহোম-রাজগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহের পরও তাহারা নাগাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনে আগ্রহশীল হইয়াছেন। বিদ্রোহ দমনের পর নাগারা যখনই আসিয়া রাজার নিকট আনুগত্য স্বীকার করিত তখনই রাজা তাহাদিগকে উপঢৌকন দিয়া সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন।

১। পুরণি অসম বুরঞ্জি পৃঃ ১৬

২। Tungkhungia Buranji pp. 59-60.

রাজা গদাধর সিংহের (চুপাতফা) আমলে কয়েকবার নাগাদের সঙ্গে যুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি বিদ্রোহীদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে উপহার দিয়াছেন বলিয়া বুরঞ্জীতে উল্লেখ আছে। বর্তমানে আমরা ভারত সরকারের প্রেস নোটে 'hostile' ও 'loyal' এই দুই শ্রেণীর নাগার উল্লেখ দেখিতে পাই। Loyal নাগারা সরকারের প্রীতিভাজন। আহোম আমলেও অনুরূপ দুই শ্রেণীর নাগা ছিল এবং 'loyal' নাগারা যে সরকারের অনুগ্রহভাজন ছিল ইহার স্পষ্ট প্রমাণ বুরঞ্জীতে আছে। 'Those whose attitude to the king (Gadadhar Singha) was found to be pure and loyal were given presents and sent back to their respective villages.'[১]

বিদ্রোহ দমিত হওয়ার পর নাগারাও আনুগত্যের চিহ্নস্বরূপ রাজাকে নানা রকম উপঢৌকন দিত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে উপঢৌকনের মধ্যে নাগা কুমারীও থাকিত। চুকং নামক একজন রাজাকে 'নাগাও ভয় হৈ কোঞরি ১টা, হাতি ১টা দি মাতিলে।[২] রাজা গদাধর সিংহকে একবার নাগারা দাসদাসীসহ দুইজন রাজকুমারী উপহার দিয়াছিল।[৩] রাজকুমারী উপহার গ্রহণ করার মধ্যে আহোম রাজাদের নিশ্চয়ই একটা রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল। সম্ভবতঃ তাহারা ভাবিতেন যে বৈবাহিক সূত্রের মাধ্যমে বাঁধিতে পারিলে নাগাদের দৌরাত্ম্য হ্রাস পাইতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ তাহাদের এই পরিকল্পনা সফল হয় নাই।

আহোম রাজ্যে রাজার তিনজন প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। তাহাদের পদবী ছিল বুড়াগোঁহাইন, গোঁহাইন ও বড়পাত্র গোঁহাইন। শেষোক্ত পদটি সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে নাগা সংশ্লিষ্ট একটি কাহিনী বুরঞ্জীতে লিপিবদ্ধ আছে। একবার নাগা বিদ্রোহের সময় একজন নাগা সর্দার রাজা চুপিমফার প্রাণ রক্ষা করে। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহার একজন অন্তপুরচারিণীকে নাগার হস্তে সমর্পণ করেন। অন্তঃপুরচারিণী এই সময় গর্ভবতী ছিলেন। রাজা তাহার নাগা-বন্ধুকে বলিয়া দেন যে এই রমণীর গর্ভজাত পুত্র-সন্তানকে

১। Thungkhungia Buranji p 27

২। পুরণি অসম বুরঞ্জি পৃঃ ৫১

৩। Thunkhungia Buranji p 27

যেন রাজার নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হয়। রাজার কথামত নাগা সর্দার এক বৎসর পরে রাজার পুত্রকে রাজার নিকট ফিরাইয়া দেয়। রাজা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাহার নামাকরণ করা হয় কন্‌চেঙ্গ। কন্‌চেঙ্গের জন্য রাজা বড়পাত্রগোঁহাই নামক একটি নুতন পদের সৃষ্টি করেন। এই পদ সৃষ্টিকালে চুপিমফা রাজা-মন্ত্রীর সম্পর্ক বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি চমৎকার তুলনা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'রাজা একটি স্বর্ণপাত্রের মত। তবে এই স্বর্ণপাত্রের জন্য তিনটি রৌপ্যনির্মিত 'উধানের'[১] প্রয়োজন। উধানের উপর থাকিলে স্বর্ণপাত্রটির শোভা বৃদ্ধি পায়, উপরন্তু ইহা উল্টাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। বর্তমানে আমার বুড়াগোঁহাই নামক দুইটি উধান আছে, আমি বড়পাত্রগোঁহাই নামক তৃতীয় উধান তৈয়ার করিলাম।'[২] চাণক্য অর্থশাস্ত্রে রাজা এবং মন্ত্রী উভয়কেই রথের চাকার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। আমার মনে হয় চাণক্যের তুলনা হইতে আহোমরাজের তুলনাটি অধিকতর অর্থবোধক হইয়াছে, কেন না, রাজা এবং মন্ত্রী উভয়কেই রথচক্রের সঙ্গে তুলনা করায় মন্ত্রীর চেয়ে যে রাজপদের মর্যাদা বেশী ইহা ফুটিয়া উঠে নাই। সে যাহা হউক, কন্‌চেঙ্গের পর হইতে বড়পাত্রগোঁহাইর পদ বংশানুক্রমিকভাবে চলিতে থাকে। কন্‌চেঙ্গ শিশুকালে নাগার ঘরে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার বংশকে লোকে 'নাগা বড়পাত্রের ঘর' বলিত।

১। উধান-অসমীয়া শব্দ। ইহার অর্থ চুলার পিঁড়া।

২। পুরণি অসম বুরঞ্জি পৃঃ ১৭

এক সিপাহীর আত্মকথা

শ্রীশোভন বসু

(পূর্বানুবৃত্তি)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এতদিন শুনে আসছি যে ফরাসী সাহেবরা শিখ সৈন্যদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। এই যুদ্ধের পূর্বে কিন্তু তাঁরা সবাই এ দেশ ত্যাগ করে চলে যান; হয় তাঁরা সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজী হননি; কিম্বা সৈন্যদলে তাঁদের প্রভাবে ঈর্ষান্বিত হয়ে শিখ সর্দাররাই তাঁদের দেশ থেকে তাড়িয়েছেন। শিখ সেনাদলে আমি নিজে কখনও কোন বিলাতী (ইউরোপীয়ান) সাহেব দেখিনি এবং অন্য কেউ দেখেছে বলেও শুনিনি।

খালসাদের মত এমন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ভারতবর্ষে এর আগে কেউ করেনি; কিন্তু দেখা গেল তাদের নেতাদের এত বড় সৈন্যদল চালনা করবার মত ক্ষমতা ছিল না। যুদ্ধের সময় অনুকূল অবস্থার সুযোগ পেয়েও তারা কোন সুবিধা করতে পারেনি। তাদের অশ্বারোহী সেনাদল যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছে এমন কথাও কখন শোনা যায়নি। লাহোরে থাকবার সময় শিখদের বলাবলি করতে শুনেছি যে সর্দার তেজ সিং নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। কারণ ফিরোজশাহা আক্রমণের সময় ইংরাজ সৈন্যরা যে সেখান থেকে বহুদূরে ছিল—এ তিনি জানতেন। তা সত্ত্বেও তিনি বলেছিলেন যে তারা নাকি শিখদের পিছনেই আছে। এ যুদ্ধের কথা কিছু আগেই আমি উল্লেখ করেছি।

পুলের কাছে একটি ঘটনার কথা আমার মনে আছে। দেখি একজন গোরা সৈন্য বেয়নট দিয়ে একটি আহত সিপাহীকে, যতদূর মনে হয় শিখদলের হবে, মারতে উদ্যত হয়েছে, এমন সময় হঠাৎ সেই সিপাহীটি প্রাণ ভিক্ষা করল। এই যুদ্ধে কোন শিখ সৈন্যকে এমনভাবে দয়া ভিক্ষা করতে দেখিনি—সেজন্য এই দৃশ্য দেখে বেশ অবাক হয়েছিলাম। সিপাহীটি আবার ইংরাজীতে কথা বলছিল। গোরা সৈন্যটি কিন্তু তারপর তার মাথার পাগড়ী ও গায়ের জামা খুলে ফেলে তাকে লাথি মারতে লাগল এবং বেয়নটি দিয়ে তার শরীরে খোঁচাতে লাগল। অন্য কয়েকজন সৈন্যও আহত সিপাহীটির উপর এভাবে অত্যাচার করতে থাকে। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে এই লোকটি কোন এক ইউরোপীয় রেজিমেণ্ট থেকে পালিয়ে গিয়ে

শত্রু পক্ষে যোগ দিয়েছিল এবং এতক্ষণ শিখদের পক্ষে নিজের সঙ্গীদের বিরুদ্ধেই লড়াই করছিল।

কয়েকদিনের মধ্যেই সরকারের সেনাদল কুচ করে লাহোরে এসে পৌঁছল। সমগ্র পাঞ্জাব তখন কোম্পানী বাহাদুরের অধিকারে। সরকারের আক্রমণের সামনে দাঁড়ানর ক্ষমতা কারুর নেই, তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা বৃথা। ১৮৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে লাহোর এভাবে কোম্পানী বাহাদুরের অধিকারে আসে।

গভর্ণর জেনারেল সাহেবের সঙ্গে শিখ সর্দারদের এক বৈঠক হয়। লাহোরে একদল ইংরাজ সৈন্য রইল। খালসা সৈন্যদের সব অহঙ্কার এভাবে একেবারে ধুলোয় মিশে গেল। দলে দলে শিখ সৈন্যরা ইংরাজদের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করতে লাগল। এদের আচরণ বড় অদ্ভুত। সরকারের হাতে যে তারা পরাজিত হয়েছে এ তারা জোরগলায় স্বীকার করত; কিন্তু বলত ভবিষ্যতে আবার তাদের সুদিন আসবে।

পাঞ্জাবে লোকের ধারণা ছিল সরকার সে দেশ নিজেদের শাসনে রাখবে, হিন্দুস্থানের অন্যান্য অঞ্চলে ঠিক যেমন হয়েছে। কিন্তু উভয় পক্ষে সন্ধি হয়। সন্ধির সর্ত অনুসারে রাজা লাল সিং পাঞ্জাবের শাসনকর্তার পদে বসলেন; কাশ্মীর মহারাজা গুলাব সিংকে বিক্রয় করে দেওয়া হল এবং ইংরাজ সৈন্যদল নদী পার হয়ে আবার নিজেদের রাজ্যে ফিরে এল।

সরকারের ভাগ্য তখন খুব সুপ্রসন্ন। তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ানর কথা আর কেউই ভাবে না। শিখযুদ্ধের পূর্বে সরকারের সেনাদলে যে বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তাও দূর হয়েছে। কোম্পানী বাহাদুরের নসীব ছাড়া লোকের মুখে আর কোন কথা নেই। খালসাদের পরাজয়ের পর মুসলমানেরাও এখন একেবারে চুপ। তারা ভাবল ভাগ্যের বিরুদ্ধে যাওয়া নিছক বোকামী। কিন্তু ভাগ্যও ত সব সময় এক রকম থাকে না। মাদার গাছের বীজ যে বাতাসে ভেসে কোথায় পড়বে কে জানে?

এই যুদ্ধের পর আমাদের রেজিমেণ্ট আম্বালায় রইল। এখানে দু'বছর থাকার পর আমি জমাদারের পদে উন্নীত হলাম। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর সরকারের চাকরি করছি। এখন জমাদার হয়েছি সত্যি কিন্তু প্রথম চাকরিতে ঢোকার সময় টাকা কড়ি পাওয়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তা আর কোথায় হল? নিজের শরীরে সাতটি আঘাতের চিহ্ন ও চারটি পদক—এ ছাড়া লোককে দেখাবার আর কিছু নেই। এদিকে ক্রমেই বৃদ্ধ হয়ে পড়ছি। যাই হোক কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে সেনাদলে অফিসার হলাম। শাহর সৈন্যদলের সঙ্গে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমার বড় ছেলে আমাদের রেজিমেণ্টেই ছিল; এখন সে সিন্ধু দেশে আছে। দু'বছর তার কোন

খবর পাইনি। ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অনেক দেশী সিপাহী সেদেশ ছেড়ে চলে এসেছে, জ্বরের ভয়ে কেউ আর সে দেশে সহজে যেতে চায় না। ভারতের অন্য জায়গার চেয়ে গরমও সেখানে খুব বেশী। জ্বরের হাত থেকে প্রাণ নিয়ে এ দেশে ফেরার পরেও অনেকে নানা রকম অসুখে ভুগেছিল; কাজেই তাদের দিয়ে আর বিশেষ কোন কাজ করান যেত না। ছেলের কাছ থেকে শেষ যে চিঠি পেয়েছি তাতে সে লিখেছিল যে তাদের রেজিমেণ্টের সাতশ পঞ্চাশ জন লোক জ্বরে কাবু হয়ে পড়েছে এবং একটি ইউরোপীয় রেজিমেণ্টের অর্ধেক লোকের মৃত্যু হয়েছে। সে নিজেও হাসপাতালে আছে, বাঁচার আশা খুব কম। চিঠি লেখার চার সপ্তা আগে থেকেই সে আর চলা ফেরা করতে পারে না।

১৮৪৭ সালে মুলতানে দুজন ইংরাজ অফিসারকে হত্যা করা হয়। এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সরকার দেওয়ান মুলরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। মুলতান অবরোধ করা হল। শিখেরা আবার উত্তেজিত হয়ে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগল। তাদের যুদ্ধলিপ্সা যেন আবার জেগে উঠল। শোনা গেল শিখদের সঙ্গে সরকারের আবার যুদ্ধ হবে। সরকারের সেনাদল ফিরোজপুরের দিকে এগিয়ে চলল। আমাদের রেজিমেণ্ট এই দলের সঙ্গে ছিল। খুব ধীরে ধীরে মুলতান অবরোধ করা হচ্ছে দেখে শিখদের আত্ম বিশ্বাস খুব বেড়ে যায়। তারা বলতে লাগল এবার নিশ্চয়ই তাদের হাতে ফিরিঙ্গীরা পরাজিত হবে।

দিল্লী, মীরাট, আম্বালা প্রভৃতি স্থান থেকে প্রতিদিন সৈন্যদল ফিরোজপুরের আসত লাগল। একটি বিরাট ইংরাজ সেনাদল শতদ্রু নদী পার হয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশ করল। শিখেরা সর্দার শের সিংএর নেতৃত্বে ঝিলাম নদীর ধারে জমায়েৎ হয়েছে। সেখানে দু' তিনবার খণ্ড যুদ্ধের পর বছরের শেষ দিকে আমরা শিখ সেনাদলের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তারা তখন সবাই গভীর জঙ্গলের মাঝে ছাউনি ফেলে আছে; প্রথম দিকে যারা ছিল কেবল তাদিকেই আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। তাদের দলে কত লোক আছে এ কেউ সঠিক বলতে পারল না। গুপ্তচররা খবর এনেছিল যে তাদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার হবে; প্রতিদিনই নাকি তাদের দলে লোক বাড়ছে এবং তাদের সঙ্গে অনেকগুলি বড় কামান আছে।

শত্রুরা জঙ্গলের মধ্যেই বসে রইল; তাদের যুদ্ধ করার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। যাই হোক শীঘ্রই আমাদের উৎকণ্ঠার অবসান হল। প্রধান সেনাপতি একদিন তাঁর দলবল নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছিলেন এমন সময় শিখেরা তাঁকে লক্ষ্য করে কামান ছোঁড়ে। একজন সঙ্গীর মৃত্যু হওয়ায় লাটসাহেব খুব ক্রুদ্ধ হয়ে তখনই যুদ্ধের হুকুম দিলেন। তখন বেলা বারোটার ঘণ্টা পড়ছে। কিন্তু জঙ্গল এত গভীর যেন মনে হল আমরা অন্ধকার রাত্রে যুদ্ধ করছি। Grenadier কোম্পানীর পুরোভাগে ছিল ১০ নং রাইফেল কোম্পানী। আমাদের রেজিমেণ্টকে শিখ সৈন্যদল

বলে শত্রুরা ভুল করেছিল ; ভুল বুঝতে পারার আগেই অবশ্য আমাদের লক্ষ্য করে তারা কয়েকবার গুলি ছোঁড়ে।

আমাদের দলের কম্যাণ্ডিং অফিসার জ্বরে ভুগছিলেন। যুদ্ধ সুরু হওয়ার কয়েক-দিন আগে অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে চলে যেতে হল। তাঁর জায়গায় আর একজন কর্ণেল সাহেবকে পাঠান হয় ; আমরা তখন আক্রমণ করতে অগ্রসর হয়েছি, গুলিগোলা ছোঁড়া আরম্ভ হয়েছে। শত্রুর লালকুর্তা দেখে তিনি তাদের নিজের দলের লোক বলে মনে করলেন এবং নিশ্চয়ই আমরা আমাদের দলের লোকদেরই আক্রমণ করেছি এই ভেবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কামান ছোঁড়া বন্ধ করতে আদেশ দিলেন। কোন কোন অফিসার বললেন তারা সেই রেজিমেণ্টের সিপাহীদের কোমরে কালো রংএর বেল্ট দেখতে পাচ্ছেন ; তারা নিশ্চয়ই শিখ সৈন্য। সে সময় শিখেরা কালো অথবা বাদামী রংএর এবং ইংরাজ সিপাহীরা লালরংএর বেল্ট পরত।

জোর কদমে কর্ণেল সাহেব তখন সেই রেজিমেণ্টের দিকে, যাকে দেখে সবার সন্দেহ হচ্ছিল, ছুটে গেলেন। প্রায় দু'শ গজ দূরে একটি জঙ্গলের মধ্যে তারা তখন লুকিয়ে ছিল ; কাছাকাছি যেতেই তারা কর্ণেল সাহেবকে লক্ষ্য করে কামান ছুঁড়ল। কিন্তু কি ভাগ্য ! তাঁকে কোনরকম আঘাত লাগেনি। ফিরে এসে তিনি বললেন, "ঠিক আছে। সিপাহীলোক, গুলি চালাও।" কর্ণেলসাহেব খুব সাহসী পুরুষ, ভয় কাকে বলে তিনি জানতেন না। কিন্তু রেজিমেণ্টের আমরা কেউ তাঁকে চিনতাম না।

সারা দিনই যুদ্ধ চলল ; জয় পরাজয়ের কোন মীমাংসা হল না। শিখদের অনেক-গুলি কামান আমরা অধিকার করি এবং আমাদেরও কয়েকটি কামান তাদের হস্তগত হয়। গভীর জঙ্গলের ভিতর থেকে এমন হঠাৎ তাদের কামান গর্জে উঠত যে তাদের দলে কত কামান আছে তা বোঝা গেল না। একবার ২৪নং গোরা রেজিমেণ্ট শিখদের আক্রমণ করে ; কিন্তু কামানের গোলার আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে তারা ফিরে আসে। গোলন্দাজ সৈন্যদের পিছনেই কয়েক রেজিমেণ্ট শিখ সৈন্য লুকিয়ে ছিল। গোরা রেজিমেণ্টের অর্ধেক লোক মারা যায় এবং প্রায় কুড়িজন অফিসার হতাহত হয়েছিলেন। এদের সঙ্গে একদল দেশী সিপাহী ছিল ; তাদেরও অনেকে মারা গিয়েছিল। গোরা সৈন্যরাই যেখান থেকে পিছিয়ে আসছে তারা সেখানে কি টিকতে পারে ? সন্ধ্যার সময় শিখ সৈন্যরা রসুলপুর নামে একটি গ্রামে আশ্রয় নিল। গ্রামের চারদিকে তারা পরিখা খুঁড়েছিল। এই যুদ্ধকে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ বলা হয়—জানুয়ারী মাসের তের তারিখে এই যুদ্ধ হয়েছিল। সরকারের সেনাদল সারারাত যুদ্ধক্ষেত্রে বসে রইল ; কিন্তু এতো আর যুদ্ধ জয় করে বসে থাকা নয়। তার উপর রাত্রে বৃষ্টি আরম্ভ হল ; যুদ্ধক্ষেত্র যেন জলাভূমি হয়ে দাঁড়াল। এই গভীর জঙ্গল থেকে—যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল—অল্প দূরেই উন্মুক্ত প্রান্তর ; সেখানে লড়াই হলে অনেক সুবিধা হত।

সাধারণতঃ সরকারী ফৌজে যুদ্ধের সময় যেমন নিয়ম শৃঙ্খলা থাকে এবার তা ছিল না; তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের কি হুকুম পালন করতে হবে না হবে তা ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার আগেই লড়াই সুরু হয়েছিল। তাছাড়া যুদ্ধ যেখানে হবে সে জায়গাটি কেমন ইংরাজ অফিসাররা তা জানতেন না। এ না জানা থাকলে যুদ্ধের সময় ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়। আসলে এই যুদ্ধে সরকারকে নানারকম অসুবিধাই কেবল ভোগ করতে হয়েছিল। শিখেরা ভালভাবেই লড়েছিল; কিন্তু ফিরোজশাহর যুদ্ধের মত ভীষণভাবে তারা এবার আর গোলাগুলি ছোঁড়েনি। বেশ বোঝা গিয়েছিল যে সরকারের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধের পর শিখ সেনাদলের আর কোন উন্নতি হয়নি এবং সেবার শিখদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সিপাহীদের মনে যেমন ভয় বা অনিচ্ছা ছিল এবার আর তা ছিল না।

রসুলপুর একটি ছোট গ্রাম, চারদিকে গভীর খাদ, খাদের পাড় বেশ ঢালু; গ্রামের অল্প দূরেই ঝিলাম নদী। গ্রামের অবস্থান ভালভাবে জানা থাকলে হয়ত তা আক্রমণ করা যেত। কিন্তু ইংরাজরা কোন কিছু করলেন না। শিখেরা নির্বিঘ্নে গ্রামেই রইল। তারা গ্রামটির চারপাশে বড় বড় কামান বসিয়েছিল; কাজেই গ্রামের খুব কাছে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই সময়ে আমরা নদীতে স্নান করতে যেতাম, সেখান থেকে পানীয় জল নিয়ে আসতাম। শিখদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। তারা ভেবেছিল ইংরাজদের নিশ্চয়ই খুব বেশী ক্ষতি হয়েছে, সেজন্যেই তারা এমন ঝিমিয়ে পড়েছে; নইলে তারা কেন আর তাদের আক্রমণ করছে না? সত্যি বলতে কি এর কিছু সত্য, কিন্তু শিখেরা ত এর আগেই আমাদের শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছে; সেজন্যে তারাও আমাদের উপর আর উপদ্রব করে নি।

আমাদের কোম্পানীর একটি সিপাহী নিজের কৃতিত্বের কথা প্রায়ই বড়াই করে বলে বেড়াত। ভীষণভাবে আহত হয়ে একদিন সে তাঁবুতে ফিরে এল; গলায় গভীর আঘাতের চিহ্ন ও সারা মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সে বলল যে নালা থেকে জল নেওয়ার সময় একজন শত্রু সৈন্য তাকে আক্রমণ করে, সেও তাকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছোঁড়ে। কিন্তু এই লোকটির স্বভাব ছিল তিলকে তাল করে বলে বেড়ান। কাজেই তার কথা বিশ্বাস করলাম না। পরে শিখদের আত্মসমর্পণের পর খালসা সেনাদলের একজন হিন্দুস্থানী সিপাহী বলেছিল যে সে ঐ লোকটিকে নালায় জল পান করতে দেখে তাকে সেখান থেকে চলে যেতে বলে; কেননা শিখ সৈন্যরা তাকে দেখতে পেলেই মেরে ফেলবে। তার কথা শোনা ত দূরে থাক লোকটি উল্টে তাকেই গুলি করে; তবে গুলিটি তাকে লাগেনি। নিজের দেশের লোকের এমন ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে তখন ঐ হিন্দুস্থানী সিপাহীটি আমাদের কোম্পানীর লোকটিকে তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করে। তলোয়ারের আঘাতে তার শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায় এবং এই আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে মনে করে হিন্দুস্থানীটি তাকে সেখানে

ফেলে রেখে চলে যায়। এই ঘটনা জানাজানির পর সেই লোকটি আর কখনও বড়াই করে কিছু বলত না।

শিখ সওয়াররা প্রায়ই বাইরে এসে ইংরাজ সেনাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করত। একদিন লান্সার রেজিমেণ্টের একজন ও Dragoon রেজিমেণ্টের একজন গোরা সৈন্য এই আহ্বানে সাড়া দিলেন। যুদ্ধে এদের একজনের মৃত্যু হয় এবং আর একজন ভীষণভাবে আহত হন। ইউরোপীয়রা যুদ্ধে এভাবে পরাজয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে শিখ সৈন্যটিকে গুলি করে মেরে ফেলে। অফিসারদের বিনা অনুমতিতে তাঁবুর বাইরে যাওয়া এবং তার উপর যুদ্ধে পরাজিত হওয়া—এই সব কারণে অফিসাররা গোরা সৈন্যদের উপর ক্রুদ্ধ এবং অসন্তুষ্ট হলেন।

এই সময় যুদ্ধে আহত গোরা সৈন্য ও দেশী সিপাহীদের মধ্যে আচরণের পার্থক্য দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। গোরা সৈন্যরা আহত হলে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং তাদের সর্বনাশ কামনা করত; তারা কখনও যন্ত্রনায় আর্তনাদ করত না। কিন্তু দেশী সিপাহীদের গায়ে সামান্য একটু আঘাত লাগলেই তারা হাত পা ছুঁড়ে "সরকার বাহাদুর! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন," বলে চেঁচাত।

একদিন সকালে শোনা গেল শিখেরা এখন গ্রাম ছেড়ে নদীর দিকে চলে গেছে। ইংরাজরা ভেবেছিলেন মুলতানে যে সিপাহীরা অবরোধ করেছিল তারা এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। মুলতান ইতিমধ্যেই সরকারের দখলে এসেছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে এই সৈন্যরা এসে পড়ল এবং আমরা সবাই শিখদের বিরুদ্ধে এগিয়ে চললাম। তারা তখন গুজরাটে ছাউনি ফেলার আয়োজন করছে; গ্রন্থসাহেবে নাকি বলা আছে সেখানে থাকলে তাদের যুদ্ধে জয় হবেই। সর্দার চত্তর সিংও শিখদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তিনি মুলতান থেকে কোনরকমে অক্ষতদেহে পালিয়ে গিয়েছিলেন। গুজরাটে একটি যুদ্ধ হয়ে গেল; উভয় পক্ষই এ যুদ্ধে বড় কামান ব্যবহার করেছিল। সৈন্যদলের জিনিসপত্র পাহারা দেওয়ার ভার ছিল আমাদের রেজিমেণ্টের উপর; সে কারণে আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক পিছনে ছিলাম। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে আমার কোন চাক্ষুস অভিজ্ঞতা নেই। শত্রুপক্ষের সব কামানগুলি আমরা অধিকার করি; তাদের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং গ্রামটি আমাদের দখলে আসে। শিখ সৈন্যরা সব রাওলপিণ্ডির দিকে পালিয়ে যায়।

যুদ্ধের পরে কয়েকজন ইউরোপীয় পাইপ মুখে দিয়ে মাঠে বেড়াচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ বারুদের পাত্র থেকে বারুদ উড়ে এসে পাইপের আগুনে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণভাবে আগুন জ্বলে ওঠে। পাঁচ ছজন ইউরোপীয়, ও কয়েকজন সিপাহী এভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে কাতর আর্তনাদ করতে থাকেন এবং কিছুক্ষণ পরেই তাদের মৃত্যু হয়। এই লোকগুলি সঙ্গীদের কাছে ছুটে গিয়ে মিনতি জানায় তারা যেন তাদের গুলি করে মেরে ফেলে এই অসহ যন্ত্রণার হাত থেকে চিরতরে তাদের

মুক্তি দেয়। এদের মধ্যে ৭২নং N. I. বাহিনীর দু' একজন সিপাহী ছিল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাদের সারা দেহ একেবারে পুড়ে গিয়েছিল; তাদের গা থেকে মাংস গলে গলে পড়ছিল। শিখদের প্রায়ই আগুণে ভীষণভাবে পুড়ে যেতে দেখেছি, আহত অবস্থায় দেশলাইয়ের আগুণ থেকে কাপড়-জড়ান বারুদের থলিতে আগুণ লাগত এবং থলিটি ফেটে গিয়ে আগুণ ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু এই সিপাহীদের মত এমন মর্মন্তুদ-ভাবে মরতে এর আগে কাউকে দেখিনি। ভাগ্যের কি খেলা! দুটি যুদ্ধেই তাদের কোনরূপ আঘাত লাগেনি; যুদ্ধের পরে নিশ্চিন্ত মনে যখন বেড়াচ্ছে তখনই কিনা তাদের মৃত্যু হল। যুদ্ধের দেবতা বুঝি শুধু যুদ্ধের সময় মানুষের মৃত্যুতে তৃপ্ত হননি।

গুজরাটের যুদ্ধের পর শিখেরা ঝিলাম নদী পার হয়ে পালিয়ে যায়। আমাদের একটি ছোট দল পিছু নিয়ে রাওলপিণ্ডির পথে একটি পুরণো দুর্গের কাছে তাদের নাগাল ধরে ফেলে। একে ত যুদ্ধে এর আগেই নিজেদের সব কামান হারাতে হয়েছে; তার উপর এখন সরকারের সেনাদলের হাত থেকে পালানর আর কোন আশা নেই দেখে শিখেরা ইংরাজ জেনারেল সাহেবের কাছে আত্মসমর্পণ করল।

আত্মসমর্পণের পর শিখসেনাদের নিজেদের বাড়ী ফিরে যেতে বলা হয়েছিল। পথ খরচা বাবদ তাদের প্রত্যেককে একটি করে টাকা দেওয়ার কথা হয়। অল্প কয়েক জনই অবশ্য তা নিয়েছিল, বাকী সবাই ঘৃণায় তা প্রত্যাখান করে।

শিখদের সঙ্গে একদল আফগান সওয়ার ছিল। ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দোস্ত তাদের পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সবাই ঘোড়ার পিঠে চেপে একেবারে পেশোয়ার পার হয়ে আমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়। শুনলাম চিলিয়ানওয়ালায় তারা একবার আমাদের আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছিল; কিন্তু তাদের কাউকে আমি দেখিনি। মনে হয় তারা সব সময় আমাদের কামানের নাগালের বাইরে থাকত এবং আসলে যুদ্ধ না করে মুখেই কেবল বাহাদুরি করত।

চতুর্দশ অধ্যায়

মুলতানের পতন ও গুজরাটে শিখদের পরাজয়ের পর সমগ্র পাঞ্জাব সরকারের অধিকারে আসে। শিখদের সকল ক্ষমতা একেবারে চূর্ণ হয়ে গেল এবং প্রবল প্রতাপান্বিত কোম্পানী বাহাদুর পাঞ্জাবের শাসনভার গ্রহণ করলেন। সর্দারদের বন্দী করা হয়। অস্ত্রশস্ত্র সব কেড়ে নেবার পর তাদের সেনাদল ভেঙ্গে দেওয়া হল। শিখ সেনারা যে যার বাড়ীতে চলে গেল। লাহোর, উজিরাবাদ, ঝিলাম, রাওলপিণ্ডি এ্যাটক, পেশোয়ার ইত্যাদি প্রায় পাঞ্জাবের সব জায়গাতেই নির্বিঘ্নে ইংরাজ সৈন্যদল মোতায়েন করা হল। সত্যিই ইংরাজরা এক অদ্ভুত জাতি। ছ'মাসের মধ্যেই যেন যাদুমন্ত্রে দেশের রূপ একেবারে পাল্টে গেল। নানা জায়গায় সৈন্যদের ব্যারাক তৈরী

হল ; সাহেবরা নিজেদের বাড়ী তৈরী করলেন, দেশে পুলিস মোতায়েন করা হল। এই দেখে কে বলবে যে সেদেশে মাত্র অল্পদিন সরকারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমাদের রেজিমেণ্টকে এবার জলন্ধরে পাঠান হল। সরকারের সৈন্যবাহিনীতে পুরণো শিখ সৈন্যদের দুটি রেজিমেণ্টকে[১] নেওয়া হয়। দেশী সেনাদলে এরপর জোয়ান শিখদের নিয়োগ করা হতে লাগল। এতে সিপাহীরা খুব বিরক্ত হয়েছিল। হিন্দুস্থানী সিপাহীরা শিখদের পছন্দ করত না। শিখদের তারা বড় নোংরা মনে করত এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশা করত না। অনেক দিন পর্যন্ত শিখদের এ রকম অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। কিছুদিন পরে অবশ্য এই ঘৃণার ভাব কিছুটা দূর হয়েছিল। তা সত্ত্বেও শিখেরা অন্য সিপাহীদের কাছ থেকে দূরে একটু আলাদা হয়ে থাকত। সিপাহীরা এমন ভাব দেখাত যেন সেনাদলে যোগ দেওরার কোন অধিকার তাদের নেই। শিখেরা সাধারণতঃ, এমন কি প্যারেডের সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত না। মাথার লম্বা চুল তারা দই দিয়ে পরিষ্কার করত ; এজন্যে তাদের শরীর থেকে সবসময়েই দুর্গন্ধ বেরত। দীর্ঘদিন নিজেদের দেশ থেকে দূরে থাকার ফলে তাদের অনেকেরই আচার-ব্যবহার অবশ্য অনেকটা হিন্দুদের মত হয়ে গিয়েছিল।

কয়েক বছর হিন্দুস্থানে আর কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হয় নি। সরকারী ফৌজ ও দেওয়ানী আদালতে নতুন কয়েকটি পরিবর্তন ছাড়া এর মধ্যে আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। এই সব পরিবর্তন অবশ্য দেশের লোক ভাল মনে গ্রহণ করেনি ; তারা খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

১৮৫৫ সালে সুবা বাংলায় সাঁওতাল নামে একদল জংলী মানুষের সঙ্গে একটি ছোটখাট যুদ্ধ হয়। আমাদের রেজিমেণ্টকে এই যুদ্ধে পাঠান হয়েছিল। আমরা রাণীগঞ্জের কাছে ছাউনি করেছিলাম। এখান থেকে কিছু দূরেই কলকাতা সহর। এখানেই আমি সর্বপ্রথম লোহার রাস্তা ও বাষ্পীয় দৈত্য দেখি। এমন আশ্চর্য জিনিস এর আগে আর কখনও দেখিনি। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে লোকেরা বলল যে তাদের ধারণা ইংরাজরা এই লোহার বাক্সর মধ্যে একটি বলশালী দৈত্যকে বন্দী করে রেখেছে ; এবং বন্দী দৈত্যটি যখনই তার ভিতর থেকে পালিয়ে আসার চেষ্টা করে তখনই বাক্সের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করে। একজন অফিসার বলেছিলেন যে বাষ্প শক্তির জোরেই এই চাকা ঘোরে। কিন্তু আমার নিজে এ সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। অফিসারের মুখে এ কথা না শুনলে হয়ত আমারও ধারণা হত এই দৈত্যটি কাঠ, কয়লা বা পাথর ও মন মন জল খেয়ে বেঁচে আছে। রেল গাড়ীতে চেপে আমরা কলকাতায় চললাম। গাড়ী এমন জোরে ছুটতে লাগল যে আমার জ্ঞান

১। সীতারামের এখানে ভুল হয়েছে। এমন দুটি রেজিমেণ্ট প্রথম শিখ যুদ্ধের পর গঠন করা হয়েছিল।

হারাবার উপক্রম। কলকাতার কাছাকাছি পৌঁছে দেখি নীচ জাতের অনেক রকম লোকজন আনাগোনা করছে। অন্য লোকদের মতই তাদের আচার আচরণ। এটা কিন্তু আমার ভাল বোধ হয়নি এবং অনেকেই এ দেখে বিরক্ত হয়েছিল।

কলকাতা সহর দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। হুজুর! আপনার কাছে সহরের বর্ণনা করে লাভ কি? আপনি ত সবই ভালভাবে জানেন। জাহাজ যে এত বড় হতে পারে তা আমি কল্পনা করতেও পারিনি। আমি যা ভেবেছিলাম এক একটি তার চেয়ে একশগুণ বড়। সাহেবরা যে জাহাজে চড়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় তাতে অবাক হবার কিছু নেই। এক একটি জাহাজে এক রেজিমেণ্ট সৈন্য আসতে পারে। লাট সাহেবের বাড়ী কি বিরাট! শুনলাম ইংলণ্ডে প্রত্যেক ভদ্রলোকই নাকি এরকম বড় বাড়ীতে বাস করেন; তাহলে সে দেশ না জানি কি বিস্ময়কর! দেখলাম এই সহরে সাহেবরা নিজদের মধ্যে তেমন কথাবার্তা বলেন না; তারা নাকি পরস্পরকে ভালভাবে চেনেন না। তারা সকলেই যদি একটি ছোট দ্বীপ থেকে এসে থাকেন তাহলে এ কেমন করে সম্ভব হয় বুঝতে পারলাম না।

এই সাঁওতালদের অস্ত্র ছিল তীর ধনুক ও ধারাল কুঠার; তাই নিয়ে তারা যুদ্ধ করত। কিন্তু আমরা গুলি ছুঁড়লেই তারা পালিয়ে যেত। প্রথমে শোনা গিয়েছিল তারা নাকি বিষ-মাখান তীর ছুঁড়ছে, এজন্যে সবাই খুব ভয়ে ভয়ে ছিল। শীঘ্রই জানা গেল এ খবর সত্যি নয়। গভীর জঙ্গলের মধ্যে আমাদের সৈন্যরা অনেক দূর ঢুকে পড়ে এবং গ্রীষ্মকালে শোন নদের কাছে রাস্তায় সতর্ক পাহারা দেওয়ার ফলে এই বিদ্রোহ দমন হল। আমাদের রেজিমেণ্টকে আবার এক জায়গায় পাঠান হয়। কয়েকজন সাঁওতাল আমাকে বলেছিল যে আদালতে তাদের অভিযোগের ন্যায় বিচার হয় না বলেই তারা বিদ্রোহ করেছিল। তাদের অভিযোগ ছিল সব ধনী মহাজনদের বিরুদ্ধে। একবার মহাজনদের কবলে পড়লে তারা এদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ত। গরীব সাঁওতালদের আদালতে আমলাদের ঘুষ দেবার ক্ষমতা ছিল না। এই অভিযোগ কতদূর সত্যি তা আমি জানি না। কিন্তু সাঁওতালদের সঙ্গে এ যুদ্ধ ছিল বড় মজার। জঙ্গলের একদিকে আমরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছি; অন্যদিকে সরকার তাদের গাড়ী গাড়ী চাল দিয়ে সাহায্য করছেন।

এই সময় চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে সরকার শীঘ্রই নবাবের কাছ থেকে অযোধ্যা কেড়ে নেবেন। এই খবর শুনে সেনাদলে দারুণ উত্তেজনা দেখা দিল। সিপাহীরা অধিকাংশই অযোধ্যার লোক। তাদের সেখানে কারুর জমি জায়গা নেই। কাজেই সরকার অযোধ্যা কেড়ে নিন বা না নিন তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। এ সত্ত্বেও সবার মনে ভয় ও সরকারের বিরুদ্ধে কেমন এক ঘৃণা দেখা দেয়। এই বছরেই সরকার নবাবকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করে নিজের

অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ করলেন। সেখানকার লোকদের নিয়ে কয়েকটি পদাতিক ও সওয়ার রেজিমেণ্ট গঠন করা হয়। এই রেজিমেণ্টের নেতা ছিলেন কয়েকজন ইংরাজ অফিসার ও এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার সাহেব। এই অফিসার-দের অনেকেই বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে এসেছিলেন। এঁরা সিপাহীদের ভাষা, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি কিছুই জানতেন না। বাংলা দেশের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে যে সাহেবরা এসেছিলেন তারাও এমন ছিলেন। একরকম বিনা বাধায় সরকার অযোধ্যা অধিকার করলেন—এমন অতর্কিতে অধিকার করা হয় যে লোকে কোনরূপ বাধা দেওয়ার সময়ই পেল না। তালুকদার ও অন্যান্য ধনী লোকেরা সরকারের বিরুদ্ধে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তারা ভাবলেন যে সরকার নবাবের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছেন এবং এ ভাবে রাজ্য কেড়ে নেওয়া মোটেই সম্মানজনক হয়নি। লোকের মনে সরকারের বিরুদ্ধে এই মনোভাব জিইয়ে রাখার চেষ্টা অনেকেই করতে লাগল। তারা বলত যে সরকার শীঘ্রই বড়লোকদের ভূসম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত করবে। সরকার আদালতে প্রমাণ করবে যে ভূস্বামী-দের সম্পত্তিতে কোন আইনসম্মত অধিকার নেই। কার্যতঃ অযোধ্যায় অনেকেই অবৈধ উপায়ে সম্পত্তি দখল করেছিল। তাদের ভয় হল যদি এভাবে সরকার অনুসন্ধান করেন তাহলে সব সম্পত্তি হারাতে হবে। এই সব তালুকদারদের প্রত্যেকের সঙ্গেই অনেক আত্মীয়, পরিজন ও চাকর বাকর থাকত। কাজেই সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে এদের প্রত্যেকেরই স্বার্থ ছিল; এই কথা মনে রাখলে অযোধ্যার সর্বত্রই এবং এমন কি সরকারের ফৌজেও যে এ সময় প্রবল উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল তার কারণ বেশ বোঝা যাবে। আমার ধারণা অযোধ্যা অধিকারের জন্যই সিপাহীদের মনে অবিশ্বাস দেখা দেয় এবং তারা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। লক্ষ্ণৌএর নবাব এবং দিল্লীর বাদশার চরেরা সারা দেশে ফিরিঙ্গীরা তাদের প্রভুর সঙ্গে কি রকম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন সেই কথা বলে লোককে উত্তেজিত করতে থাকে। তাদের নানা রকম মিথ্যা গল্প বলত এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য তাদের প্রলোভন দেখাত। সিপাহীরা যদি সবাই একযোগে তাদের কথামত কাজ করে তাহলে তারা ইংরাজদের তাড়িয়ে দিয়ে আবার দিল্লীর বাদশাকে সিংহাসনে বসাবে।

এই সময় আবার হঠাৎ সরকার প্রত্যেক রেজিমেণ্ট থেকে লোক বাছাই করে বিভিন্ন সৈন্য ঘাঁটিতে সিপাহীদের নতুন রাইফেল চালনা শেখানর জন্য পাঠাতে লাগলেন। কিছুদিন এই ভাবে তারা বন্দুক ছোঁড়া শিখতে লাগল; তারপর কেমন করে জানিনা খবর রটে গেল যে এই বন্দুকের কার্তুজে গরু ও শুকরের চর্বি মাখান আছে। আমাদের রেজিমেণ্টের সিপাহীরা অন্য রেজিমেণ্টে এ খবর চিঠি লিখে জানিয়ে দিল। প্রত্যেক রেজিমেণ্টেই এ নিয়ে প্রবল উত্তেজনা। কেউ কেউ বলল

তারা প্রায় চল্লিশ বছর সরকারের চাকরি করছে ; কিন্তু তাদের ধর্মে কখনও হাত দেওয়া হয়নি। তবুও, আগে যে কথা বলেছি, আমার ধারণা অযোধ্যা অধিকারের জন্যই লোকে বেশী বিচলিত হয়েছিল। স্বার্থান্বেষী লোকেরা বলে বেড়াত যে ইংরাজদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ দেশের লোককে খ্রীষ্টান করা এবং এই কার্তুজ ব্যবহার করলেই তা সহজে সিদ্ধ হবে। কারণ কি হিন্দু কি মুসলমান দু' সম্প্রদায়ের লোকেরই এর জন্যে জাত নষ্ট হবে।

আমার অফিসারকে এই সব কথা বললাম ; তিনি তা গ্রাহ্য করলেন না। শুধু বললেন এ সম্বন্ধে আমি যেন আর কিছু না বলি। এর কিছুদিন পরে কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ বা গভর্ণর জেনারেলের একটি হুকুমনামা রেজিমেণ্টে পড়ে শোনান হয়। তাতে বলা হয়েছিল যে সরকার কোনরূপ আপত্তিজনক চর্বি ব্যবহার করেননি এবং ভবিষ্যতে সিপাহীরা নিজেরাই কার্তুজ তৈরী করবে এবং নিজেদের ইচ্ছামত চর্বি ব্যবহার করবে। তাদের ধর্মে আঘাত করা বা জাত নষ্ট করার কোন বাসনা সরকারের নেই—এ বিষয়ে সিপাহীরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। অনেকে ভাবল এই হুকুমনামা জারী করার অর্থই হল সরকার এ কাজ করেছেন, নইলে এমন কথা কেন তাদের শোনান হল। সরকারের উদ্দেশ্যই যদি এমন না হবে তবে তা এখন এভাবে অস্বীকার করার অর্থ কি ?

(ক্রমশঃ)

সংস্কৃত পত্র ও দলিল দস্তাবেজ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিতে যে ঐহিক জীবনের উপযোগী বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে, ইহা আজ আর নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সংস্কৃতসেবীরা যে সকলেই ইহবিমুখ ছিলেন না, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীনকালে লিখিত অসংখ্য দলিলপত্র ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে। পুরাকালের নানাবিধ ঐতিহাসিক তথ্য পণ্ডিতগণ অনেক দলিলপত্র হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত চিঠিপত্র অদ্যাবধি তাঁহাদের সমুচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্যদেশে পুরাতন চিঠিপত্রের ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই বিষয়ে গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। ইদানীং বাংলা পত্রসাহিত্যও পণ্ডিতগণের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে সংস্কৃত চিঠিপত্র ও কয়েকটি দলিল দস্তাবেজের ঐতিহাসিক মূল্য আলোচ্য।

চিঠিপত্রের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দেওয়ার প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। এইরূপ চিঠিপত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ :—

১। মাতৃচিত্রের নামাঙ্কিত 'মহারাজকনিকলেখ',

২। নাগার্জুনের 'সুহৃল্লেখ,

৩। চন্দ্রগোমীর 'শিষ্যলেখধর্মকাব্য'।

ইহাদের মধ্যে প্রথম গ্রন্থটি ৮৫টি শ্লোকে রচিত। রাজা কনিকের সভায় নিমন্ত্রণের উত্তর হিসাবে ইহা রচিত। F. W. Thomasএর মতে, এই মাতৃচিত্র ও মাতৃচেট অভিন্ন ব্যক্তি এবং কনিক কুষাণরাজ কনিষ্ক ভিন্ন অপর কেহ নহেন। এই অনুমান ঠিক হইলে গ্রন্থের রচনাকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় ১ম—২য় শতক।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি ১২৩টি শ্লোকে রচিত। ইহা বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন কর্তৃক পত্রচ্ছলে তদীয় বন্ধু রাজা উদয়নের উদ্দেশ্যে লিখিত। ইহাতে বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম সংক্ষেপে মনোজ্ঞ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নাগার্জুন খৃষ্টীয় ৩০০ হইতে ৪০০ অব্দের মধ্যে কোন কালে জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে করা হয়।

শেষোক্ত গ্রন্থটি ১১৪টি শ্লোকে রচিত। ঐশ্বর্য ও শক্তির মোহে অন্ধ রত্নকীর্তি নামক এক রাজকুমারকে ধর্মপথে প্রবর্তিত করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। চন্দ্রগোমীকে সাধারণতঃ খৃষ্টীয় ৫ম শতকের লোক বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন।

এই তিনটি গ্রন্থ ঠিক পত্রের পর্যায়ে পড়ে না। ইহারা এক প্রকার কাব্য; কারণ, ইহাদের মধ্যে পত্রের আঙ্গিকের কোন পরিচয় নাই।

পত্ররচনা পদ্ধতি সম্বন্ধে বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত 'লিখনাবলী' নামক একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিবার সুযোগ হয় নাই বলিয়া ইহার সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করা যায় না।

Aufrecht এর Catalogus Catalogorum (২।৭০) নামক পুঁথির তালিকায় 'পত্র প্রশস্তি কাব্য' নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

আজ পর্যন্ত উল্লিখিত বিষয়ক যে কয়টি সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাইয়াছি, উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) বররুচির 'পত্রকৌমুদী',

(২) অজ্ঞাতনামা লেখকের 'লেখপদ্ধতি',

(৩) দলপতিরায়ের 'যাবনপরিপাট্যনুক্রম'

'পত্রকৌমুদী' সম্ভবতঃ এখনও অপ্রকাশিত।[১] 'লেখপদ্ধতি' প্রকাশিত হইয়াছে।[২]

'পত্রকৌমুদী' বররুচির নামাঙ্কিত। গ্রন্থের প্রারম্ভিক একটি শ্লোকে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, তিনি 'কীর্তিসিন্ধু' বিক্রমাদিত্যের আদেশে ইহা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু, ভারতের অনেক প্রাচীন রাজাই এই দৃপ্ত উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সুতরাং, ইহা হইতে লেখকের জীবনকাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না। সমস্যাটি জটিলতর হইয়াছে আরও একটি কারণে। আজ পর্যন্ত বররুচি নামে অন্ততঃ ছয়জন পণ্ডিতের নাম পাওয়া গিয়াছে। এই অবস্থায়, 'পত্রকৌমুদী' কারের পরিচয় বা কাল সম্বন্ধে ঠিক কিছু বলিবার উপায় নাই। তবে, এই গ্রন্থের একটি শ্লোক[৩] হইতে মনে হয় যে, ইহার রচনাকালে সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাকৃত ভাষারও প্রচলন সমাজে ছিল।

'পত্রকৌমুদী'র বিষয়বস্তু সংক্ষেপে নিম্নলিখিতরূপ।

পত্র সোনালী বা রূপালী রঙে রঞ্জিত হইবে। উত্তম, মধ্যম ও সামান্য ভেদে পত্র ত্রিবিধ। ইহাদের কাগজের দৈর্ঘ্য হইবে যথাক্রমে এক হাত ছয় আঙ্গুল, এক হাত ও মুষ্টিহস্ত। পত্রের কাগজে তিনটি ভাঁজ থাকিবে। উপরের ভাঁজ দুইটি শূন্য রাখিয়া অবশিষ্টাংশে পত্রের বিষয় লিখিত হইবে।

১। বর্তমান লেখক কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদসহ সম্পাদিত এই গ্রন্থ Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute এ প্রকাশের প্রতিক্ষায় আছে।

২। গাইকোয়ার্স ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, সংখ্যা ১৯।

৩। ভাষায়াং সংস্কৃতেনৈব কুশলং বিলিখেৎ সুধীঃ।
ততঃ শুভাশুভাং বার্তাং সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈস্তথা॥

রাজলিপির লেখকের নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা আবশ্যক :—

(১) রাজনীতি ও সামাজিক নীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা,

(২) বিবিধ ভাষা ও লিপিতে ব্যুৎপত্তি,

(৩) সন্ধি, বিগ্রহ ও রাজকর্তব্যে জ্ঞান,

(৪) রাজার প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষা,

(৫) সত্যবাদিতা, সংযম, বিবেক ও "আর্জব।"

রাজলেখক রাজাদেশে প্রথমতঃ একটি খসড়া প্রস্তুত করিবেন। তৎপর নিভৃতে রাজা উহা শ্রবণ করিবেন। অবশেষে, তাঁহার অনুমোদন পাইলে, পত্রটি লিখিত হইবে।

পত্রের চিহ্ন-প্রয়োগের রীতিনীতি কৌতুকাবহ। প্রথমতঃ পত্রে একটি অঙ্কুশচিহ্ন অঙ্কিত হইবে। অঙ্কুশের ঠিক নীচে থাকিবে ৭-এই সংখ্যাটি এবং মধ্যভাগে থাকিবে একটি বিন্দু। ইহার পরে লিখিত হইবে দুইটি শব্দ—স্বস্তি ও শ্রী, এবং তৎপর থাকিবে পত্রপ্রাপকের পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রশস্তি বা পাঠ। এই পর্যন্ত পত্রের বহিরঙ্গ। পত্রের প্রকৃত বিষয় আরব্ধ হইবে কুশলজিজ্ঞাসা দিয়া। ইহার পর লিখিত হইবে শুভাশুভ বার্তা এবং অন্যান্য বিষয়। নিম্নাংশে রচিত হইবে 'কীর্তিপ্রীতিযুত' একটি পদ্য। তৎপর 'কিমধিকম্' ইত্যাদি লেখা বিধেয়। উপসংহারে থাকিবে 'অঙ্কমাসাদিসংযুত' অর্থাৎ তারিখ মাস প্রভৃতির উল্লেখযুক্ত অপর একটি শ্লোক। ইহাতে সম্ভবতঃ প্রেরকের নামেরও উল্লেখ থাকা বিধেয়।

পত্রবহনেরও বিভিন্ন প্রণালী 'পত্রকৌমুদীতে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। রাজলিপি, আচার্য, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও পতির পত্র—এইগুলি শিরে বহন করিতে হইবে। মন্ত্রিপত্রের যোগ্যস্থান কপাল। পত্নী, পুত্র ও মিত্রের পত্র বহন করিতে হইবে বক্ষের মধ্যস্থলে। শত্রুর পত্র নিবার বিধান কণ্ঠে বাঁধিয়া।

রাজার নিকট লিখিত চিঠি তাঁহার লেখক সভাস্থ রাজার সম্মুখে স্থাপন করিয়া নিজে নীরবে উহা পাঠ করিবেন। বিষয় তেমন গুরুতর বা অপ্রিয় না হইলে উহা সকলের সম্মুখে পাঠ করিবেন।

রাজা, মন্ত্রী, পণ্ডিত ও আচার্য, প্রভৃতির পত্রে যথাক্রমে কস্তুরী বা কুঙ্কুম, শুধু কুঙ্কুম, চন্দন, ইত্যাদি দ্রব্যের বর্তুলাকার চন্দ্রবিম্বসদৃশ একটি চিহ্ন অঙ্কিত করিতে হইবে। পিতা, পুত্র ও সন্ন্যাসীর পত্রে চন্দন-চিহ্ন থাকিবে। পিতা, পত্নী, ভৃত্য ও শত্রুর পত্রে এই চিহ্ন হইবে যথাক্রমে সিন্দুর, অলক্ত ,রক্তচন্দন ও রক্ত।

বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি লিখিত পত্রের আরম্ভপ্রকার ছকে বাঁধা। রাজার নিকট লিখিত চিঠি আরম্ভ হইবে 'মহারাজাধিরাজ', 'দানশৌণ্ড', প্রভৃতি শব্দদ্বারা। মন্ত্রীর চিঠিতে থাকিবে তাঁহার গুণাবলীর উল্লেখ। পণ্ডিত ব্যক্তিকে লিখিত পত্রের আরম্ভ করিতে হইবে প্রণামের সংখ্যা ও তাঁহার শাস্ত্রপারদর্শিতার উল্লেখ করিয়া। আচার্যের

চিঠির প্রারম্ভে থাকিবে তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও লেখকের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের উল্লেখ। 'প্রাণপ্রিয়া'দি শব্দে আরম্ভ করিতে হইবে পতির উদ্দেশ্যে লিখিত পত্র। 'প্রাণপ্রিয়া' 'সাধ্বী' ও 'সচ্চরিতা', প্রভৃতি শব্দে পত্নীসমীপে প্রেরিত পত্র আরব্ধ হইবে। পত্রে প্রণতিজ্ঞাপন ও 'প্রভু' এবং 'সচ্চরিত' ইত্যাদি শব্দে পুত্র পিতাকে সম্বোধন করিবেন। সন্ন্যাসীকে লিখিত পত্রে থাকিবে 'সর্ববাঞ্ছাবিনির্মুক্ত', 'শাস্ত্রার্থপারগ'—এই জাতীয় বিশেষণ। সাধারণ পত্রাদিতে প্রাপকের নামোল্লেখ করিয়া তদুপযোগী পদের প্রয়োগ করা বিধেয়।

পত্র-প্রাপকের পদমর্যাদা অনুযায়ী 'শ্রী' পদটির সংখ্যা নির্ধারিত হইবে। আচার্য, পতি, ভৃত্য, শত্রু, মিত্র, ইহাদের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রে 'শ্রী' পদের সংখ্যা হইবে যথাক্রমে ছয়, পাঁচ, দুই, চার, তিন। পুত্র ও পত্নীকে লিখিত পত্রে শ্রী একবার মাত্র লিখিতব্য।

'লেখপদ্ধতি' যে সমস্ত পুঁথি অবলম্বনে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাদের একটিতে গ্রন্থের নাম আছে 'লেখপঞ্চাশিকা'। অপর একটি পুঁথিতে গ্রন্থের প্রথম ভাগের নাম 'লেখপদ্ধতি' এবং শেষভাগকে বলা হইয়াছে 'লেখপঞ্চাশিকা'। ইহার সংকলয়িতার নাম নাই। ইহার রচনাকালও নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। 'লেখপঞ্চাশিকা'র পুঁথির তারিখ রহিয়াছে ১৫৩৬ সংবৎ অর্থাৎ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ। 'লেখপদ্ধতি'র অপর একখানি পুঁথির তারিখ ১৫৩৩ সংবৎ বা ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দ। প্রত্নলিপিতাত্ত্বিক (Paleographical) সাক্ষ্য হইতে 'লেখপদ্ধতি'র সম্পাদকদ্বয় অনুমান করেন যে, অপর দুইখানি পুথির অনুলিপিকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের কোন সময়ে। সমস্ত পুঁথির অনুলিপিকাল গুলির মধ্যে ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দই প্রাচীনতম। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মূল গ্রন্থের রচনাকালের নিম্নতর সীমারেখা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় পাদ।

'লেখপদ্ধতি'র দলিলপত্রাদিতে কতগুলি তারিখ লিখিত আছে। এই তারিখগুলির মধ্যে প্রাচীনতম ৮০২ সম্বৎ এবং সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন ১৫৩৩ সংবৎ। এই তারিখগুলি যে শুধুই উদাহরণস্বরূপে দেওয়া হইয়াছে তাহা মনে হয় না; কারণ, কোন কোন দলিলের তারিখের সহিত তন্মধ্যে যে ঘটনার উল্লেখ আছে তাহার ঐতিহাসিক কাল মিলিয়া যায়। যেমন, 'লেখপদ্ধতি'র একটি তাম্রশাসন' ভীমদেবের রাজত্বকালে সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে, উহার সম্পাদন কাল ১২৮৮ সম্বৎ বা ১২৩২ খৃষ্টাব্দ। অন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ হইতেও জানা যায় যে, ভীমদেব ঠিক ঐ সময়েই রাজত্ব করিতেন। আবার, সিংহণ বা সিঙ্ঘণদেবের সহিত লাবণ্যপ্রসাদের এক 'যমলপত্রে'র' (সন্ধিপত্র) সম্পাদন-কাল ১২৮৮ সংবৎ

১। লেখপদ্ধতি পৃঃ ৫, পংক্তি ১৭।

অর্থাৎ ১২৩২ খৃষ্টাব্দ। জানা গিয়াছে যে, সিংহণদেব নামক জনৈক যাদবরাজ ১১৩১-১১৬৯ শকাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অব্দে এই কাল ১২০৯-১২৪৭। এই সমস্ত কারণে মনে হয় যে, তারিখযুক্ত দলিলগুলি প্রকৃত দলিলেরই অনুরূপ। যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে তারিখবিশিষ্ট দলিলগুলির সম্পাদনকাল খৃষ্টীয় ৭৪৬-১৪৭৭ অব্দের মধ্যে। অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে-সকল প্রকৃত দলিলপত্র পাওয়া গিয়াছিল সংকলয়িতা সেইগুলির সংকলন করিয়াছিলেন এবং অপর কতগুলি তারিখবিহীন আদর্শও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অবশ্য সংকলনকাল নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব।

'লেখপদ্ধতি'তে গুজরাটী শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা হইতে মনে হয়, গ্রন্থটি গুজরাট অঞ্চলেই সঙ্কলিত হইয়াছিল। গুজরাটের রাজগণের নাম ও ঐ রাজ্যের কতক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ হইতেও গ্রন্থটির উৎপত্তিস্থল গুজরাট বলিয়াই মনে হয়।

এই গ্রন্থস্থিত আদর্শ কতক রাজকীয় দলিল পত্রে কতগুলি তারিখ লিখিত আছে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করা হইয়াছে যে, তারিখগুলিকে দলিল-সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা দেখিয়াছি যে, ঐ দলিলগুলির প্রাচীনতম তারিখ ৮০২ সম্বৎ বা খৃষ্টীয় ৭৪৬ এবং সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন তারিখ ১৫৩৩ সম্বৎ অথবা ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দ। ঐ দলিলসমূহ হইতে শুধু যে দলিলের লিখনপদ্ধতিরই সন্ধান পাওয়া যায় তাহা নহে। তদানীন্তন কালে রাষ্ট্রের সহিত প্রজাগণের সম্বন্ধ, জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে ঐ দলিলপত্রের সাক্ষ্য নিতান্ত নগণ্য নয়। বর্তমান প্রসঙ্গে ঐ দলিলগুলি অবলম্বনে সামাজিক ও রাজনৈতিক একটি চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস করা যাইতেছে।

এখানে বলা আবশ্যক যে, এই চিত্র সমগ্র ভারতের নহে; গুজরাট অঞ্চলের। গুজরাটেরও উল্লিখিত কালসীমার, অর্থাৎ মোটামুটি অষ্টম হইতে পঞ্চদশ শতকের, মধ্যে যে অবস্থা ছিল তাহাই সম্ভবতঃ এইগুলিতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

রাজনৈতিক অবস্থা ও শাসনপদ্ধতি

রাজ্যটি কতগুলি ভাগে বিভক্ত ছিল। ইহার এক একটি ভাগ যাঁহার শাসনাধীনে ছিল তাঁহাকে বলা হইত দণ্ডনায়ক। ইনি রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ গণ্য হইতেন এবং ঐ অঞ্চলে তাঁহার শাসনই সকলের মান্য ছিল।

এক একটি গ্রাম সম্ভবতঃ রক্ষপাল নামক এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর পরিচালনা-

ধীনে থাকিত। 'ক্ষুদ্র-উপদ্রব' হইতে গ্রামকে রক্ষা করাই ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। নির্দিষ্টসংখ্যক অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য সরবরাহও তাঁহার অন্যতম কর্তব্য ছিল। তাঁহার ভরণপোষণের জন্য তাঁহাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের ভূমি দান করিবার ব্যবস্থা ছিল বলিয়া মনে হয়।

যে সমস্ত ভূমির প্রকৃত অধিকারী সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিত উহাদিগকে বলা হইত 'ডোহলিক'। এইরূপ ভূমি সরকারের পরিচালনাধীনে গ্রহণ করা হইত। প্রকৃত অধিকারী অবশ্য সন্তোষজনক প্রমাণাদির বলে উহা মুক্ত করিতে পারিত ; এই মুক্তিপত্রের নাম ছিল 'ডোহলিকামুক্তি'।

যে সকল সর্তে গ্রাম দান করা হইত সেই সকল সর্তভঙ্গের অপরাধে গ্রাম সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত ; এইরূপ বাজেয়াপ্ত করার নাম ছিল 'ব্যাষেধ'।

কতক প্রকার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ অপরাধীকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। এই দণ্ড গুরুতর হইলে কিস্তীবন্দীর বিধান ছিল বলিয়া মনে হয়।

কোন রাজকর্মচারীকে স্থানান্তরে বা কার্যান্তরে নিযুক্ত করার জন্য যে আদেশ দেওয়া হইত তাহার নাম ছিল 'নিরূপণা'। এইরূপ আদেশপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁহার নিকট রক্ষিত 'মুদ্রা' (Seal), 'পদলেখ্যক' (যে খাতাতে আয়ের বিভিন্ন দফা লিখিত থাকে), 'পোতক' (গ্রাম হইতে উৎপন্ন রাজস্ব) ও দৈনিক হিসাবের বহি প্রভৃতি বুঝাইয়া দিয়া স্থানান্তরে বা কার্যান্তরে যোগদান করিতে পারিত।

অশ্ববিক্রয়ের ব্যাপারে বিক্রয়দলিল সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা ছিল বলিয়া মনে হয়। যে সমস্ত অশ্বের বিক্রয়দলিল থাকিতনা, তাহাদের অধিকারিগণকে রাজ-কর্মচারীরা সন্দেহের চক্ষে দেখিত।

বণিক্‌দিগকে সংশ্লিষ্ট রাজকর্মচারিগণ 'টিপ্পনক' নামে একটি লিখন দিত। ইহাতে ঐ বণিকের নিকট কি দ্রব্য কত পরিমাণ আছে তাহা লিখিত থাকিত। ঐ 'টিপ্পনক' অনুসারে পথিমধ্যস্থিত কর্মচারীরা শুল্ক আদায় করিত ; কিন্তু বিনা রসিদে নয়। এই রসিদের নাম ছিল 'প্রতিটিপ্পনক'। 'মার্গাক্ষর' নামক এক রাজকীয় লিখনে বণিকের মালবোঝাই গাড়ীর সংখ্যা ও পথে তাহার দেয় শুল্কের পরিমাণ লিখিত থাকিত। 'দেশোত্তার' নামক এক পত্রে 'মহন্তক' (হিসাব-রক্ষক) 'বৃহদ্বাজিক' (পুলিশ কর্মচারী) ও 'হিণ্ডীপক' (রাজস্বকর্মচারী) প্রভৃতির প্রতি রাজার আদেশ লিখিত থাকিত। ঐ আদেশে কতক বণিক্‌কে রাজ্যের নির্দিষ্ট স্থানের মধ্য দিয়া নির্দিষ্ট মাল নিয়া অবাধে ও কর আদায় না করিয়া যাইতে দেওয়ার নির্দেশ থাকিত।

বিচারালয়ে কাহারও চরিত্র সম্বন্ধে কোন অভিযোগ উপস্থাপিত হইলে একটি বিদ্বৎপরিষৎ বিচার করিতেন। প্রথমতঃ, অভিযোক্তা (plaintiff) অভিযোগ-

পত্র দাখিল করিত ; ইহাকে বলা হইত 'ভাষা'। তৎপর অভিযুক্ত ব্যক্তি (defendant) তাহার উত্তর দান করিত। চাক্ষুষ সাক্ষী বা নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ না থাকিলে এরূপ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কোন শাস্তি দেওয়া হইত না। 'ন্যায়বাদ' বা judgment এ বিচারকগণের সিদ্ধান্তের তারিখ, মাস, বৎসর, সংক্ষিপ্ত বিচার্য-বিষয় এবং বিচারকগণের নিষ্পত্তি প্রভৃতি লিখিত থাকিত। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি দিব্য প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিত ; অর্থাৎ, অগ্নি, বিষ প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিত যেন তাহারা তাহাকে দোষী কি নির্দোষ প্রতিপন্ন করিয়া দেয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযোগের ক্ষেত্রে পরিষদ বিবাদের মীমাংসা করিয়া উভয়পক্ষ হইতে একটি করিয়া 'শীলপত্র' লইতেন। তাহারা ভবিষ্যতে সৎভাবে জীবনযাপন করিবে বলিয়া শীলপত্রে প্রতিশ্রুতি থাকিত।

শত্রুর সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার মিত্রশক্তির 'সান্ধিবিগ্রহিক' মন্ত্রীর নিকট সাহায্যের জন্য লিখিতেন।

পরস্পরের মধ্যে শান্তিরক্ষার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত দলিল দুই রাজার মধ্যে সম্পাদিত হইত। অপর শক্তি কর্তৃক আক্রমণ এবং অবং অন্যান্য সম্ভাব্য বিপদে একের প্রতি অপরের সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতিও এইরূপ দলিলে লিখিত থাকিত।

রাজার অন্তঃপুরের সম্বন্ধেও ব্যবস্থা ছিল সুদৃঢ়। যুবরাজের পত্নীকে রাজা রীতিমত লিখিত আদেশে জানাইয়া দিতেন যে, যুবরাজের অনুপস্থিতিকালে তিনি যেন কতক নিয়ম সযত্নে পালন করেন। নিয়মগুলির মধ্যে কতক বিধি ও কতক নিষেধ। গোলা হইতে খাদ্যশস্য বাহির করিয়া দেওয়া, পোষ্যবর্গ ও দাসীদিগকে অন্নবস্ত্র দান প্রভৃতি তাঁহার বৈধ কর্ম। পরপুরুষ দর্শন, পরগৃহে গমন, রাজপ্রাসাদের বহির্গমন ইত্যাদি তাঁহার পক্ষে ছিল নিষিদ্ধ।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

'শাসনপত্র' সহ ব্রাহ্মণগণকে গ্রাম দানের ব্যবস্থা ছিল। এই শাসনপত্রে দাতা ও গ্রহীতার নাম, ভূমির পরিমাণ ও সীমা, তারিখ প্রভৃতি লিখিত থাকিত। ইহাতে জনসাধারণ ও দাতার উত্তরাধিকারিগণের উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা থাকিত যেন তাহারা ঐ ভূমির ভোগে কোন ব্যাঘাত না ঘটায়।

রাজস্বের পরিমাণ হিসাবে গ্রামগুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত। 'সমকর' শ্রেণীর গ্রামের রাজস্বের হার নির্দিষ্ট ছিল। 'উদ্ধ' শ্রেণীর গ্রামগুলির করের মোট একটা পরিমাণ থাকিত নির্দিষ্ট।

রাষ্ট্রের হিতকর কার্যের পারিতোষিক স্বরূপ রাজা কতক লোককে স্থায়ী

লিজ্-এ (perpetual lease) বাড়ী দিতেন। এই লিজদলিলের নাম ছিল 'গুপ্তপট্টক'।

রাষ্ট্রকে আর্থিক সাহায্য করার পুরস্কারস্বরূপ ব্যবসায়ীরা সামান্য করে ভূমি ভোগ করিবার অধিকার লাভ করিতেন। তাঁহাদিগকে এই সম্বন্ধে যে দলিল দান করা হইত তাহার নাম ছিল 'উত্তরাক্ষর'।

গ্রামাঞ্চলে পরস্পরের 'মস্তকস্ফোটন', রাজাজ্ঞার অবমাননা, চর্মচৌর্য প্রভৃতি অপরাধই লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। এই সমস্ত অপরাধের শাস্তিস্বরূপ বিহিত অর্থদণ্ডের পরিমাণ হইতে মনে হয় যে, চর্মচৌর্যই ছিল গুরুতর অপরাধ। সম্ভবতঃ চর্মের ব্যবসায় তৎকালে ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণের একটি প্রধান উপজীবিকা ছিল।

পঞ্চাল অঞ্চলের কৃষকদিগের জমির বিলিব্যবস্থা ছিল মোটামুটি এইরূপ :—

(১) রাজস্বের হার বা মোট পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া জমি কৃষকগণকে দেওয়া হইত।

(২) প্রতি কৃষকের দলিলে নির্দিষ্ট তারিখে তাহার দেয় রাজস্ব দিতে হইত।

(৩) কৃষিজাত দ্রব্যের ⅙ অংশ ছিল রাজার প্রাপ্য এবং অবশিষ্ট কৃষকের ভোগ্য ; কিন্তু সম্পূর্ণ তৃণই ছিল কৃষকের প্রাপ্য।

(৪) শস্যবণ্টন ব্যাপারে বঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করিলে কৃষককে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইত ; কিন্তু, বারংবার এইরূপ করিলে তাহাকে গ্রাম হইতে নির্বাসিত করিবার ব্যবস্থা ছিল।

(৫) পলাতক ব্যক্তির জমি, গোমহিষ ও শস্যাদি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত।

যে-দলিল দ্বারা উক্ত ভূমি কৃষকগণকে দান করা হইত তাহার নাম ছিল 'গুণপত্র'। 'গুণপত্রের' আদর্শ হইতে জানা যায় যে, ঐ অঞ্চলে তৎকালে ধান, চিণা, গম, যব প্রভৃতি ছিল প্রধান শস্য এবং তখন ঐ অঞ্চলে তক্ষক (=ছুতার), লৌহ-কার ও কুম্ভকার প্রভৃতি পাঁচ প্রকার কারুশিল্পী প্রধানতঃ বাস করিত।

তৎকালে গরুমহিষ ও অশ্বাদি গচ্ছিত রাখিয়া টাকা ধার করিবার প্রথা দেখা যায়। ঐ দলিলে ঋণ পরিশোধের সর্তাবলী লিখিত থাকিত এবং সেই সঙ্গে সাক্ষী এবং প্রতিভূর ব্যবস্থাও দেখা যায়। বাড়ী বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণের প্রথাও কোন কোন দলিলে দেখা যায়। এক্ষেত্রে অধমর্ণকে দলিলে লিখিতে হইত যে, যতদিন ঋণ শোধ না হইবে ততদিন দৈব কারণে বাড়ীর কোন ক্ষতি হইলে সে নিজ ব্যয়েই ঐ ক্ষতির প্রতিকার করিবে। ঋণ শোধের পূর্বে উত্তমর্ণের অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে তিনি অধমর্ণের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে পারিবেন এবং অধমর্ণ অশক্ত হইলে অপর ব্যক্তির নিকট উক্ত গচ্ছিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবেন—এরূপ সর্তও অধমর্ণের করিতে হইত।

শস্য ধার দিবার প্রথারও উল্লেখ কোন কোন দলিলে আছে।

তৎকালে দাসপ্রথা যে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ রহিয়াছে দাসী-বিক্রয়ের দলিলের আদর্শে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে দাসী-বিক্রয়ের কথাই শুধু দলিলে আছে; কিন্তু দাস বিক্রয়ের কোন উল্লেখ নাই। দাসীর গৌরবর্ণ ও যৌবন ছিল বিক্রয়ের অন্যতম যোগ্যতা। গৃহসংমার্জন, ইন্ধনসংগ্রহ, জলবহন, মলমূত্র শোধন, গোমহিষাদির দোহন, দধিমন্থন, শস্যক্ষেত্রের যত্ন প্রভৃতি ছিল ক্রীতদাসীর প্রধান কর্তব্য। তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা তাহার প্রভু করিতেন বটে; কিন্তু, ক্রীতদাসীর কোন আত্মীয়, এমন কি তাঁহার স্বামীও, যদি তাহার উপর স্বীয় অধিকার প্রকাশ করিত অথবা তাহার কাজে বিঘ্ন ঘটাইত তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রহার করিয়া বিতাড়িত করিবার অধিকার প্রভুর ছিল। ক্রীতদাসী ছাড়াও আর একপ্রকার দাসী ছিল; তাহাদিগকে বলা হইত 'স্বয়মাগতা'। দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির পীড়নে এবং আত্মীয়স্বজনের উৎপীড়নে তাহারা দাসীত্ব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইত। তাহাদিগকে এই বলিয়া দলিল করিতে হইতে যে, তাহারা আমরণ প্রভুকে সেবা করিবে এবং তাহাদের রূপযৌবনে মুগ্ধ প্রেমিক থাকিলেও তাহারা মুক্তি প্রার্থনা করিবে না। ইহা হইতে, তাহাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

'ঢৌকনপত্র' নামক দলিল হইতে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রথার সন্ধান পাওয়া যায়। স্বামী স্ত্রীর প্রতি বিরূপ হইলে স্ত্রীর পিতা রাজার অনুমতিক্রমে স্বীয় কন্যাকে বিবাহবন্ধনমুক্ত করিতে পারিতেন।

'লেখপদ্ধতি'তে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের যে সকল আদর্শ দেওয়া আছে সেগুলিতে পত্রের আঙ্গিক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নাই। ঐগুলিতে পত্রের বিষয়বস্তুর অনেক নমুনা আছে। ঐ চিঠিপত্রগুলি হইতে তদানীন্তন গার্হস্থ্য ও সমাজ-জীবনের একটি চিত্র আমাদের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বর্তমান প্রসঙ্গে ঐ রূপ একটি চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করিব। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। এই শ্রেণীর চিঠিপত্রে কোন তারিখ নাই। সুতরাং, ইহাদের মধ্যে যে কোন্ কালের সমাজচিত্র পাওয়া যায় তাহা বলা কঠিন। তবে, 'লেখপদ্ধতি'র সংকলনকাল যদি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় পাদের পূর্বে হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ যুগের সামাজিক অবস্থাই বুঝিতে হইবে। 'লেখপদ্ধতি' সম্ভবতঃ গুজরাটে সংকলিত হইয়াছিল। অতএব এই চিঠিপত্রগুলির সাক্ষ্য তাৎকালিক গুজরাট বা তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলের সমাজ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়।

আত্মীয়স্বজনের নিকট বিবাহের যে নিমন্ত্রণ চিঠি লিখিত হইত তাহার নাম ছিল 'কন্ধুমপত্রিকা'। সম্ভবতঃ ঐ চিঠির কাগজ কুঙ্কুমে রঞ্জিত থাকিত। বর্তমান বঙ্গেও হিন্দুদের বিবাহের চিঠিতে সিন্দুরের ফোঁটা দেওয়ার প্রচলন আছে। এখানে

লক্ষণীয় এই যে, বর্তমান কালের ন্যায়, ঐ সকল চিঠিতে শুধু গৃহস্বামীকেই নিমন্ত্রণ করা হইত না ; বাড়ীর সকলের উদ্দেশ্যেই সাদর আহ্বান জানান হইত।

গুপ্তপ্রিয়া প্রেমিকের নিকট যে চিঠি লিখিতেন তাহার আদর্শ 'লেখপদ্ধতি'তে আছে। ইহা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, সমাজে ঈদৃশ প্রণয় প্রচলিত ছিল এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে আদানপ্রদানের যোগ্য লিপিরও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল।

প্রবাসী পুরুষেরা স্বীয় গৃহে পত্নীর সতীত্ববিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকিতেন বলিয়া মনে হয়। প্রবাস হইতে স্ত্রীর নিকট লিখিত স্বামীর পত্রের আদর্শ হইতে মনে হয় যে, তিনি যাত্রা করিবার পূর্বে নিজের অনুপস্থিতকালে স্ত্রীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে কতক উপদেশ দান করিয়া আসিতেন। প্রধান উপদেশটি এই যে, স্ত্রীর সম্বন্ধে কুলটা নারীরা যেন কোন অপবাদ না রটাইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রবাসী পুরুষেরা প্রতিবেশিগণের নিকট হইতে স্ত্রীর সম্বন্ধে অভিযোগ শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। এই সকল অভিযোগের মধ্যে প্রধান—অপব্যয়। এই বার্তা শ্রবণে কুপিত স্বামী স্ত্রীকে পত্রে তর্জন করিয়া বলিয়াছেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া স্ত্রী অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছেন।

আবার স্বামীর দীর্ঘায়িত প্রবাসে রুষ্টা স্ত্রী স্বামীকে পত্রে লিখিয়াছেন যে, তিনি যে অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা বহুকাল পূর্বেই নিঃশেষ হইয়াছে এবং পুত্রকন্যা লইয়া তিনি অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছেন। অন্য নারীর প্রেমে তিনি যদি মজিয়া না থাকেন তাহা হইলে সত্বর যেন তিনি চলিয়া আসেন। নতুবা তিনি তাঁহার সংসার ফেলিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবেন।

স্বামীর প্রতি প্রসন্না ভার্যা লিখিতেছেন যে, তিনি তাঁহার উপদেশ অনুসরণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। স্বামীর বিরহে তিনি অত্যন্ত কাতর। তিনি যেন কার্য সম্পন্ন করিয়া শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করেন। একটি পত্রে প্রবাসী ব্যক্তি কনিষ্ঠভ্রাতাকে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পত্নীগণের মধ্যে যদি বিবাদ বিসম্বাদ হয় তাহা হইলে সে যেন পক্ষপাতিত্ব না করিয়া শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করে।

উল্লিখিত পত্রগুলি হইতে 'স্ত্রীণাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ', এই কথার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং সমাজে ও গৃহে স্ত্রীর যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল না তাহাও বেশ পরিস্ফুট হয়। সমাজে বহুপত্নীত্বের প্রচলন সম্বন্ধেও পত্রগুলি সাক্ষ্য বহন করে।

পিতা-পুত্রের মধ্যে যে সকল পত্রাবলীর আদান প্রদান হইত সেগুলি হইতে দেখা যায়, পিতার প্রবাসকালে সকল গৃহকর্মের, বিশেষতঃ কৃষিকার্যের প্রতি, পুত্রের দৃষ্টি রাখাই প্রধান কর্তব্য ছিল।

শ্বশুরালয়ে বধূর দুর্বাক্য-প্রয়োগ এবং গুরুজনের আদেশ লঙ্ঘন প্রভৃতি অশান্তিকর ব্যাপার গার্হস্থ্য জীবনে ছিল এবং এইজন্য ঐ বধূর পিতামাতা যথেষ্ট উদ্বিগ্নও থাকিতেন। একটি পত্রে এক ব্যক্তি জামাতাকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইহাও লিখিয়াছেন যেন তদীয় কন্যার উক্তরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি সহ্য করিয়া নেন।

ক্রমশঃ

সিপাহী বিদ্রোহ প্রসঙ্গ

শ্রীশশিভূষণ চৌধুরী

ইতিহাস পত্রিকায় (অষ্টম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা) ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ নামক সমালোচনা প্রবন্ধ পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। প্রবন্ধটি ডাঃ সেনের ও ডাঃ মজুমদারের পুস্তকের উপর লেখা একটি প্রশস্তি, কিন্তু মূলতঃ 'বিরুদ্ধপন্থী' গ্রন্থকার বলিয়া আমার বই *Civil Rebellion in the Indian Mutinies*র উপর একটি আক্রমণাত্মক আলোচনা। আলোচ্য পুস্তকটি সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা দরকার। তিন বৎসর পূর্বে *Civil Disturbances* etc. (*1765-1857*) নামক পুস্তকে ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহের একটি prolegomena ধরিয়া তুলি। যাঁহারা ঐ পুস্তক পড়িয়াছেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে ইহা '৫৭ সনের জনবিদ্রোহের ভূমিকা হিসাবে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকের বিষয়বস্তু যে পূর্বপরিকল্পিত তাহা সমালোচকদ্বয় বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা লিখিয়াছেন: 'পুস্তক প্রকাশের সন তারিখের দিকে খেয়াল রাখিলেই দেখা যায় যে, ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেনের গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হইলে দেশের মধ্যে যে তীব্র বাদানুবাদ ও সমালোচনার ঝড় উঠে···সেই আবহাওয়াতেই ডাঃ চৌধুরীর পুস্তক রচিত।"

সমালোচকদ্বয় যদি নিরপেক্ষ হইতেন তাহা হইলে দেখিতেন যে আমার গ্রন্থের বিষয়বস্তুটি সম্পূর্ণভাবে Further Narrative of Events, Commonwealth Relations Office Papers (Secret Letters from India) এবং Old English Correspondence প্রভৃতি সরকারী কাগজপত্রের সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর লেখা হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধসহস্র রেফারেনস্ রহিয়াছে উপরোক্ত মূল উপাদানগুলির। শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিকদ্বয়ের মধ্যে একজন ঐগুলির কোন উল্লেখই করেন নাই, অন্য একজন প্রথম দুইটি তালিকভুক্ত করিয়াছেন মাত্র কিন্তু ব্যাপক ব্যবহার করেন নাই। ইহাতে তাঁহাদের গ্রন্থের মূল্য কিছুমাত্র কমে নাই কারণ Civil Rebellion লেখা তাঁহাদের কাহারো উদ্দেশ্য ছিল না। যে শ্রেণীর উপাদান আমার চোখে প্রয়োজনীয় তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাহার কোন মিল নাই।

সমালোচকদ্বয় বলিতেছেন যে Norton, Duff, Native Fidelity, Kaye, Malleson, Sen, Majumdar এ সম্পর্কে বই লিখিয়াছেন, কাজেই আমার পুস্তক

'Pioneer work'—এই দাবী করা অন্যায় হইয়াছে, এই অভিযোগের উত্তর দিতে হইলে উপরোক্ত গ্রন্থকাররা কি বিষয়ে লিখিয়াছেন তাহার একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা দরকার। 'Civil Rebellion' বিষয়টির মৌলিক তথ্য রহিয়াছে সেই সময়কার ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারদের রিপোর্টে, যাহা অতি দুর্লভ। Narrative of Events নামক তিনটি বৃহৎ সংকলিত গ্রন্থ—১৮৮১ সনে প্রকাশিত হয়। Further Papers গুলিও একসঙ্গে সংকলিত হইয়া বিভিন্ন গ্রন্থে অনেক পরে প্রকাশিত হয়। Norton কিংবা Duff-এর ঐ উপাদান ব্যবহার করিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তাঁহারা বই লিখিয়াছিলেন স্থানীয় কিছু রিপোর্ট, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সমসাময়িক উত্তেজনার বশে। ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপনীতির ফলে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, চাপাটির কথা, এবং দুই এক জায়গার জনসাধারণের বিদ্রোহী মনোভাবের কাহিনীই Norton-এর পুস্তকের বিষয়বস্তু। মিউটিনির দিনের বেসামরিক আন্দোলনের যোগসূত্র খুঁজিতে হইবে ব্রিটিশ শাসনের ভূমি ব্যবস্থায় ও কোলোনিয়াল শোষণ নীতির ফলাফলে—প্রাক্ মিউটিনি যুগের আন্দোলনগুলি যার পূর্বাভাস। Norton কিংবা Duff কেউই এই দৃষ্টিভঙ্গী নিতে পারেন নি।

Duff-এর চিঠিগুলি বিলাতেও কেহ বিশ্বাসযোগ্য মনে করে নাই—আতঙ্কগ্রস্ত বিদেশীর উদ্‌ভ্রান্ত কাহিনী—ইতিহাস নয়। 'Native Fidelity' প্রামাণ্য গ্রন্থ নয়, উহার নজির দেওয়া চলে না। বাংলা দেশে থাকিয়া সমসাময়িক বাঙ্গালীর 'সিপাহী বিদ্রোহ' লেখা বস্তুনিষ্ঠার পরিপন্থী। Kaye যখন লিখিতে সুরু করেন তখন সরকারের কাগজপত্র দেখিবার অনেক সুযোগ আসে। সিপাহী বিদ্রোহের পিছনে যে জনসংযোগ রহিয়াছে তিনিই প্রথম তাহার ইঙ্গিত দেন। তাহার উত্তরসাধক Malleson তাহার বিরাট গ্রন্থাবলীর একটি paragraph-এ শুধু লিখিলেন যে সিপাহী আন্দোলনের পিছনে বে-সামরিক জনগণের বিদ্রোহাত্মক কার্যাবলীই বেশি নজরে পড়ে। Forrest মিউটিনীকে দেখিলেন একটা 'noble epic' যাহার প্রতিধ্বনি প্রত্যেক 'ইংলিশম্যানের' কর্ণকুহরে যুগ হইতে যুগান্তরে প্রতিধ্বনিত হইবে। Holmes-ই প্রথম তাহার পুস্তকের নাম দিলেন—A History of the Indian Mutiny and the accompanying Civil Disturbances, কিন্তু বে-সামরিক আন্দোলনের ব্যাপক পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর কোন আলোচনাই ঐ পুস্তকে নাই।

সমালোচকদ্বয় প্রশ্ন করিয়াছেন 'সিপাহী বিদ্রোহ' শুধু সামরিক বিদ্রোহ নয় কেবল এই কথাটুকু বলার জন্য ডাঃ চৌধুরীর নতুন বই লেখার কোন সার্থকতা আছে কি? বোধহয় কোন সার্থকতা ছিল না। তবে ভারতের বিভিন্ন জেলার বিদ্রোহ-বহ্নি কি আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ না দিলে '৫৭ সনের গণবিদ্রোহের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। আমার পুস্তকে 'যুক্তির দারিদ্র্য' থাকিতে পারে কিন্তু

বিষয়টি যেখানে বস্তুনিষ্ঠ ও দৃষ্টিভঙ্গী যেখানে নৈর্ব্যক্তিক সেখানে যুক্তি ও ভাষার কসরৎ দরকার করে না।

১৮৫৭ সালে কত সংখ্যক ভারতবাসী ইংরেজের পক্ষে ছিল এ নিয়ে সমালোচকদ্বয় কতগুলি উক্তি বিক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করিয়া আমার মতের এক বিকৃত রূপ দিয়াছেন। আমি স্বীকার করিয়াছি এবং ইহা অনস্বীকার্য যে বিদ্রোহের দিনেও অনেক ভারতবাসী ইউরোপীয়ানদের আশ্রয় দিয়াছিল এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। কিন্তু আমার মতে তাহার বিশেষ কোন মূল্য নাই। আমি লিখিয়াছিলাম : they only enable us to understand better how the English came out successful in their contest. সমালোচকদ্বয় কৌশল করিয়া আমার এই কথাটা চাপিয়া গেলেন। উপরন্তু আমার স্ববিরোধী (?) উক্তি তুলিয়া দিয়া 'দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ' বলিয়া একটু উপহাস করিয়াছেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে গবেষণাগার বড় কঠিন জায়গা, এখানে বালসুলভ কৌতূহল নিবৃত্তি হয় না।

সমালোচকদ্বয় অভিযোগ করিয়াছেন যে Civil Rebellion আমার বই-এর মূল আলোচ্য বিষয় হিসাবে বাছিয়া নিয়া সেই আলোচনা হইতে আমি নিজ সিদ্ধান্ত টানিয়াছি এবং মন্তব্য করিয়াছেন যে আমার বিষয়বস্তুর বিপরীত দিকটারও বেশ কিছু আলোচনা থাকা যুক্তিসঙ্গত ছিল। আমি ইহা একাধিকবার বলিয়াছি যে ইতিহাসের বিচারে ঐদিনের কতিপয় ভারতবাসীর ইংরেজ আনুগত্যের মূল্য এই যে তাহাদের সাহায্য না পাইলে ইংরেজ শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিত না। মরুভূমিতে ওয়েসিসের মত ইংরেজ আনুগত্যের ঘাটিগুলি চারিদিকের বিদ্রোহ-বহ্নি হইতে বিদেশী শাসনবর্গকে রক্ষা করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে বিদ্রোহের প্রকৃতি বালুকার্ণভের মতই সর্বগ্রাসী ছিল। কাজেই ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহের বহর ও রূপ রাজভক্ত ভারতবাসীর তালিকাতে লেখা থাকিতে পারে না।

Native Fidelity ঐ জাতীয় পুস্তক এবং ঐ জন্যই ইহাকে 'সজ্ঞানে উপেক্ষা' করা হইয়াছে। গ্রন্থকার সমসাময়িক দৈনিক কাগজগুলি হইতে ইংরেজ ঐ সঙ্কটের সময় আত্মরক্ষার জন্য কিভাবে পলায়ন করিয়াছিল তাহার লোমহর্ষণ কাহিনী এবং অনেকাংশে অতিথিবৎসল গৃহস্থরা কিভাবে তাহাদের আশ্রয় দিয়াছিল সেই সব বর্ণনা দিয়াছেন। যেখানে আমি দশ বারো জন ব্রিটিশ কর্মচারী যাহারা বিদ্রোহ দেখিয়াছেন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহাদের সাক্ষ্য যথাযথ যুক্তি ও বিচারের পর বাতিল করিয়াছি সেখানে বাংলাদেশের অনিশ্চিত বে-সরকারী লেখকের ইংরেজচরিতামৃতের কি মূল্য তাহা গবেষকমাত্রই বুঝিবেন। ইতিহাসের মান মূল্য বিচারে সিদ্ধহস্ত না হইলে সকলের পক্ষেই এইসব প্রবন্ধ infliction হইয়া দাঁড়ায়। একাধিকবার Native Fidelityর কথা বলিয়া অযথা সমালোচকদ্বয় আমার

এবং পাঠকবর্গের সময় নষ্ট করিয়াছেন। Native Fidelity কে লিখিয়াছে ইত্যাদি গবেষণা করিয়া পুস্তক লিখিয়া সমালোচকদ্বয় আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে ১৮৫৭ সনের বিচার চলে না। বাঙ্গালীর মনোভাবের সঙ্গে এই ভারতীয় বিপ্লবের কোন যোগ ছিল না। সেই সময়ে ভারতের নানা অঞ্চলে বাঙ্গালী যেভাবে উপক্রুত হইয়াছিল তাহাতে হিন্দু পেট্রিয়টও একটু গরমসুরে মন্তব্য করিয়াছিল যে বিদ্রোহ যেন হিন্দী ভাষাভাষী লেখকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। ঐ সময়ে বিলাতে পার্লামেণ্টে বাঙ্গালী বলিতে হাসির ধুম পড়িত: '*Our old subject*'—তাহারা বড় শান্তিপ্রিয় ও ভক্তিবৎসল। এহেন পরিবেষ্টনীতে রচিত সমসাময়িক বাঙ্গালী লেখকের রচনা হইতে যাহারা মিউটিনীর স্বরূপ বুঝিতে চান তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকে না।*

লেখকের অনুরোধে তাঁরই দীর্ঘায়িত প্রতিবাদের সংক্ষিপ্তসার এখানে ছাপা হলো।—ইঃ সঃ।

গরুড়পুরাণে ভারতের ভূগোল

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কিছু সংখ্যক পুরাণের 'ভুবন কোষ' নামক অধ্যায়ে পৃথিবী ও ভারতবর্ষের একটি ভৌগোলিক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বের ভৌগোলিক বিবরণের অধিকাংশই কাল্পনিক। এমন কি ভারতবর্ষকে যে নয়টি খণ্ডে[১] ভাগ করা হইয়াছে, তাহাদের সব কয়টির সঠিক স্থান নির্ণয়ও সম্ভবপর নহে। উপরন্তু এই সকল খণ্ডগুলির অবস্থানের বর্ণনা পাঠে ইহাই মনে হয় যে এ স্থলে ভারতবর্ষের সংজ্ঞা ভারতীয় উপমহাদেশ অপেক্ষা বৃহত্তর।[২]

পুরাণকারগণ ভারতবর্ষকে কয়েকস্থানে কূর্ম্মের দেহের সহিত তুলনা করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হইয়াছে যে, ভগবান জনার্দন পূর্বমুখী কূর্ম্মের রূপ ধারণ করিয়া নবধা বিশিষ্ট দেশের সন্নিবিষ্ট হইলে জনপদ সমূহ নয়ভাগে বিভক্ত হয়।[৩] দেশ ও জাতি সমূহ যথাক্রমে কূর্ম্মের দেহের মধ্যভাগে, মুখভাগে, দক্ষিণ ভাগের সম্মুখ পদে, দক্ষিণ পার্শ্বে, দক্ষিণ ভাগের পশ্চাৎ পদে, লাঙ্গুলাংশে, বাম ভাগের পশ্চাৎ পদে, বামপার্শ্বে এবং বামস্থ সম্মুখ পদে অবস্থান করে। ভারতবর্ষের ভূগোলের এইরূপ বর্ণনা কল্পনাশক্তির উর্ব্বরতাই পরিচায়ক, ভৌগোলিক জ্ঞানের নহে। কারণ এই দেশের মানচিত্রের সহিত কূর্ম্মের আকারের কোনই সাদৃশ্য নাই। উপরন্তু কূর্ম্মের দেহের যে সকল অংশে বিভিন্ন দেশ ও জাতির অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে, সেই সেই বিবরণ হইতে ভারতবর্ষের প্রকৃত ভৌগোলিক চিত্রে তাহাদের স্থান নির্দ্ধারণ অনেক সময় কষ্টসাধ্য।[৪]

ভারতবর্ষের আরও একটি ভৌগোলিক বর্ণনা আমরা পাই পুরাণের 'ভুবনকোষ' অধ্যায়ে জনপদ ও জাতি সমূহের বসতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে। এই স্থলে ভারতবর্ষকে ভাগ করা হইয়াছে মধ্যদেশ, উদীচ্য, প্রাচ্য, দক্ষিণাপথ, অপরান্ত, বিন্ধ্য অঞ্চল ও হিমালয় অঞ্চল। এই বিবরণ পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা দুইটি অপেক্ষা অনেক বেশী প্রামাণ্য। ভারতবর্ষের পঞ্চ-আঞ্চলিক বিভাগ সম্পর্কে ধারণার উন্মেষের যে আভাস অথর্ব্ববেদ[৫] এবং পরিণতির যে রূপ রাজশেখর কৃত কাব্যমীমাংসাতে[৬] দেখিতে পাওয়া যায়, সেই বিবর্ত্তনের মার্গেই এই পৌরাণিক বিভাগের অবস্থান।

পণ্ডিতগণের মতে পুরাণকারগণ কেবল এই তিনরূপেই ভারতীয় উপমহাদেশকে ভাগ করিয়াছেন। কিন্তু, গরুড় পুরাণের 'ভুবনকোষ' অধ্যায় পড়িলে মনে হয় যে এই ধারণা ভ্রান্ত। এই অধ্যায়ের যে অংশে ভারতীয় জনসমূহের বাসস্থান সম্পর্কে

আলোচনা আছে, সেই স্থলে ভারতের আঞ্চলিক বিভাগ সম্পর্কে যে চিত্র পাই তাহা উপরোক্ত দুইটি বিবরণ হইতে ভিন্ন। এইস্থলে ভারতবর্ষকে মধ্যদেশ, পুর্ব, পুর্ব-দক্ষিণ, দক্ষিণাপথ, দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম, উদীচী ও উদক্ পূর্ব্ব অঞ্চল বিভক্ত করা হইয়াছে।[৭]

বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থানকারী যে সকল জনগণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের সকলের প্রকৃত স্থান নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে এবং সেইহেতু প্রতিটি অঞ্চল ভারতবর্ষের বর্ত্তমান মানচিত্রের ঠিক কতটুকু অংশ অধিকার করিয়া অবস্থান করিত, তাহা জানা যায় না। তবে এইরূপ মনে করা বোধহয় অসঙ্গত হইবে না যে মধ্যদেশের যে সীমা মনুসংহিতাতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, গরুড়পুরাণের লেখক অথবা সঙ্কলয়িতাগণ সেই সংজ্ঞাই গ্রহণ করিয়াছেন।

মনুসংহিতাতে উল্লিখিত মধ্যদেশ উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমে বিনশন হইতে পুর্ব্ব-দক্ষিণে প্রয়াগ অর্থাৎ এলাহাবাদ অঞ্চল অবধি বিস্তৃত।[৮] গরুড়পুরাণে কথিত মধ্যদেশের সীমা বোধহয় একইরূপ। মধ্যদেশের পুর্ব্ব (বা পুর্ব্ব-দক্ষিণ) সীমা হইতে পুর্ব্বে ও পুর্ব্ব-দক্ষিণে ভারতের শেষ প্রান্ত অবধি বিস্তৃত যথাক্রমে পুর্ব্ব, অর্থাৎ পুর্ব্বদেশ অথবা প্রাচ্য, এবং পুর্ব্ব-দক্ষিণ-দেশ। এইরূপে মধ্যদেশের সীমার দক্ষিণে, দক্ষিণ-পশ্চিমে, উত্তর-পশ্চিমে, উত্তরে, এবং উত্তর-পুর্ব্বে ভারতীয় উপমহাদেশের শেষ সীমা অবধি অবস্থিত যথাক্রমে দক্ষিণাপথ (বা দাক্ষিণাত্য, বা দক্ষিণদিশ), দক্ষিণ-পশ্চিম অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমদেশ, পশ্চিম অর্থাৎ পশ্চিমদেশ (বা প্রতীচ্য, বা পশ্চাৎদেশ, বা অপরান্ত), উত্তর-পশ্চিম অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিমদেশ, উদীচী অর্থাৎ উদীচি দেশ (বা উত্তরাপথ) এবং উদক-পুর্ব্ব অর্থাৎ উত্তরপুর্ব্ব দেশ।

এই বিবরণ হইতে মনে হয় যে, নয়টি অংশের মধ্যে পাঁচটি (অর্থাৎ মধ্যদেশ, পুর্ব্ব, দক্ষিণাপথ, পশ্চিম ও উদীচি) প্রধান এবং অন্য চারিটি (অর্থাৎ পুর্ব্ব-দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও উদক-পুর্ব্ব) অপ্রধান। সুতরাং এইরূপ ধারণা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে এই নবভেদের বর্ণনার পশ্চাতে পঞ্চ-আঞ্চলিক ধারণার প্রভাব বিশেষভাবে বর্ত্তমান।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে গরুড়পুরাণের বর্ণনার সহিত বরাহমিহির-কৃত বৃহৎসংহিতা পুস্তকে প্রদত্ত ভারতবর্ষের আঞ্চলিক বিভাগের বিবরণের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বর্ত্তমান। বৃহৎসংহিতার 'কূর্ম্মবিভাগ' নামক অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে যে, "তিনটি তিনটি নক্ষত্রে এক একটি বর্গ হয়; এইরূপে নয়টি বর্গ। এই বর্গসকল কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ হয়; ভারতবর্ষের মধ্য হইতে পুর্ব্বাদি দেশ সকল ইহা দ্বারা বিভাজিত হইয়াছে।"[৯] এইরূপে ভারতবর্ষকে যে নয়টি বর্গ অথবা অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে তাহাদিগের নাম হইতেছে যথাক্রমে মধ্য (অর্থাৎ

মধ্যদেশ), পূর্ব্ব (অর্থাৎ পূর্ব্বদেশ), অগ্নিদিশ (=কোন, অর্থাৎ পূর্ব্ব-দক্ষিণ), দক্ষিণ, নৈঋতদিশ (=কোন, অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম) অপর (অর্থাৎ পশ্চিমদেশ), পশ্চিমোত্তর (অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম দেশ), উত্তর এবং ঈশান (=কোন, অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব্ব)। এই সকল অঞ্চলে অবস্থিত জনপদ ও জাতিসমূহের নামও আলোচ্য অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গরুড়পুরাণ ও বৃহৎসংহিতাতে ভারতবর্ষের আঞ্চলিক বিভাগের যে দুইটি চিত্র পাই, সেই দুইটি সাধারণভাবে একই প্রকারের। জাতি ও জনপদসমূহের স্থান-নির্দ্দেশে হয়ত কিছু প্রভেদ বর্ত্তমান, কিন্তু ভারতবর্ষের নয়টি আঞ্চলিক বিভাগের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যেই সাদৃশ্য বর্ত্তমান। এমনকি আঞ্চলিক বিভাগের বর্ণনার ক্রমও (মধ্য, পূর্ব্ব, পূর্ব্ব-দক্ষিণ, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম, উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব্ব) উভয়ক্ষেত্রে এক। বিভাগসমূহের নামকরণে যে সামান্য বৈসাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় (যেমন গরুড়পুরাণে উক্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বৃহৎসংহিতাতে নৈঋতদিশ বা কোন নামে লিখিত), তাহা বোধহয় পুস্তক দুইটির আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্নতা হইতে উদ্ভুত। গরুড়পুরাণের আলোচ্য অংশের উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জনপদ ও জাতির বর্ণনা প্রদান করা। বৃহৎসংহিতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে যদিচ তাহাই করা হইয়াছে, তথাপি উহার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতবর্ষের কোন স্থান কোন নক্ষত্রের প্রভাবাধীন তাহা স্থির করা। জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত পুস্তকে পূর্ব্ব-দক্ষিণ অঞ্চলকে ঐ নামে অভিহিত না করিয়া অগ্নিদিশ বা কোনরূপে চিহ্নিত করাই স্বাভাবিক।

উভয়ের মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্য পরস্পর সম্পর্কে পরস্পরের জ্ঞানই সূচিত করে। ইহা অস্বাভাবিক নহে যে গরুড় পুরাণের লেখক বা সঙ্কলয়িতাগণ আলোচ্য অংশটির বর্ণনা বৃহৎসংহিতা হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার ইহাও হইতে পারে যে, বরাহমিহির যে পরাশরের গ্রন্থ হইতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ধারণা করিয়াছিলেন পুরাণকারের বিবরণের উৎসস্থল তাহাই।

যাহাই হউক পরাশরের গ্রন্থ এবং বৃহৎসংহিতা ও গরুড়পুরাণে বর্ণিত আলোচ্য অংশগুলি পাঠে আমাদের মনে এই প্রতীতি জন্মে যে, ভারতীয় উপমহাদেশের নব-আঞ্চলিক বিভাগ সম্পর্কে ভারতীয় লেখকগণের একটি সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। জম্বুদ্বীপের দক্ষিণতম 'বর্ষ' ভারতবর্ষের যে নবখণ্ডের বর্ণনা পুরাণসমূহে দেখিতে পাই, সেই অর্দ্ধকাল্পনিক বর্ণনা হইতে এই ধারণা ভিন্ন ও বহুগুণে সত্যভাবাপন্ন। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এই নব-আঞ্চলিক বিভাগের বর্ণনা পঞ্চ-আঞ্চলিক বিভাগের ধারণারই বিস্তৃতরূপ এবং পরিপূরক।"

পাদটীকা

১। ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমাংস্তাম্রপর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্বো বারুণস্তথা।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ॥

মার্কণ্ডেয় পুরানের এই বর্ণনার সহিত অন্যান্য সকল পুরাণের বিবরণের সম্পূর্ণ মিল নাই। বামন-পুরাণে সৌম্য এবং গান্ধব স্থলে যথাক্রমে কটাহ ও সিংহল লিখিত আছে। গরুড় পুরাণেও কটাহ ও, সিংহলের উল্লেখ আছে। নবমদ্বীপটী উল্লিখিত হইয়াছে 'অয়ংতু' এই বিশেষণে। বামন এবং অন্যান্য কয়েকটী পুরাণে তাহাকে কুমার বা কুমারীদ্বীপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার বিস্তৃতি বলা হইয়াছে কুমারী হইতে হিমালয় পর্যন্ত (আয়তা তু কুমারীতঃ আগঙ্গাপ্রভবাবধি।)

২। নবমদ্বীপ সম্পর্কে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হইয়াছে—
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রং বৈ দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ॥
পূর্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাস্তথা
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়োঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্তঃস্থিতা দ্বিজ ॥

এইরূপ পৌরাণিক বর্ণনা হইতে মনে হয় যে পুরাণ সমুহে ভারতীয় উপমহাদেশ অয়ংতু বা 'কুমার' নামে সূচিত হইয়াছে (যদিচ ভারতীয় উপমহাদেশের চতুর্দিকে সাগর নহে)। সুতরাং 'অয়ংতু' ব্যতীত আরও আটটি দ্বীপ যে পৌরাণিক সংজ্ঞার ভারতবর্ষের অন্তর্গত, তাহার আকার বর্ত্তমান ভারতীয় উপমহাদেশ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবেই।

৩। Pargiter, Markandeya Purana (Eng Tran.), Canto LVIII, p. 348ff.

৪। F. E, Pargiter বলেন যে, "to make the shape of India conform to that of a tortoise lying outspread and facing eastwards is an absurd fancy and a difficult problem" (Mar. pu., tran., p. 349).

৫। অর্থবসংহিতা, ১৯।১৭।১—৯।

৬। কাব্যমীমাংসা, সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ (দেশবিভাগঃ)।

৭। গরুড়পুরাণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ), পূর্ব্বখণ্ড, অধ্যায় ৫৫, ১১—১৯।
পাঞ্চালাঃ কুরবো মৎস্যা যৌধেয়াঃ সপটচ্চরাঃ।
কুন্তয়ঃ শূরসেনাশ্চ মধ্যদেশজনাঃ স্মৃতাঃ ॥১১
বৃর্ষধ্বজ জনাঃ পাদ্মঃ সুত-মাগধ চেদয়ঃ।
কাষায়াশ্চ বিদেহাশ্চ পূর্ব্বস্যাং কোশলাস্তথা ॥১২
কলিঙ্গ-বঙ্গ পুণ্ড্রাঙ্গা বৈদর্ভা মূলকাস্তথা।
বিন্ধ্যান্তর্নিলয়া দেশাঃ পূর্ব্ব-দক্ষিণত স্মৃতাঃ ॥১৩
পুলিন্দাশ্মকজীমূত-নয়রাষ্ট্রনিবাসিনঃ।
কর্ণাটাঃ কম্বোজঘন্টা দক্ষিণাপথবাসিনঃ ॥১৪
অম্বষ্ঠা দ্রবিড়া লাটাঃ কাম্বোজাঃ স্ত্রীমুখাঃ শকাঃ।
আনর্ত্তবাসিনশ্চৈব জ্ঞেয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে ॥১৫
স্ত্রৈরাজ্যাঃ সৈন্ধবা ম্লেচ্ছা নাস্তিকা যবনাস্তথা।
পশ্চিমেন চ বিজ্ঞেয়া মথুরা নৈষধৈঃ সহ ॥১৬

মাণ্ডব্যাশ্চ তুষারাশ্চ মূলিকাশ্চ মুষাখশাঃ।
মহাকেশা মহানাদা দেশাস্তুত্তরপশ্চিমে ॥১৭
লম্বকাঃ স্তননাগাশ্চ মাদ্রগান্ধারবাহ্লিকাঃ।
হিমাচলালয়া ম্লেচ্ছা উদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ ॥১৮
ত্রিগর্ত্ত-নীল কোলাভ-ব্রহ্মপুত্রাঃ সটঙ্কণাঃ।
অভীষাহাঃ সকাশ্মীরা উদক্‌পূর্ব্বেণ কীর্ত্তিতাঃ ॥১৯

৮। হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্‌ বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

৯। বৃহৎসংহিতা, ১৪।১। নক্ষত্র-ত্রয়-বর্গৈরাগ্নেয়াদ্যৈ-
র্ব্যবস্থিতৈর্নবধা। ভারতবর্ষে মধ্যাৎ প্রাগাদি বিভাজিতা দেশাঃ ॥

১০। Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol XXIX, গ্রন্থে ডাঃ শশীভূষণ চোধুরী কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধে (পৃঃ ১২৩) ভারতবর্ষের আঞ্চলিক বিভাগ সম্পর্কে একটি সাধারণ বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। উৎসুক পাঠক উহা পাঠ করিয়া লাভবান হইতে পারেন।

পুস্তক-পরিচয়

The Growth of Nationalism in India (*1857-1905*) By Haridas and Uma Mukherjee. Published by the Presidency Library, College Square, Calcutta. pages 166 (*Demy*). price Rs 4-0-0.

'*Bande Mataram' and Indian Nationlism* (*1906-1908*) By the same authors. Published by Firma K. L. Mukhopadhyya, 6/1, Banchharam Akrur Lane, Calcutta. Pages 96 (*Double Crown*) price Rs 2/8.

The Origins of the National Education Movement (*1905-1910*). By the same outhors. Published by the Jadavpur University. Pages 464 (*Demy*). Price Rs 12/-

অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায় ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে ১৯০৫এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলনের স্থান সঠিকভাবে নির্দেশ করিবার জন্য গবেষণা কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তাঁহাদের সংগৃহীত তথ্যের ফলাফল সম্প্রতি উপরি-উক্ত গ্রন্থগুলিতে স্থান লাভ করিয়াছে।

প্রথম গ্রন্থে তাঁহারা উনবিংশ শতকে বাংলার নব জাগরণের ধারা ও প্রকৃতির বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও সেই সংগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও বিবর্ত্তনের কাহিনীও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভারতের জাতীয়তাবাদের পশ্চাতে যে সকল রকমারি শক্তি, দেশী ও বিদেশী, সক্রিয় ছিল তাহার বিশ্লেষণ আলোচ্য গ্রন্থে বিশেষ প্রধান্য লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পুস্তকখানির আলোচ্য বিষয়বস্তু হইল ভারতের জাতীয়তাবাদে অধুনা-লুপ্ত "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার দান ও গুরুত্ব সম্বন্ধে পর্যালোচনা। উক্ত গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দের লিখিত ও "বন্দেমাতরম্" পত্রে প্রথম প্রকাশিত অনেকগুলি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ স্থান লাভ করিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কিভাবে দেখিতে দেখিতে "স্বরাজের" আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল তাহার পরিচয় এই পুস্তকে পাওয়া যায়।

তৃতীয় পুস্তকখানির বিষয় বস্তু হইল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সংগে সংগে এদেশে যে "জাতীয় শিক্ষক" আন্দোলন জন্মগ্রহণ করে তাহার পর্যালোচনা। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দানের বিষয় ইহাতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। "জাতীয় শিক্ষা" আন্দোলনের ইতিহাস লিখিতে গিয়া তাঁহারা প্রসঙ্গক্রমে তৎকালীন বংগ সংস্কৃতির ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন। প্রমাণ ও তথ্যের সাহায্যে তাঁহাদের মতামত গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের একাংশের ইতিহাস তাঁহারা রচনা করিয়াছেন।

শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ

বিশেষ দ্রষ্টব্য : পত্রিকার অষ্টম বর্ষ পূর্ণ হলো। পত্রিকার গ্রাহক ও পরিষদের সভ্যবৃন্দের প্রতি অনুরোধ তাঁরা যেন নবম বর্ষের (১৩৬৫-৬৬) জন্য দেয় চাঁদা আগামী ১৫ই আশ্বিনের মধ্যে কোষাধক্ষের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন।

ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস

একবিংশ অধিবেশন

এ বৎসর ২৫শে—২৮শে ডিসেম্বর ত্রিবান্দ্রামে কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের একবিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন ইতিহাস কংগ্রেসের কর্মকর্তামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ কালীকিঙ্কর দত্ত। বিভিন্ন যুগশাখায় সভাপতিত্ব করবেন যথাক্রমে অধ্যাপক শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী (প্রাচীন যুগ); ডঃ কে. এস. লাল (মধ্য যুগ); অধ্যাপক কে. সজন লাল (আধুনিক কাল)।

একটি ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর (প্রাচীন শিল্প নিদর্শন, মুদ্রা, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির) ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আশা করা যায় প্রদর্শনীটি সাধারণ দর্শকদের নিকট বিশেষ উপভোগ্য হবে।

ইতিহাস কংগ্রেসের বার্ষিক সভ্যমূল্য ১৫৲ টাকা মাত্র। যাঁরা কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করতে ইচ্ছুক তাঁরা যেন অবিলম্বে ১৫৲ টাকা Treasurer, Indian History Congress, 16-B, Sleater Road, Bombay—7 এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন। George M. Moraes, General Secretary Indian History Congress, 9, New Marine Lines, Bombay-1 এই ঠিকানায় চিঠি দিলে অধিবেশন সম্পর্কে বিশদ বিবরণ জানা যাবে।